ক্ষমতার বারান্দায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী
ধীরেন শাসমল

কবি স্বরজিৎ ঘোষ

স্নেহাস্পদেষু—

রাজভবনে জাদুঘর হবে। ভেতরে অদলবদল হচ্ছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয় পড়ার বই ছিল পঞ্চতন্ত্র। অক্সফোর্ডে পড়ার সময়ে সংস্কৃতে ভালো ফল দেখাতে পেরে কিশোর হেস্টিংস মোটা বৃত্তি পেয়েছিল। এইট্টিন্থ সেঞ্চুরির শেষ দিকে সস্তার লণ্ডনে মাসে চার পাউণ্ড। তার প্রিয় বইখানি রাজ্যপাল খুঁজে পেয়েছেন। রাজভবনের রসুইখানার বিশাল কুলুঙ্গির ভেতরে অনেক জিনিসের সঙ্গে ধুলোমাখা অবস্থায় পড়েছিল। আর পেয়েছেন রোহিলাখণ্ডের যুদ্ধ জেতার পর হেস্টিংসের সংগ্রহ করে রাখা ভারতীয় যোদ্ধার একটি শিরস্ত্রাণ। এমন আরও অনেক জিনিস। বেন্টিঙ্কের খাগের কলম। লর্ড ক্যানিংয়ের ডাইরি। আফগান যুদ্ধে নিহত ইংরেজ জেনারেলের পেনশন বই। গভর্নর জেনারেলের গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। জোফানির আঁকা তেল-রং ছবি।

সব কাগজেই বেরিয়েছে—রাজ্যপাল রাজভবনের খরচে জীবন থেকে বেরিয়ে এসে রাজভবনের হাতার ভেতরে বানানো ছোট্ট এক-তলা বাংলোবাড়িতে সরে এসেছেন। পুরনো গান্ধীবাদী। অনেক দিন আগে সেণ্টারে একবার মন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর রাজনীতিতে আর বিশেষ ছিলেন না তিনি। কলকাতার রাজভবনে আছেন তা তিন বছর হয়ে গেল। জেনারেল ইলেকশন গেল গত সপ্তাহে। চাকা ঘুরে গেছে। আজ নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবে।

এই প্রথম রাজভবনের দরবার হলে মন্ত্রীরা শপথ নিচ্ছেন না। সবকিছুর আয়োজন হয়েছে রাজভবনের সামনের লনে। দরবার টেণ্ট খাটানো হয়েছে। শামিয়ানার নিচে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিদেশী দূতাবাসের কুটনীতিকদের জন্যে গদিআঁটা সোফা। সব বিশিষ্ট নাগরিকরা এসেছেন। নানা প্রফেসনের নানান কৃতী মানুষ। গোলাপ ফুল, দামী চা—সবই রয়েছে। আজ ক'দলের জোট মিলে-মিশে সরকার গড়বে।

রাজ্যপালের স্ত্রীর বয়স হয়েছে। তিনি শপথ গ্রহণ, বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ ইত্যাদি কাগজে ছবি দেখতেই ভালবাসেন। কোন অনুষ্ঠানে গিয়ে ঠায় বসে থাকা তাঁর পক্ষে শাস্তি। তাই তিনি আসেননি। প্রধান বিচারপতি প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়ালেন। তারপর বয়স অনুযায়ী প্রবীণ মন্ত্রীদের শপথবাক্য পড়াতে লাগলেন। ভূমিসংস্কার, সেচ—পর পর মন্ত্রীরা এসে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ। কোন্ মন্ত্রীর কবে জন্ম? কোন্ আন্দোলনে বিখ্যাত হয়েছিলেন কে? রেডিওর টেপ সব তুলে নিচ্ছিল। টিভি-ক্রুর জোরালো আলো ফেলে ক্যামেরা চালাচ্ছিল।

পশুপালন পূর্ত ও গৃহমন্ত্রী শপথ নিতে উঠেছিলেন। জবরদস্ত আটষট্টি বছরের অক্ষয় দত্ত আর পাঁচজনের চেয়ে কিছুটা লম্বা হাসিখুশি মানুষ। বহুবার ছোট বড় নানান ব্যাপারে গত তিরিশ বছর ধরে খবর হয়ে আসছেন। কখনো অনশন, কখনো ট্রাম আন্দোলন—আবার কখনো হরতালের ডাক দেওয়ায় পয়লা পাতায় ছাপা কার্টুনের বিষয় হয়ে হয়ে তিনি কখনোই সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাননি। মঞ্চে উঠতেই রিপোর্টার, খেলোয়াড়, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার—সবার কাছ থেকেই অক্ষয় দত্ত হাত উঁচু করা অভিনন্দন পেলেন। মুখে হাসি, হাতা গোটানো হাফশার্ট, বুক পকেটে ডট পেনের পাশেই তাঁর বিখ্যাত পাইপে তামাক ঠেসে দেওয়ার গ্যাটা-পারচার ডাবুটা দেখতে পাওয়া গেল। লম্বা বলে মাইকের মাথাটাও উঁচু করে দিতে হলো। অক্ষয় দত্ত শপথ নিচ্ছিলেন—আর একটু একটু করে মন্ত্রী হয়ে উঠছিলেন। ছ' মিনিটের ভেতর ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়ে গেলেন। নতুন সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল সস্ত্রীক এসেছেন। এসেছেন সরকারী জোটের বড় শরিকদলের চেয়ারম্যান। বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর স্ত্রী। সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীও এসেছেন। ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিয়ে করার সময় পাননি। পরাধীন

আমলে অনুশীলনে ছিলেন। তিনি আগের অভ্যেসে খদ্দর পরে থাকেন। অক্ষয়বাবুর স্ত্রীও এসেছেন। এক সময় ইলা হেডমিস্ট্রেস ছিলেন। সাদা খোলের সাধারণ কিন্তু শোভন টাঙ্গাইল পরে এসেছেন।

বড় ফুটবল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারিরাও এসেছেন। এসেছেন নামজাদা ডাক্তাররা। মোদিদের ভেতর এল এন, গোয়েঙ্কাদের ভেতর সি পি—এমনি আরও অনেকে অক্ষয় দত্তের শপথ নেওয়া দেখছিলেন। ওঁরা সবাই এক-এক রকমভাবে জানেন এই মানুষটিকে—সত্ত যিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন।

অক্ষয়বাবুর শপথ নেওয়া শেষ হলো। বড় ফুটবলের এক মাথা চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানালেন—ডগলাস ডগলাস !!

তার দেখাদেখি আরও অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলেন, ডগলাস !!

বাংলা কাগজের এক সত্ত রিপোর্টার তার পাশের ভীষণ প্রবীণ এক রিপোর্টারকে আস্তে টোকা দিয়ে বললো, ডগলাস ? সে কি ব্যাপার দাদা ?

বাইফোকাল চশমা ঠিক করতে করতে তিনি চাপা গলায় বললেন, পরে বলছি—

ততক্ষণে অক্ষয় দত্ত নেমে পড়েছেন। নতুন অর্থমন্ত্রীও কিছু লম্বা। তার জন্য মাইক্রোফোন আরও টেনে লম্বা করা হচ্ছে।

নতুন পশুপালন পূর্ত ও গৃহমন্ত্রী নিজের চেয়ারে না বসে রিপোর্টার, মন্ত্রী, ডিপ্লোম্যাট, বিচারপতি, খেলোয়াড়, ব্যারিস্টার, অভিনেতা, ডাক্তার, লিডার, শিল্পপতিদের ভেতর দিয়ে দু'পাশে দু'খানা হাত বাড়িয়ে শামিয়ানার শেষদিকে চলে যাচ্ছিলেন। ইলা দেরিতে আসায় তাঁকে একটু পেছনের দিকে বসতে হয়েছে। অক্ষয় আজ একাই আগে চলে এসেছেন। তাঁকে প্রথম যেতে হয়েছে পার্টি অফিসে। তাঁর দল এই সরকারে একজন মাঝারি শরিক। পার্টির অফিস সেই পুরানো বাড়িতেই আছে এখনো। মঞ্চে শপথ নিতে উঠে অক্ষয় দত্ত ইলাকে দেখতে পেয়েছেন। ইলার চোখ স্থির। পলক

পড়েনি। অক্ষয়েরও পড়েনি। যেন দেখছিলেন। তিনি এখন ইলার পাশে গিয়ে বসবেন। নিশ্চয় কেউ ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেছনের খালি চেয়ারে চলে যাবে।

পাশে বসতেই ইলা বললেন, তোমায় না স্বাস্থ্য দফতর দেওয়ার কথা ছিল। কাল রাতেও তো চিফ মিনিস্টার ফোনে—

অক্ষয় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, আস্তে কথা বলো। শেষ মুহূর্তে কিছু চেঞ্জ হয়েছে। হেলথ আমাদের পার্টির হাতেই থাকছে।

ইলা কথা না বলে চুপ করে চোখের কোণ দিয়ে স্বামীকে দেখলেন। বিয়ের সময় অক্ষয় ছিলেন শেয়ার মার্কেটে ছোকরা ব্রোকার। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। পার্ট টাইম ব্রোকার-পার্ট টাইম অ্যাজিটেটর—এখন ফুল টাইম মন্ত্রী। মাঝখানে চৌত্রিশটা বছর টেরই পাওয়া যায়নি কোত্থেকে কেটে গেছে। এই জেল, এই অনশন, এই বিক্ষোভ মিছিল—এই হরতালের ডাক—আবার কিছুকালের জন্যে খবর থেকে হারিয়ে যাওয়া—আবার আচমকাই ভেসে ওঠা—এই লোকটি দীর্ঘ দিন একজন হেডমিস্ট্রেসকে ঘটনার চূড়ায় রেখে রেখে বুঝতেই দেয়নি কিছু—খেলা খেলা করে সংসার করা গেল—খেলা খেলা করে মন্ত্রীও হওয়া গেল। কতক্ষণে যে এই গণ্যমান্যের ভিড় থেকে বেরিয়ে গিয়ে দু'জনে একটু একা হওয়া যাবে। মেয়েরা তাদের বাবার মন্ত্রী হওয়া উপলক্ষে নিশ্চয় বাড়ি এসে অপেক্ষা করছে। মন্ত্রীবাবা বাড়ি ফিরলে দোর খুলে চির-পরিচিত ঘরে নিয়ে বসাবে তাঁকে। চাই কি মোড়ের দোকান থেকে অক্ষয়ের প্রিয় কড়াইশুঁটির চপ আনিয়ে রাখতে পারে।

অক্ষয় চুপি চুপি জানতে চাইলেন, তুমি কিসে এসেছো?

কেন? পঁচিশ নম্বর ট্রামে। নেমে হেঁটে এলাম।

কার্ড ছিল তো তোমার সঙ্গে?

দরকার হয়নি। পার্টির ছেলেরা গেটে ছিল। ওরাই এগিয়ে দিল।

ফিরবে কিসে?

তোমার সঙ্গে।

আমার তো ফেরা হচ্ছে না ইলা এখুনি। তুমি থাকো না সঙ্গে। রাজ্যপাল মন্ত্রীদের চা খাওয়াবেন। একটু কথাবার্তা বলবেন।

সে তুমি বলো গিয়ে। আমি ওখানে গিয়ে কি করবো। আমি দিব্যি একা একা চলে যাবো। মেয়েরা এতক্ষণে বাড়ি এসে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।

আমার গাড়িটা নিয়ে যাও। ওদের আটকে রাখবে ইলা।

—তোমার গাড়ি?

আমার মানে সরকারের গাড়ি। তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে'খন।

কিছু দরকার নেই। অতটা তেল পুড়িয়ে—যা দাম যাচ্ছে পেট্রলের।

রসিকতায় পেয়ে বসলো অক্ষয়কে। তুমি বুঝি রোজ সকালে পেট্রল দিয়ে চুলো ধরিয়ে নিয়ে চা করতে বসো!

আহা! বলে আর কথা বলতে পারলেন না ইলা দত্ত। গর্ব হচ্ছিল তার। লজ্জাও করছিল। আনন্দে এক রকমের বালি ঢুকে যায় চোখে সময়ে সময়ে। তাতে জল আসে। তিনি চশমা খুলে নিয়ে মাথা নিচু করে আঁচলে কাচ মুছলেন প্রথমে। তারপর সেই আঁচলেই চোখ চেপে ধরলেন ইলা। সেই অবস্থাতেই শুনতে পেলেন, পেছন থেকে—কোন কাগজের লোক হবে—কি যেন প্রশ্ন করেছেন—তার জবাবে অক্ষয় রসিক গলায় বলে যাচ্ছেন—

চিরকাল তো এ-লেন সে-লেনে বাস করছি। লেনে লেনেই বড় হয়েছি মশাই। কলকাতার বাসস্থান প্রবলেম, লেনে বাস না করলে জানা যায়!

কোন্ কোন্ লেনে ছিলেন?

একথাও লিখতে হবে নাকি! তাহলে শুনুন—স্কুলে পড়ার সময় ছিলাম পটুয়াটোলা লেনে। ছুতোরপাড়া লেনে থাকতে হেঁটে মোহন-বাগান মাঠে যেতাম। জেলেপাড়া লেনে থাকতে শিশির ভাদুড়ির সীতা দেখেছি। সারপেনটাইন লেনে থাকতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে নীলকণ্ঠ

কেবিনে গিয়ে—অনেক দিন উঠে গেছে—দু পয়সায় এক কাপ চা খেয়েছি। আর শুনবেন? ফরডাইস লেনে মেসে থেকে নাইন্টিন থার্টি কোরে ল পড়েছি। আমরা তো কলকাতার পোকা মশাই।

একজন সরকারী অফিসাব ঝুঁকে পড়ে বললেন, স্যার। চিফ মিনিস্টার বলছেন—আপনি সামনে এসে বসুন।

দু'টো চেয়ার কি খালি পাওয়া যাবে?

ইলা আপত্তি করে উঠলেন, তুমি যাও না। আমি তো একটু বাদেই উঠে যাবো।

অফিসার বললেন, দু'জনেই চলুন স্যার। ওঁর জায়গা করে দিচ্ছি। সি এম-এর ওয়াইফের পাশেই—

ইলা খুব লজ্জায় পড়লেন। মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি করে বললেন, একগাদা লোকের সামনে দিয়ে একটু পরেই উঠতে অসুবিধে হবে। আপনাদের মিনিস্টারকে নিয়ে এগিয়ে যান তো।

অফিসার ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। ইলা দেখলেন, তাঁর বড মেয়ের চেয়েও ছোট হবেন। ছেলেটি ভাবতেই ভাল লাগে। সে ইলাকে বললো, তাই হবে।

অগত্যা অক্ষয় দত্তকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলো। দুই রোয়ের ভেতর দিয়ে তিনি ডায়াসের দিকে হাঁটছিলেন। সেকেণ্ডারি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, নামজাদা সারজন, যাদবপুরের ভি সি —সবাইকেই কোন না কোন ভাবে তিনি চেনেন। মোদিদের ব্যবসার হেড অফিস কলকাতা। ওদের বাড়ির এল এন—লক্ষ্মীনারায়ণ এসেছেন। অক্ষয় হাত তুলে ফেলে নামিয়ে নিলেন। শুধু হাসলেন। লক্ষ্মীনারায়ণও হাত তুলেছেন।

অক্ষয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ হেয়ার স্কুলে পড়তো। মা আমাদের টিফিন দিতেন দই চিড়ে। লক্ষ্মীদের বাড়ি থেকে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা খাবার আসতো অনেক রকম। অক্ষয়কে দু'এক দিন দিয়েছে লক্ষ্মী। পরে ট্রেড ইউনিয়ন লিডার হিসেবে অক্ষয় দত্তকে এল এন-এর মুখোমুখি বসতে হয়েছে একই টেবিলে। কত কারখানা। কত ইউনিয়ন।

কত ধর্মঘট। বোনাস নিয়ে নেগোসিয়েশনের পর কোম্পানি অফিসাররা বলতেন, মিঃ দত্ত আপনার ক্লাসফ্রেণ্ড নাইন্থ ফ্লোরে আপনার জন্য চা নিয়ে বসে আছেন। একটু ঘুরে যেতে বলেছেন।

অক্ষয়ের কোন দিন কোন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। বোনাস আলোচনা মিটে গেছে। এখন তো আর মালিক নয়। এখন ক্লাস-ফ্রেণ্ড। দুই বন্ধুতে চায়ের কাপ সামনে রেখে নাইন্থ ফ্লোরে হেয়ার স্কুলের ক্লাস এইটের আলো, গন্ধ ফিরে জাগিয়ে তুলতেন। তখনই হয়তো জানলার বাইরে নিচে—পুজোর আগে আগে—বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে দাবি মিছিল চলেছে ডালহৌসি দিয়ে।

সেই যে বাংলার টিচার ছিলেন অক্ষয়—কি যেন নাম—পোয়েট—

কবি গোলাম মোস্তাফা। ডাকঘরে অমলের পার্টে আমায় রিহার্সেল দিয়েছিলেন—তোমার সব মনে আছে লক্ষ্মী ?

হেয়ার স্কুল অব দোজ ডেজ—

দীনুঠাকুর আমাদের গান শিখিয়েছিলেন।

হ্যাঁ খুব মোটা ছিলেন। রবিবাবুদের বাড়ির মানুষ—

দীনুবাবু রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন—লক্ষ্মী।

মাত্র কয়েক পা গেলেই ডায়াস। এ ক'পা যেন পার হতে পারছেন না নতুন পশুপালন পূর্ত ও আবাসন মন্ত্রী। অক্ষয়ের মনে হলো, এখান থেকে ডায়াস—মাঝখানে পড়ে আছে প্রায় চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর। এখন তিনি বিপ্লবী পার্টির মন্ত্রী। মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি। পুঁজিবাদী ক্লাসফ্রেণ্ডের হাসি মুখ হাত-তোলা-অভি-নন্দনের জবাবে হাত তোলেন কি করে ? হাতের ভিতরকার কলকাঠি নিজেই যেন হাতকে উঠতে দিলো না।

ডাক্তার সর্বাধিকারী হাত ধরে ফেললেন অক্ষয়ের। আরেক ক্লাসফ্রেণ্ড। হিতৈষী গলায় বললেন, টেনশন এড়িয়ে চলবে। পারলে পাইপ ছুঁড়ে ফেলে দিও। আবার তামাক কেন ?

অক্ষয় শুধু হাসলেন। ভালো আছো ? তক্ষুণি মনে পড়লো—সর্বাধিকারী কী ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট ছিল. চার টাকার মাস মাইনে.

ওকে আর কোন দিন দিতে হয়নি স্কুলে। আমারটা মাঝে মাঝে বাকি পড়ে যেতো। বাবা কো-অপারেটিভে তখন মাইনে পেতেন বোধহয় শ'খানেক টাকা। মা বলতেন—কো অপ্‌—

রাজভবন থেকে মন্ত্রীরা রাইটার্সে যে যার দফতরে চলে গেলেন। ঘরের দরজায় অক্ষয়কে নমস্কার করলো অনেকে। ডেপুটেশন নিয়ে দু একবার অক্ষয় বিধানবাবুর বাড়ি গেছেন। চিফ মিনিস্টার বিধান-বাবুও তাঁকে আদর করে ডাকতেন—কি ডগলাস। রোদে টো টো করে শরীরটা কি করেছো? আয়নায় দেখেছো?

এখন কি আর শরীর দেখার সময় আছে ডক্টর রায়। অপোজি-শনকে রোদে ঘুরতেই হবে।

আজ থেকে অক্ষয় নিজেই ট্রেজারি বেঞ্চের লোক। ক্যাবিনেট মিনিস্টার। রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিনিয়রিটিতে সে চার নম্বর। বড় শরিক দল থেকে অর্থমন্ত্রী হলেন গিয়ে পাঁচ নম্বর। রাইটার্সে কখনো আসেননি অক্ষয় দত্ত। নিজের অফিসঘরে ঢুকে দেখেন—এলাহি কাণ্ড। তার ছোট-ফ্ল্যাট বাড়িটা বোধহয় এ ঘরে ঢুকে যাবে। তিন-খানা এয়ারকুলার, পাঁচটি টেলিফোন। এনগেজ্‌ড বোঝাবার জন্য লাল ডুম। পুরু গদির রিভলবিং চেয়ার। অক্ষয় গিয়ে বসলেন। ঘোরানো হর্সস্যু টেবিলের ওপিঠে দাঁড়ানো অফিসারদের বসতে বললেন। বসুন আপনারা। বসুন। আমরা পাবলিককে ক্লিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিতে চাই। একজন সাধারণ মানুষের যেন সরকারী মেশিনারী সম্পর্কে বিশ্বাস ফিরে আসে—এই হবে আমাদের মটো। খানিক আগে শপথ গ্রহণের পর শামিয়ানা ফাঁকা হতে গভর্নর খানিকক্ষণ মন্ত্রীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করলেন। অক্ষয়ের দিকে তাকিয়ে গভর্নর বলেছিলেন—ইউ আর ভেরি পপুলার।

অক্ষয়কে সবদিক সমঝে চলতে হয়। সি এম তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। কিন্তু অনেক দিনের বন্ধু। তার সামনে রাজ্যপালের মুখ থেকে পপুলারিটির সার্টিফিকেট পাওয়া সুখের নাও হতে পারে শেষ পর্যন্ত।

ফোন বেজে উঠল টেবিলের। হ্যালো।

সি এম কথা বলবেন।

দিন।

হ্যালো অক্ষয়বাবু। আজ নাইট শোতে একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয়? যা টেনশন গেল ক'দিন।

দেখলে তো ভালোই হয়। কিন্তু আপনি তো শুধু চিফ মিনিস্টার নন্—আপনি একজন জনপ্রিয় জননেতা।

রাখুন তো মশাই। আপনি আর আমি তিরিশ বছর পাশাপাশি মিটিং—অ্যাজিটেশন—অ্যাসেমব্লিতে ওয়াক আউট করে আসছি। না হয় চলুন ইভনিং শোতে যাই—মাথাটা সাফ করে আসি গিয়ে—

আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু আপনি গেলে তো হাউসে ভিড় হয়ে যাবে।

সিকিউরিটি তো থাকছেই। আমাদের কি কোন প্রাইভেট লাইফ থাকতে নেই!

আপনার জেগে থাকা—আপনার স্বপ্নও জনগণ ওয়াচ করতে চায়।

এ তো বড় আব্দার মশাই।

জনগণের আব্দার মেনে নিতেই হবে আপনাকে—তারা সি এম-এর কাছে অনেক কিছু চায়।

আদিখ্যেতা আর কি! উনিশ-বিশ হলে তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাহলে কি করবেন অক্ষয়বাবু?

সন্ধ্যেবেলা তো আমায় একবার পার্টি অফিস যেতে হচ্ছে।

তাহলে আজ বাদ দিন অক্ষয়বাবু।

আরেক দিন হবে'খন। বলে অক্ষয় টেলিফোন রাখলেন। যাক্ গভর্নর তাঁকে চিফ মিনিস্টারের সামনে পপুলার বলেছিলেন। সেই দায়টা কাটান দেওয়া গেল। এ রাজ্যে ডাক্তার ব্যারিস্টারই বেশী সি এম হয়েছেন।

হাউসিংয়ের সচিব এসে টাইপ করা প্রায় এক দিস্তে কাগজ দিলেন। অনেকগুলো মেমো আছে স্যার।

এত কাগজ আমি এখন পড়বো কি করে ?

বিশেষ কিছু নেই ওতে।

বলুন না, কি কি আছে—

সিভিলে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের সিনিয়রিটির একটা ফাইল আছে। আর আছে সুন্দরবনের এমব্যাংকমেণ্টের ফাইল। অনেক জায়গায় বাঁধ ধুয়ে গেছে। দিল্লির বঙ্গভবনে জায়গা বাড়ানো দরকার। স্টেট হাউসিং মিনিস্টারদের কনফারেন্স হবে দশ তারিখ—প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বারদের সঙ্গে। আমরা মনে করি হাউসিংকে যদি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রাইওরিটি লিস্টে ফেলা যায়—তাহলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে যোজনা কমিশন থেকে।

এটা আগে করা হয়নি কেন ?

আগের সরকারও চেষ্টা করে আসছিলেন।

অনেক ফ্ল্যাট বাড়ির ভাড়া সরকার নাকি পাচ্ছেন না ?

হ্যাঁ স্যার। হাউসিং এস্টেট আমাদের হেডএক্ এখন।

এভিকশন নোটিশ দিন। ভাড়া না পেলে আমরা নতুন বাড়ি বানাবো কি করে ?

রূপনারায়ণের ওপর শরৎ সেতুর বাঁ দিকে মাঝামাঝি একটা গার্ডার খানিকটা বসে গেছে। আমরা একটা প্রিলিমিনারি স্টাডি করেছি।

হয়েছেটা কি সেখানে ?

খানিকটা বসে যাওয়ায় বাস, হেভি লরি যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

আমি কাল দেখতে যাবো। আপনি সঙ্গে থাকবেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজকে থাকতে বলবেন সঙ্গে।

হ্যাঁ স্যার।

এবার অনেকক্ষণ পরে অক্ষয় দত্ত নিজের ঘরটা ফাঁকা পেলেন। হেঁটে গিয়ে টয়লেটটা দেখলেন। টয়লেটের জানলায় তাকালে রাইটার্সের আরেকটা বাড়ি চোখের পথ আটকায়। ওই বাড়ির পেছনেই স্টক এক্সচেঞ্জ। ওখানে প্রথম যখন যান তখন অক্ষয়ের

বয়স ছিল পঁচিশ। সেটা উনিশ শো ছত্রিশ। কিছু বুঝতেম না ওসব। গান্ধীবাদী সরলদা তাকে হাতে ধরে ওখানে নিয়ে যান। বলেছিলেনও তুমি তো পলিটিকস্ করো। কেউ তোমায় চাকরি দেবে না। আমি তোমায় প্রথম প্রথম কিনিয়ে দেব—আবার সময় মতো শেয়ার ছেড়ে দেবে। ডিফারেন্সটাই তোমার আয়। উনিশ শো বিয়াল্লিশে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেলাম। ধরা পড়লাম উলুবেড়িয়ার এক গাঁয়ে। তিন বছরের মেয়াদ হলো। আমি বাড়ির বড় ছেলে। বাবা বলেছিলেন—তোমাকে আয় করতে হবে। সংসারে টাকা দেওয়া দরকার তোমার। তাই আমার শেয়ার বাজারে যাওয়া। টুকটাক আয় করতাম। বাবাকে দিতাম। নিজের খরচটা চলে যেতো। আবার একটানা ছ'মাস হয়তো পুরনো অনুশীলনের রবি সেনের কথায় হাওড়ায় কারখানায় কারখানায় ঘুরছি। আবার একদিন সরলদার কাউণ্টারে এসে উদয় হতাম। পয়সা নেই সরলদা। সব ফুরিয়ে গেছে।

সরলদা খুব ঠাণ্ডা গলায় বলতেন—তাহলে অক্ষয় ফিনলের তিনশো শেয়ার তোল আজ। কাল বেলাবেলি ছেড়ে দেবে।

এমনভাবে বলতেন—যেন গতকালও আমি সরলদার কথায় শেয়ার কিনেছি-ছেড়েছি। আসলে গতকাল তো আমি বেলিলিয়াস রোডের ঢালাই কারখানায় গেট মিটিং করেছি।

এই শেয়ার মার্কেট আমার যৌবনের উপবন। উনিশ শো পঁয়তাল্লিশে জেল থেকে বেরিয়ে ওখানে গিয়ে দেখি সরলদা আর নেই। কেউ তাঁর কোন হদিস দিতে পারলো না। চারদিকে ডিপ্রেশন। স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট ক্র্যাস করেছে। যুদ্ধ শেষ। আমার প্রথম যৌবনের উপবন তছনছ। ওখানেই ইলার কাকারা এসে আমায় দেখে পছন্দ করে যান।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে পর্দার সামান্য আড়াল। সেখানে একখানা ইজিচেয়ার। অক্ষয় প্রথমে বসলেন। তারপর হাত পেছনে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আঃ! যৌবনে স্টক এক্সচেঞ্জের ওই গলিতে আমার রক্তের ভেতর শেয়ারের ওঠানামায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বর উঠতো

নামতো। তখন কি একবারও ভাবতে পেরেছি—পাশের এই লাল বাড়িটায় একদিন স্বাধীন দেশের মন্ত্রী হয়ে ঢুকবো? এক এক দিন গভীর রাতে ফরডাইস লেনের মেসের ঘরে ছারপোকার কামড়ে উঠে বসেছি। তখন জিন্নার কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কংগ্রেস হ্যাঁ বা না--কিছুই বলছে না। তখন মালব্যজীর কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি গড়ে উঠলো। সামনে সেণ্ট্রাল অ্যাসেমব্লির ইলেকশন। ছ'টি সিটেই আমাদের ক্যাণ্ডিডেট জিতলো। স্টেট কমিটির আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি। সারা দেশ জুড়ে অ্যাজিটেশন। তখন বাংলায় আমাদের নেতা শরৎবাবু—শরৎ বোস। অ্যালবার্ট হলে অফিস খুলেছি। কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে পেরে উঠলো না। ছ'টা সিটেই হেরে গেল। জিতলেন অখিল দত্ত, প্রমথ ব্যানার্জী, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। আরও যেন কে কে। নৌকোয় নৌকোয় তিন মাস ঘুরেছি। সাধারণ মানুষকে হেরিকেনের আলোয় সন্ধ্যাবেলা বুঝিয়ে বলেছি। আলোর বাইরেটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। কবে দেশ স্বাধীন হবে জানি না। পরাধীন থাকার অপমান যে কি এখনকার ছেলেরা জানে না। নৌকো থেকে নেমে সাত মাইল রাস্তা হেঁটে গেছি। তারপর সভা। হেরিকেনও জোটানো যায়নি। চাঁদের আলোয় দলের কর্মীদের সঙ্গে বসেছি। কেউ কারো মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। পাশেই ঝিঁঝি ডাকছে। বড় বড় পোকা উঠে এসে টপাং টপাং শব্দ করে মাদুরে পড়লো। পট করে মনে পড়লো আমরা পরাধীন জাতি। আমাদের ভেতরে ভীষণ ঝগড়া। কেউ কোন ব্যাপারে একমত নই। তখনকার স্টলওয়াটরা এখন কোথায়। দেশের ইতিহাস বোধহয় এমনই হয়। সেদিনকার ভলাণ্টিয়ার আজকের মন্ত্রী। অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবি সেন ওরা রামগড় কংগ্রেসের আগেই সরে এসেছেন। কিছু কম সিনিয়র দাদারা রামগড় থেকেই সরে এসে পার্টির পত্তন করলেন। সে দল আজ এই বাংলায় সুন্দরবন, পলাশী, পাগলাচণ্ডী, বহরমপুর, নদীয়ার জায়গায় জায়গায় শেকড় নামিয়ে

দিতে পেরেছে। শিকড় নেমেছে বন্দরে—চা শ্রমিকদের উত্তরবঙ্গেও। অক্ষয়ের মনে পড়লো সে একজন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী।

সন্ধ্যেবেলা একখানা ঝকঝকে অ্যামবাসাডর ধর্মতলা স্ট্রীটে পার্টি অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। চারতলা পুরোন বাড়ি। দোতলায় উঠে পার্টির বসার ঘরে বড় ফরাসে সবাই বসে। অক্ষয়ও গিয়ে বসলেন। অন্য দিনের চেয়ে একটু ভিন্ন চোখে যেন তার সঙ্গী-সাথীরা তাকে দেখছে। অক্ষয় সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি নিজেও জানেন—এ হাসির কোন চরিত্র নেই। যেন দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। একে একে দলের আরও তুই মন্ত্রী এলেন। তু'জনই অক্ষয়ের চেয়ে বয়সে ছোট।

পার্টি প্রেসিডেণ্ট ছোট বক্তৃতা দিলেন। সংগ্রামী মানুষের এ লড়াই যেন মহাকরণে গদি পাওয়াতেই শেষ না হয়ে যায়। সরকারে অংশ নেওয়া মানে—বিপ্লবের বর্শাকে সময় ও সুযোগ মতো শান দিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে—কেন্দ্রের শাসকশ্রেণী আমাদের মাথার ওপর শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে।

এতো গেল দলের সরকারী চেহারা। প্রেসিডেণ্ট হর্ষ ঘোষ পার্টি অফিসেই থাকেন। তিনখানা ঘর নিয়ে অফিস। প্রথম ঘরখানায় শালু ব্যানার পোস্টার থাকে। দ্বিতীয় ঘরখানায় ছ' ছ'টা আলমারিতে কার্ড হোল্ডার সভ্যদের তালিকা বই, চাঁদার খাতা। হোলটাইমারদের ঠিকানা বই। কুপন বই। রসিদ—আরও কী সব হাবিজাবি। অক্ষয়ের মনে পড়লো—সেও প্রায় দশ বছর আগে অব্দি এই পার্টি অফিসেই মাঝে মাঝে রাত কাটিয়েছে। ফ্রণ্ট র‍্যাংকের নেতা হয়ে ওঠার পর থেকে অক্ষয়কে আর এখানে থাকতে হয় না।

শেষের ঘরখানায় থাকেন হর্ষবাবু। সে ঘরেই তিন মন্ত্রী গিয়ে বসলেন। টেলিফোন। শোবার খাট। টেবিল। একটা লোহার ক্যাশবাক্স। নীলামে কিনে এনেছিলেন অক্ষয় দত্ত।

হর্ষ আর অক্ষয় একই বয়সী। হর্ষ এক সময় অফিস দেখতেন—অক্ষয় বেরিয়ে পড়তেন জেলায় জেলায়।

নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, নতুন বনমন্ত্রী অক্ষয়ের তুলনায় অনেক পরে পার্টিতে এসেছেন। বনমন্ত্রী বোধহয় অক্ষয়েরই রিক্রুট। গত আট-দশ বছরে বনমন্ত্রী প্রবোধ হালদার পার্টির ওপরতলায় উঠে এসেছে ধাপে ধাপে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে পরাধীন আমলে জেলেই আলাপ হয়েছিল অক্ষয়ের।

হর্ষ ঘোষ বললেন, তোমরা তিনজনই জানো—ইলেকশন লড়ার পর পার্টির ফাণ্ডের অবস্থা কতটা কাহিল। টেলিফোন বিল এক বছরের ওপর বাকি পড়ে আছে। লাস্ট রিমাইণ্ডার এসে গেছে। এবার বাড়ি ভাড়াটাও পরিষ্কার করা দরকার।

প্রবোধ বললো, র‍্যাংক অ্যাণ্ড ফাইলের অনেকেই আশা করেছে—এবার তারা চাকরি পাবে। পার্টির মহকুমা কমিটির অন্তত একজন দু'জন করে চাকরি দেওয়া দরকার।

অক্ষয় বললো. আমরা তো কোনদিন পাইয়ে দেবার রাজনীতি করিনি প্রবোধ। সবার তো জানাই আছে—দেশে সবার যা হবে—ওদেরও তাই হওয়ার কথা।

অক্ষয়দা এভাবে কত দিন চলতে পারে বলুন? এক-একজন কমরেডের বয়স হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে-থা হয়নি। মা-বাবা ভাইবোন আছে। তাদের খরচখরচা আছে। মানুষ তো আমরা সবাই!

হর্ষ ঘোষ বললেন, একসঙ্গে সব হবে কি করে প্রবোধ? বিপ্লব তো হয়ে যায়নি।

হৃষীকেশ বললেন, বিপ্লব! প্রবোধরা হয়তো দেখবে। আমাদের লাইফ টাইমে হবে না। কি বলেন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয় বলল, বিপ্লবের চেহারা তো সব সময় এক রকম থাকে না। চৈতন্যদেবও তো তাঁর সময়ের বিপ্লব করেছিলেন।

প্রবোধ তেতে উঠলো, রাখুন তো অক্ষয়দা ইতিহাস ভূগোলের কথা? এরপর নিশ্চয় গৌতম বুদ্ধের বিপ্লবের কথা তুলবেন আপনি। আমরা ভাবছি—কি করে ক্যাডারদের একটু-আধটু রিলিফ দিতে

পারি। খানিকটা স্বস্তি। এই সংগ্রামী ক্যাডাররাই আমাদের পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন।

অক্ষয় চুপ করে থাকতে পারলেন না। ছাখো প্রবোধ—লিডার ছাড়া ক্যাডার হলো রাতকানা। আর ক্যাডার ছাড়া লিডার হলো ঠুঁটো জগন্নাথ। আমরা একে অন্যের পরিপূরক।

হর্ষ ঘোষ মাঝখানে কথা বলে উঠলেন। তা প্রবোধ তোমার বন দফতরে ছাখো না কোন কাজ হয় কিনা।

আমি আর কি করতে পারি। ভেকান্সি বলতে তো ফরেস্ট গার্ড। সে কাজে ওদের পোষাবে কি ? তাছাড়া এসব চাকরি তো সুন্দরবন নয়তো নর্থ বেঙ্গলের ফরেস্টে। কেউ কি তার মহকুমা স্টেশন ছেড়ে যেতে রাজি হবে ? না, আমাদের পার্টির পক্ষেও ওয়াইজ হবে ? অথচ বুঝতে পারছি একটা কিছু করা দরকার।

ওভাবে ভাবলে হবে না প্রবোধ। কথাটা বলে হর্ষ ঘোষ বাকি দুই মন্ত্রীর চোখে চোখ রাখলেন। তোমরা জানো স্মল টাউন প্রফেশনাল—বিজনেসম্যানরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ফাণ্ডে যেমনি টাকা দিয়েছে—তেমনি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান এরিয়ায় আমরা চা, পাট, আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল—বিশেষ করে এই তিন ইণ্ডাস্ট্রি থেকে ইলেকশন লড়ার টাকা পেয়েছি।

প্রবোধ বললো, কেন ? পাবলিক আমাদের ডোনেশন দিয়েছে।

পাবলিক ? পাবলিক আর ক' পয়সা দিয়েছে। একটা পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সিতেই পাঁচ ছ' লাখ টাকা লেগে যায়। অ্যাসেমব্লির সিটেও আজকাল দু'লাখের নিচে হয় না। অবশ্য মফঃস্বলে একটু কম পড়ে। তা এ টাকা যোগাড় করতে আমাকে হাবুডুবু খেতে হয়েছে। যারা দিয়েছে—তারা তো কিছু আশাও করে—

অক্ষয় বললো, এ এক আশ্চর্য খেলা। গণতন্ত্র মানেই ভোট—আর ভোট মানেই টাকা। ইলেকশন তো টাকারই খেলা।

হর্ষ ঘোষ বললো, এ কি ফেরে পড়া গেছে বলতো ? ছিলাম বিপ্লবী পার্টি। এখন বিপ্লবের বারোটা বাজার যোগাড়। ভোটের

চাকায় ঢুকে পড়ে টাকার খেলায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে এই ব্যবস্থাকেই ভাঙবো বলেছিলাম—এখন দেখছি এই ব্যবস্থাই আমাদের গিলে খেতে চায়! এ ভাই কোন্ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে শুনি?

দ্যাখো হর্ষ বিপ্লব কথাটা বোধহয় ভোলার সময় এসেছে। কথাটা বলে অক্ষয় থামলো একটু। তারপর বললো, সারা ভারত জুড়ে শাসক শ্রেণীর নেটওয়ার্কে কয় পার্টি মিলে আমাদের জোট তো সিন্ধুতে বিন্দু।

প্রবোধ বললো, দেখুন অক্ষয়দা অতটা নিরাশ হবেন না। আমাদের ইমেজ কি শাসকশ্রেণীর ইমেজকে ভাঙতে শুরু করেনি?

অতবড় পাঁপরের একটা কোণ ভেঙে কি খুব লাভ হচ্ছে!

একদিন সমস্ত পাঁপরখানাই মাঝখান থেকে ভেঙে যাবে দেখবেন।

তার আগে প্রবোধ কেন্দ্রের শাসকরা এমন কিছু মেজার নেবে—যা কিনা আমাদের লেফ্‌ট ইমেজ থেকে বাম চরিত্রটাই শুষে নেবে ব্লটিং পেপারের মতো। সেবারে ব্যাংক, কয়লা, ইনসিওরেন্স ন্যাশনালাইজ করে শাসকশ্রেণী কিছুদিনের জন্যে আমাদের অ্যানিমিক করে দিয়েছিল—মনে আছে?

আমরা তো আবার জনগণের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছি অক্ষয়দা।

নিজেদের কোন লেফ্‌ট ইজমের জন্যে উঠে দাঁড়াইনি প্রবোধ। উঠেছি ওদের সিস্টেমের ভেতরকার ত্রুটিগুলো একটা একটা করে জনগণের চোখের সামনে তুলে ধরে। বেতনভুক কর্মীদের সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়নের দর কষাকষিতে। কিন্তু এই দর কষাকষি কি আমাদের একটা বিরাট নেগেটিভ দিকে ঠেলে দিচ্ছে না?

হর্ষ ঘোষ বললো, গান্ধীজী নিজেই তো সারা দেশকে এমন কতকগুলো নেগেটিভ ঝোঁকের দিকে ঠেলে দিয়ে জনগণকে জাগিয়েছিলেন। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথ এই ঝোঁককে সমর্থন করতে পারেননি কোন দিন।

সেটা ছিল বিদেশী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার লড়াই।

কিন্তু এখন তো যুদ্ধ দিশী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। ওদের হাতে অস্ত্র অনেক। পার্লামেন্টে বিপুল গরিষ্ঠতা। সংবিধান। ফাণ্ডামেণ্টাল কনসেশন দিয়ে শাসকশ্রেণী আমাদের চেয়েও বিপ্লবী চেহারা নিয়ে ফেলবে।

হৃষীকেশ বললেন, বৃটিশের ফেলে যাওয়া পাম্পস্যু পায়ে গলিয়ে ডক্টর রায় রাজ্য চালিয়ে গেছেন। কেন্দ্রের শাসকশ্রেণীর কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের দাম ছিল। তিনি টাকা এনেছেন সেণ্টার থেকে—দুর্গাপুর বানিয়েছেন। আমরা যে কি বানাবো জানি না।

অক্ষয় দত্ত বললেন, আমাদের বোধহয় ডঃ রায়ের পাম্পস্যু পায়ে গলাতে হবে। সে জুতোয় ফোস্কা পড়বে। আর তাতেও কি সুবিধে হবে? বেতনভুক মেহনতী মানুষকে কোমরের বেল্ট একটু কষে বাঁধতেও বলা যাবে না। তাহলে ওরা গোঁসা করে যদি আবার আগের আমলকে ফিরিয়ে আনতে চায়! তাই—

তাই কি অক্ষয়দা? বলুন না—

পে কমিশন বসাতে হবে। ডেভলপমেণ্টের টাকা কেটে এনে মাইনে বাড়াতে হবে। বেসরকারী ইণ্ডাস্ট্রিকে মায়না বাড়াতে—মজুরি বাড়াতে বলে নিজেদের কর্মচারীদের না খেয়ে থাকতে বলতে পারি না। নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। তার দাম বেঁধে দিচ্ছে সেণ্টারের শাসকশ্রেণী। ফলে ইনফ্লেশন আমরা রুখবো কি করে? রোজ সাধারণ মানুষের টাকার দাম কমে যাচ্ছে প্রবোধ।

কিন্তু আলুর দাম তো আমরা কমাতে পারি।

না, পারি না। ওয়াগন রেলের। রেল যদি সময় মতো সিমলার আলু না নিয়ে আসে তো এখানকার আলু ব্যারনরা দাম চড়াবেই।

তাহলে আমরা কি করবো?

ওই তোমার রাস্তায় চলতে হবে। পাইয়ে দেবার রাজনীতি! আর সর্বনিম্ন মজুরি বেঁধে দেওয়া। কাজ না দিতে পারি মজুরি তো বেঁধে দিতে পারি! বেনামা জমি খুঁজে ভূমিহীনকে দিতে পারি।

অবিশ্যি একফসলী কিছু জমি দিয়ে ভূমিহীনকে দাঁড় করানো যাবে না। বড় পার্টি বলছিল, এভাবে অ্যাওয়েকিনিংয়ের আলো ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ভূমিহীনকে জমির সঙ্গে সঙ্গে সার, জল, বিষ—ফসলের যুক্তিসম্মত দাম দেওয়ার টাকা বা শক্তি—কোনটাই আমাদের নেই।

হর্ষ গম্ভীর হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সে এবারে মুখ খুললেন, আর কিছু অধিকার দেওয়া যাবে। ভাগচাষীকে চাষের অধিকার রেকর্ড করার সুযোগ দেওয়া যাবে—অবশ্য সে অধিকার রক্ষায় আমরা কতটা এগোতে পারবো জানি না। ভূমিহীনকে জমি দিয়ে—ভাগচাষীকে চাষের অধিকার দিয়ে প্রোডাকশন বাড়ানো যাবে কিনা বলতে পারি না।

হৃষীকেশ বললেন, একজন ইকনোমিস্ট্ বলছিলেন—অ্যাওকেনিং আর অধিকার দিয়ে উৎপাদন কিংবা সমৃদ্ধি বাড়বে না—বরং দারিদ্র্য ভাগ করে নেওয়াই সার হবে। তার চেয়ে এক্ষুণি সর্ষে, মুসুরির ডাল, আলু, পেঁয়াজের ফলন বাড়ানো দরকার। কাঁচালঙ্কাও আরও ফলানো দরকার। সে জন্যে আরও সার—আরও জল দরকার—

তাতে বড় চাষীরা আরও ফুলবে—ছোটচাষী আরও শুকোবে—ক্ষেত-মজুর তো উঠেই যাবে হৃষীকেশবাবু। আসল কথা—আমাদের দেশে ক্যাপিটালিজম্ই পুরোপুরি গজিয়ে উঠতে পারলো না। তাই যদি গজাতো তো—তার ভেতরকার বিরোধ—কণ্ট্রাডিকশন থেকেই বিপ্লবের সলতে ধরানো যেতো। এখনো আমাদের কৃষি সবে হামাগুড়ি দিচ্ছে। শিল্প পাবলিক সেকটরের ফিডিং বোতল মুখে দিয়ে হাত পা ছুঁড়ছে শুয়ে শুয়ে। সেই সঙ্গে মজুরির অনুপাতে কোয়ালিটি লেবার নেই। আছে দলাদলি। আমলাবাজি। আর আছে থার্ড ওয়ার্ল্ডের গলগণ্ড-র্যাম্পান্ট করাপশন। এর ভেতরে ঢুকে বিপ্লবের বর্শাকে শান দেবো—না, তার আগেই হাড়মাস শুদ্ধ হজম হয়ে যাবো।

নতুন বনমন্ত্রী প্রবোধ হালদার সবচেয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেছেন। শুকনো হাসি হেসে বললেন, তাহলে বলুন অক্ষয়দা—আমরা বাঘের

পিঠে বসে আছি। সরকার থেকে নেমে দাঁড়ালে পাবলিক খেয়ে ফেলবে আমাদের—জনগণ হেরো! হেরো!! বলে ছুয়ো দেবে। আর সরকারে থেকে গেলে আমরা নিজেরাই হজম হয়ে যাবো।

এরপর কথা আর একটুও এগোল না। ওঠবার মুখে হর্ষ ঘোষ বললেন, অক্ষয় তোমাকে আর হৃষীকেশকে একবার চায়ের লোকজনের সঙ্গে বসতে হতে পারে। বন্দরে চায়ের পেটি জাহাজ বোঝাইয়ের ব্যাপারে ওরা ইউনিয়নের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তিতে বসতে চায়—

সিঁড়ি অব্দি এগিয়ে এসেছিলেন হর্ষ ঘোষ। নামতে নামতে অক্ষয় দত্ত বললেন, বসতে তো হবেই। আমার গাউটের ব্যথাটা আবার চাগাড় দিচ্ছে। পার্টির স্টুডেণ্ট ফ্রণ্টে মন দেবার জন্যে প্রবোধ রোজ খানিক সময় অফিসে এসে বসবে এবার থেকে। আমি বলবো—তুমিও বলো প্রবোধকে।

মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার পর সব মন্ত্রীর জন্য গাড়ি বরাদ্দ হয়েছে। হৃষীকেশ বিয়ে করেনি। সে মেসে থাকে। গাড়ি তাকে নিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডের দিকে চলে গেল। প্রবোধ গত বিধানসভাতেও মেম্বার ছিল। সে চলে গেল কিড স্ট্রীটে। এম এল এ হস্টেলে।

গাড়ির জানলায় বসে প্রবোধের কথাটা মনে ভেসে উঠলো অক্ষয়ের। রাইডিং দ্য টাইগার!

প্রতুলদা, রবিদা যেবারে বিপ্লবের ডাক দিলেন—পার্টির তাত্ত্বিক লাইনের সঙ্গে অক্ষয়ের অমিল হয়েছিল। দলের শৃঙ্খলা সে ভাঙেনি। শুধু চুপ করে সরে দাঁড়িয়েছিল। নেহরু সরকারের বয়স তখন তু'বছরও হয়নি। পার্টি ব্যান হয়ে গেল। ক'দিন অন্তর এক পাতার বেআইনী বুলেটিন বেরুতো। স্টুডেণ্ট ফ্রণ্টের কয়েকটি ছেলে হেদোতে এক পুলিশ পিকেটের ওপর বোমা ফেলতে গিয়ে ধরা পড়লো। শুধু তু'জন ছিটকে বেরিয়ে আসে।

রবিদা একদিন বর্ষার বিকেলে নস্যি রঙের র‍্যাপার জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন। গ্রেফতার এড়ানো সেই তুটি ছেলে রবিদার সঙ্গে তর্ক

করতে করতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড এক ঠেকে এসে হাজির। হাতে তাদের একখানা বুলেটিন। সেখানে অক্ষয় দত্ত নিজেও ছিলেন।

রবিদাকে সোজা কাগজখানা দেখিয়ে জানতে চাইলো, এই যে হেদোর ঘটনা লিখেছেন—এসব সত্যি ?

যা ঘটে তা পরে রিপোর্ট করা হয়তো। তাই উনিশ বিশ হতে পারে। আমরা এমনিতে একটু কমিয়ে লিখি। আণ্ডার প্লে করাই নিয়ম।

লেখা হয়েছে—বোমা পড়ার পর হাজার হাজার লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বিপুল সমর্থন জানায়। কিন্তু আসলে তো আমাদের কেউ সমর্থন করেনি।

ওটা বুঝলে না? নর্থের এই ঘটনা দিয়ে আমরা সাউথ ক্যালকাটার মোরেল বুস্ট্ করতে চাইছিলাম। সাউথে কোন অ্যাকশন হচ্ছিল না। তাই—

এই যে লিখেছেন—সাউথ ইণ্ডিয়ায় নলগণ্ডায়-বরঙ্গলে মুক্তি-বাহিনী এগিয়ে চলেছে—

হ্যাঁ চলেছে তো।

এটা তো ক'দিন আগের ঘটনার রিপোর্ট।

হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে ? কি বলতে চাও তোমরা দু'জন ?

বলতে চাই—তাহলে মুক্তিবাহিনী এত দিনে নলগণ্ডা-বরঙ্গল দুটি জায়গাই দখল করে নিয়েছে নিশ্চয়ই। কি বলেন রবিদা!

অক্ষয় দত্ত এই সময় ছেলে দুটির মুখ দেখতে পাচ্ছিল। হাসিতে ঠাট্টায় তাদের মুখ ঝকঝক করছে। আর পার্টির তাত্ত্বিক রবিদার মুখ নিভে আসছে। তিনি থতমত খেয়ে বলেছিলেন—, এসব প্রশ্ন এভাবে তুললে তো কোন বিপ্লবী পার্টিতেই থাকা যায় না—

একটি ছেলে পাল্টা হেসে বলেছিল, তা তো বটেই! সাউথ ইণ্ডিয়ার খবর দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ার মোরেল বুস্ট্ করা হচ্ছে—

রবিদা তখন চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। ওদের দু'জনকেই এখনো চেনেন অক্ষয় দত্ত। সেবারে হঠকারিতার

লাইনে পা দিয়ে পার্টি একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ফিরে গড়তে অনেক সময় নিয়েছিল। পার্টি একটা চারাগাছ। ঠিক মত জল দিয়ে যেতে পারলে একদিন মহীরুহ হয়ে সারা দেশের ওপর ছায়া ধরে।

সেই ছেলে দুটি এখন মধ্যবয়সী। একজন দিল্লির একটা ইংলিশ ডেইলির পলিটিক্যাল করেসপনডেন্ট। রাজনৈতিক ভাষ্যকার। অন্যজন বিরাট ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় এলে রাজনৈতিক ভাষ্যকার এখনো দেখা করে অক্ষয়ের সঙ্গে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি— বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পাঁচশো বছর পর থেকে বুদ্ধদেবের বাণী ছড়াতে থাকে। তাঁর অনুশাসন একদিন দেশে দেশে রাষ্ট্রধর্ম হলো। শেষ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে আজ অব্দি আশি হাজার বৌদ্ধ চৈত্য পাওয়া গেছে। এই আশি হাজার চৈত্যে বুদ্ধের চর্চা হোত। গান্ধীজীও গাঁয়ে গাঁয়ে মণ্ডল কংগ্রেস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর এখন এই বিশাল ভারতে সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক হলো মডিফায়েড রেশনের দোকান।

অক্ষয় দরজার বেল টিপতেই ইলা খুলে দিল। এত রাত করলে। মেয়েরা চলে গেছে?

এই তো চলে গেল বসে বসে। দুজনেই। আজ তো একটু তাড়াতাড়ি আসবে।

আজই তো দেরী হওয়ার কথা। শেষে পার্টি অফিসে গিয়ে অনেকটা সময় আটকে গেলাম। ইস্ আরেকটু হলেই দেখা হোত।

বড় মেয়ে তোমার জন্যে কচুর শাক করে এনেছিল। রেখে গেছে। ছোলা দিয়ে।

উত্তর দিতে ভুলে গেলেন অক্ষয় দত্ত। তিনি ভাবছিলেন সি এম একসঙ্গে সিনেমা দেখতে চেয়েছিলেন। হয়তো নিজের পার্টির লোক-জন এড়িয়ে দু-একটা প্রাণের কথা বলতেন হাউসে বসে। কিংবা কোন কাজের কথা। যে কথা সি এম কোন সাক্ষী রেখে বলতে চান না। এমনকি তাঁর নিজের ঘরেও বলতে পারবেন না এমন কথা।

পলিটিক্যাল সেক্রেটারি প্রাইভেট সেক্রেটারি কিংবা কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারির সামনেও সে কথা বলার ইচ্ছে নয় চিফ মিনিস্টারের। তিনি হয়তো চান না—সবার সামনে দিয়ে অন্য পার্টির মিনিস্টার তাঁর ঘরে ঢুকুন। আবার হয়তো সুখ-দুঃখের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। কেমন আছেন অক্ষয়বাবু। অনেক দিন হামবারগার খাই না। ব্যারিস্টারি পড়বার সময় কমন পাব থেকে খেয়েছিলাম লণ্ডনে—তা আজও মুখে লেগে আছে। চলুন দুজনে গিয়ে খেয়ে আসি।

ইলা সামনে এসে পাজামা দিলেন। বাড়িতে অক্ষয় পাজামা পরে পরিষ্কার মেঝেতে শুয়ে পড়েন—গরমকালে। বহু দিনের অভ্যেস।

কি ভাবছো?

সি এম-কে একটা ফোন করবো?

কেন বেচারাকে জ্বালাবে। সারা দিন খাটাখাটুনি গেল। ভদ্রলোক হয়তো বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন।

না না। সি এম এখন অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে গল্প-গুজব করবেন। রিলাক্স করবেন। ওঁরা দু'জন অনেক দিনের বন্ধু।

তাই বলে ফোন করতে যেও না এখন। মনে রেখো তুমিও একজন মন্ত্রী। তোমারও একটা প্রাইভেসি আছে। তোমারও দেখবে সারকেল গড়ে উঠবে।

বাঃ! দারুণ বলেছো তো। এ কচুর শাক পেলে কোথায়? কথা বলতে বলতে পাজামা পরে নিয়ে অভ্যেস মতো খাবার ছোট্ট টেবিলটায় বসে পড়েছেন অক্ষয়।

বললাম যে তোমার বড় মেয়ে নিয়ে এসেছিল।

বলেছিলে? বলে অক্ষয় ভাত মেখে ফেললো। কচুর শাক বড় প্রিয় তাঁর। মা ছিলেন ব্রাহ্মণবেড়িয়ার নবীনগরের মেয়ে। আশ্চর্য রান্নার হাত। ছোটবেলায় ছুতোরপাড়া লেনের বাড়িতে মা বর্ষাকালে কচুর শাক রাঁধতেন।

ইলা জানে—মেয়েদের নাম ধরে ডাকে না অক্ষয়। বড়জনকে

বড় মেয়ে, ছোটজনকে ছোট মেয়ে বলে ডাকাই অক্ষয়ের আদরের ডাক। অক্ষয়রা জন্মাবধি নিরামিষাশী। ওঁর মা বাবা আগ্রার রাধেস্বামী সঙ্ঘের বড় হুজুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ইলার শ্বশুর শাশুড়ি বিয়ের সময় বলে দিয়েছিলেন, তুমি মা যেমন আমিষ খাও খাবে। কোন বাধা নেই। যদি কোন দিন তোমার মন দীক্ষা নেয়ার জন্যে তৈরি হয়—তখন ছেড়ে দেবে। ইলা মাছ না হলে ভাত খেতে পারে না। তার দুই মেয়েরও তাই অভ্যেস। বিয়ে হয়ে কোথায় পড়বে ঠিক নেই—আগে থেকে নিরামিষাশী করে তোলার প্রয়োজন দেখেনি ইলা। সে নিজেই এত বছর বাজার করে। বাড়ির সবার জন্যে আমিষ। অক্ষয়ের জন্যে নিরামিষ সব। এ নিয়ে তার স্বামী কোন দিন বাড়াবাড়ি করেনি। লোক ডেকে এনে বাড়িতে খাওয়াতে হলে অক্ষয় মাছ-মাংসের ব্যবস্থাও করে। শুধু সে নিজে খায় না। শেষ পাতেএকটু দুধ গুড়ের ভক্ত আছে। ইলা নিজে ছোট মাছের ভক্ত। মাংস সে অনেক দিন হলো ছেড়ে দিয়েছে। গন্ধ পায়। জামাইরা এলে মাংস সে রেঁধে দেয়।

সন্ধ্যেবেলা হাউসিংয়ের লোক এসে বাথরুমের সিস্টার্ন বদলে দিয়ে গেছে।

দ্যাখো মজা! ডক্টর রায় ফ্ল্যাটটা দিয়েছিলেন। আমরা তখন অপোজিশনে থেকে ওঁর গলদ ধরছি। অ্যাসেমব্লি থেকে ওয়াক আউট করছি। তবু ফ্ল্যাট চাইতেই দিয়েছিলেন। আর যেই মন্ত্রী হয়েছি অমনি সব রিপেয়ার হয়ে গেল।

ও কথা বলো না। এমনিতেই ওরা এতদিন ডাকলেই এসে রিপেয়ার করে দিয়েছে। বলে কি জানো—অনারেব্‌ল্‌ মিনিস্টারের বাথরুমটা একবার দেখিয়ে দেবেন।

অনারেব্‌ল্‌ বলে কথা! রীতিমত অনারেব্‌ল্‌ আমি এখন!! দেখো—সাতাত্তর টাকার এই ফ্ল্যাটকে ওরা এবার নন্দনকানন বানিয়ে ছাড়বে।

॥ ২ ॥

খুব ভোরে অক্ষয়ের ঘুম ভাঙলো। সি এম-এর টেলিফোনে।

এমনিতে সে আর্লি রাইজার। আজই সে বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে ফেলেছে। ওপাশ থেকে ভেসে এলো গলা। অক্ষয়বাবু। গো স্লো। তাড়াহুড়ো করবেন না। সব সময় আটঘাট বেঁধে নামবেন। এখনি ডিফলটার ভাড়াটেদের তুলতে যাবেন না। ওদেরও সমিতি আছে। আচমকা এসে বিক্ষোভ জানাবে। খবরের কাগজ ছবি তুলে ছাপবে।

ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা ভাড়াটা আদায় করতে পারলে তাহলে অনেক টাকা উঠে আসতো সরকারের। ভালো কথা— আপনার কানে গেল কি করে কথাটা ?

সবই কানে আসে মশাই। আমাদের সব জায়গায় লোক আছে।

সি এম ফোন রেখে দিলেন। অক্ষয় ভেবে ভেবে বের করলেন— জানার সোর্স একটাই। সেক্রেটারিকে তিনি মুখে মুখে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন—সেগুলোই সেক্রেটারি হয়তো স্টেনো টাইপিস্টকে লিখিতভাবে নোট তৈরি করতে ডিক্টেশন দিয়েছেন। সেখান থেকেই এসব কথা সি এম-এর কানে তুলে দেওয়া হয়েছে। বড় শরিকদের কর্মচারী সমিতির লোকজন সব জায়গায় ছড়ানো। অক্ষয়ের আফসোস হচ্ছিল তার পার্টির কোন উইং রাইটার্সে নেই। এবার তার নিজের ডিপার্টমেন্টে পার্টির পতাকা পুঁততে হবে—যাতে সে পতাকা বাতাসের সঙ্গে পত্‌পত্‌ করে ওড়ে। হর্ষকে বলতে হবে— আমরা যেমন পার্টি ফাণ্ডের চাঁইদের সঙ্গে কথা বলবো—তেমনি নিজেদের ডিপার্টমেন্টগুলোয় সেল তৈরি করবো। তবে না সব জায়গায় আটঘাট বেঁধে নামা যায়। আজ আমার মিনিস্টারির একটা দিন পূর্ণ হলো। কোন গোলমাল না হলে এখনো আঠারো শো চব্বিশ দিন আছে। তারপর আবার নতুন ইলেকশন ফেস করতে

হবে। অবিশ্যি তার আগেই যে কোন সময় এ সরকারকে ফেলে দিতে পারে দিল্লী। আমাদের কাজ—জনগণকে জাগিয়ে তোলা। এই জাগিয়ে তোলার আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। যে আইন আগের সরকার পাস করেও প্রয়োগ করেনি—সে আইনকে জায়গা মত প্রয়োগ করা।

ইলা ঘুমোচ্ছে। কাজের মেয়েটির আসতে দেরি আছে। ফাই-ফরমাস খাটার সর্বক্ষণের বাচ্চা ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর বাবা সুন্দরবনের লাট অঞ্চলে থাকে। ডাঙাজমিতে খেটেখুটে লঙ্কা করে। কিন্তু বাজার নেই বলে ওখানে দর পায় না। ছেলেটার নাম জগাই। ও কাল সকালে বলেছিল, তুমি মিনিস্টার হচ্ছো শুনলাম।

জগাইয়ের বয়স দশ বারো বছর হবে। মিনিস্টার কি জিনিস জানিস?

নাঃ! শুনেছি—পুলিশের বাবা। খুব পেটায় সবাইকে।

কোথেকে শুনলি?

ভোটের সময় বাবা বলেছিল। যাগ্‌গে ওসব কথা। এবার আমায় একটা হাতাওয়ালা শার্ট দিও। অনেক পয়সা পাবে তো।

অক্ষয় কোন কথা বলেনি। হাতাওয়ালা মানে ফুলহাতার শার্ট। এখন সে তার ছোট বারান্দাটায় গিয়ে বসলো। বাইরে আর পাঁচ দিনের মতই ভোরের কলকাতা। ভোরের আলোয় রূপনারায়ণের ওপরকার শরৎসেতুর ফাইলটা খুলে বসলেন। কবেকার প্রপোজাল—কবে ব্রিজের চেহারা নিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। সেই উনিশ শো একত্রিশে প্রথম ফাইল হয়। তারপর চল্লিশ বছর ধরে ফাইল ঘোরাফেরা করেছে।

তা সেতু তো হলো একদিন। ব্রিটিশ চলে গেল। কংগ্রেস এলো। সে-কংগ্রেস এখন এ রাজ্যে টিমটিম করছে এক অপোজিশন। সেই সেতুর একটি গার্ডার বসে গেছে। অক্ষয় নিজেকে বিড়বিড় করে বললো, জাগো ডগলাস! ডগলাস জাগো!—এবার তোমার জেগে উঠে সব লণ্ডভণ্ড করতে হবে। তুমিই ডগলাস সব কচুকাটা করতে পারো।

একেবারে গোড়ার দিকে সেই ব্রিটিশ আমলের প্রিলিমিনারি এস্টিমেট ছিল সাতাশি লক্ষ টাকা। ক'বছর আগে ব্রিজ সম্পূর্ণ হয়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকায়। শরৎচন্দ্র যেন কোন উপন্যাসে রূপনারায়ণের বর্ষার রূপ এঁকেছিলেন। ষোড়শী—না, দেনা পাওনায়? শরৎবাবুর বাড়িও কাছাকাছি। সেই সুবাদে সেতুর নাম শরৎসেতু।

সিমেন্ট, স্টোনচিপ, ইস্পাতের হিসেব। পাশেই রেলের পুরনো সেতুর বিবরণ। সে সেতু আগের সেঞ্চুরির। ড্রইং। নানাজনের মতামত। ট্রান্সপোর্ট প্রবলেমে ওই এলাকা কতটা পিছিয়ে আছে। শুধু ট্রেনে তো আর সবকিছু হয় না।

অক্ষয় দত্ত নিজের ভেতরকার একজনকে খুব চাপা গলায় ডাকলেন। সেই তিরিশ সালের সময় থেকে যখনই বিপদে পড়েছেন— তখনই তার ভেতরকার ওই লোকটিকে তিনি ডাকেন।

এ ডগলাস। ডগলাস—!

স্কুল জীবনেই আমরা শনি রবিবার সিনেমার সিরিয়াল দেখতাম। জোরোজ ডটার। ফাইটিং জোরো। তেমনি আসতো ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের সিরিয়াল ছবি। কী সোয়াসবাকলিং। তরোয়াল তার হাতে ছিল চাবুক কিংবা মাছ ধরার ছিপ। যে ছিপে ফাৎনা ফেলে বসলেই মাছ উঠবে। কিংবা ডগলাস তার শত্রুকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতেন তার হাতের তরোয়ালে।

বঙ্গবাসী, রিপন, স্কটিশ মিলিয়ে পুজোর সময় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটুটে কমবিনেশন নাইট হলো। নাটকের নাম কারেক্ট মনে পড়ছে না। জে এম সেনগুপ্ত, বিধান রায়, শরৎ বোসকে যেমন নেমন্তন্ন করা হয়েছিল—তেমনি শিশিরবাবু, অহীনবাবু, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাসকেও নাটক দেখতে নেমন্তন্ন করা হয়। কেদার রায়ে রডা? না, অন্য কোন রোলে ছিলাম—তা মনে নেই। তবে খুব সোর্ড খেলেছিলাম স্টেজে। একদম ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের কায়দায়। ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে মুখস্থ। কোন্ দিকে ফেয়ারব্যাংকস গোত্তা মেরে বাঁ পা বাঁ হাত উঁচু করে সোর্ড নিয়ে তেড়ে যান ডাইনে

কখনও কান্নিক মেরে হেসে ওঠেন আর বাঁয়ের দিকে সোর্ড চালাতে থাকেন—সবই দেখলাম। ফুলহাতার কলার উঁচু শার্ট। পায়ে হাইবুট। লম্বা মানুষ আমি। সেই ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের গোঁফ। কিছুদিন আগে তুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছায়াছবি লণ্ডনে প্রশংসা পেয়েছে। বিলিতি কাগজ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিল-ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস অব দি ইস্ট।

স্বয়ং তুর্গাদাস হাত তালি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—ডগলাস! ডগলাস!

সেই থেকে আমি কলকাতার কাগজে, লোকমুখে ডগলাস হয়ে যাই। বন্ধুরা অনেক দিন আমায় ডগলাস বলে ডাকতো। বিপদে পড়লে আমার ভেতরকার এই ডগলাসকে ডেকে পাঠাই। ও ডগলাস। ডগলাস—। আমি তখন একস্ট্রা সাহসী হয়ে উঠি। হরতালের ডাক দিয়েছি সেবারে। ডক্টর রায়ের ফোন: ডগলাস! ডগলাস এই সময়ে হরতাল ডাকলে!

আজই আমি শরৎসেতু ইন্সপেকশনে যাবো। দরকার হলে তদন্ত কমিশন বসাবো। পাবলিক মানি নিয়ে কিছুতেই নয় ছয় করতে দেবো না। আমার বাবা একশো টাকা মাস মাইনেয় চার ছেলে তুই মেয়েকে বড় করেছেন। তার ভেতর তিনি নিশ্চয় ট্যাকসের কড়ি গুণেছেন। আমার বাবার মত লোক দিয়েই দেশটা ভর্তি। আমি কিছুতেই এইসব মানুষের বিশ্বাসে চিড় ধরতে দেবো না। উঠেছি বাঘের পিঠে। তবু এটুকু তো করতে পারি।

পৌঁছতে বেলা একটা হয়ে গেল। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজ। সেকশন অফিসার ব্রিজ। তুজনই জীপ থেকে নেমে অক্ষয় দত্তের পিছনে এসে দাঁড়ালো। নিচে ভরা বর্ষার রূপনারায়ণ কানায় কানায়। তাতে এদিক ওদিক ইলিশের নৌকো। বাঁ হাতে রেলের পোল। অক্ষয় দত্ত এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ব্রিজের মাঝামাঝি খানিক জায়গা তু'জন হোমগার্ড ঘিরে রেখেছে।

প্রায় পনেরো হাত জায়গা দেড় ফুট মত ডেবে বসে গেছে। অক্ষয় দেখে বললো, এটাই এগার নম্বর গার্ডার ?

চিফ ইঞ্জিনিয়ার তটস্থ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ স্যার।

ব্রিজের পিলার কাদের ?

কনস্ট্রাকশন ইণ্ডিয়ার। একই কোম্পানি গার্ডার ঢালাই করেছে।

ইস্পাত স্পেসিফিকেশন কাদের ?

ওদেরই স্যার।

টলারেন্স টেস্ট করেছিলেন ?

ওরাই করিয়ে এনে সার্টিফিকেট দেখিয়েছিল স্যার। অনেক দিনের কোম্পানি। সারা দেশে ওদের হাতে অন্তত তিরিশটা ব্রিজ হয়েছে স্যার।

তাহলে এটা বসে গেল কেন ? আপনি রিপোর্ট তৈরি করুন। অ্যাসেমব্লি বসলে আমি এনকোয়ারি কমিশন বসাবার কথা ঘোষণা করবো।

তার আগে আমাদের দিক থেকে একবার থরো চেক করে নিলে হয় না স্যার ?

সে তো অবশ্যই করবেন। এ আর বলার কি আছে। এত বড় একটা ব্রিজ। তাও বসে গেল মাঝামাঝি জায়গায়। এরপর তো আরও বসবে—জায়গায় জায়গায়। কি লজ্জার কথা।

হয়তো নদীর সাবসয়েলে কোন চেঞ্জ হতে পারে। অ্যালুভিয়াল মাটি তো স্যার। নদীর নিচে কি হচ্ছে বাইরে থেকে বলার উপায় নেই।

খুব উপায় আছে। ওই দেখুন সিকি মাইলের ভেতর রেল ব্রিজ। কত পুরনো। ওখানে লাইন বসে গেলে তো ট্রেন পড়ে যেতো। তা তো যায়নি।

অকাট্য যুক্তি। কোন কথা বলতে পারলেন না চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ব্রিজ।

আজই সকালে ফোন করে প্রাইভেট কন্সট্রাকশনের কয়েকটা কোম্পানি থেকে অনেক কিছু জেনেছে অক্ষয়। নদীর বুকের ওপর দিয়ে ব্রিজ বসাতে হলে গোড়ায় বড় বড় ইস্পাতের ফাঁকা বাক্স নামিয়ে দেওয়া হয় জলে। তারপর পাম্প বসিয়ে ভেতরের জল ছেঁচে ফেলে ফাঁকা করে নিয়ে কংক্রিটের ঢালাই মাখা নামিয়ে দেওয়া হয়। জমে গেলে তার ওপর দিয়ে পিলার ঢেলে নদীর বুকে ভারি থাম্বা ওঠে। তখন চারধারের ইস্পাতের চাদর সরিয়ে নিলে যে নদীসেই নদী হয়ে যায়। নদীর চাতালে ঢালাইয়ের সময় গণ্ডগোল হয়ে থাকতে পারে। যাকে বলে গাফিলতি। স্পেসিফিকেশন ঠিক মত ফলো না করলে যা হয় আর কি। তাছাড়া কোন সময় মাটির স্তর যদি সরে যায় সেই আশঙ্কায় অনেকটা জুড়ে নদীর চাতাল ঢালাই করে ফেলা হয় কংক্রিটে। এত তাড়াতাড়ি তো গার্ডার বসে যাওয়ার কথা নয়।

ফেরার পথে কোন ট্রাফিকেই অক্ষয়ের গাড়ির দাঁড়াতে হলো না। জেলার পুলিশ পাইলট জিপ আগে আগে ছুটে চলেছে। হাইওয়ের দু ধারে গ্রাম। লরির আড্ডা আর পাঞ্জাবী ধাওয়া। মাঠে মাঠে ধান বসে গেছে। আলের ওপর দিয়ে সাবধানে লোক চলাচল। আমাদের ভোট, ম্যানিফেস্টো, রাজনীতি ছাড়াই দেশ চলে। ওই ধান লাগাতে আমাদের শপথ, ইস্তেহার—কোনটাই দরকার পড়েনি ওদের। বর্ষাকালের শেষ দিকেও দেশের মাঠে ঘাটে রাস্তা বলতে ছিল নদী। পুজো গড়িয়েও কোন কোনবার মাঠের জল শুকোতো না। আমি আর আমার পরের ভাই দিগম্বরীতলার পাঠশালায় ভেলায় চড়েও গেছি। একবার বাবা পুজোর মুখে কলকাতা থেকে সবার জন্যে কাপড় নিয়ে ফিরলেন। আমি আর আমার পরের ভাই নৌকো থেকে কাপড় নামিয়েছিলাম। তাম্রশাসন গাঁ থেকে বাবা আমাদের নিয়ে চলে আসেন কুড়ি একুশ সনে। কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।

আমার কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের পোস্টে পার্টি থেকে তারকবাবুকে নেওয়া হলো। এছাড়া সরকারী দুজন অফিসার তো

আছেই। রাস্তা বানানো, বাঁধ তৈরি, জমি কেনা, ডেভলপ করা, বাড়ি বানানো, বেআইনি বসতি হঠানো কত কি যে অক্ষয়ের দফতরে। সারা কলকাতায় অফিস ছড়ানো। নিউ সেক্রেটারিয়েট, রাইটার্স ছাড়াও এ রাস্তা সে রাস্তায় বেশ কতকগুলো অফিস ছড়িয়ে আছে।

শরৎসেতুর সবকটা ফাইল এক জায়গায় করতে বলা ছিল। তারকবাবু সেগুলো থেকে দরকারী নোট তৈরি করে রেখেছিলেন। অফিসে ফিরে অক্ষয় দত্ত সেই নোট পড়তে শুরু করলেন। পরামর্শ, জিনিস বাছাই রূপায়ণ সবই কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়াকে ভার দেওয়া হয়েছিল এটাই আশ্চর্য লাগলো অক্ষয়ের। সাধারণত কনসালটান্ট ফার্ম পরামর্শ দিয়ে খালাস। এগজিকিউশন থাকে অন্য ফার্মের হাতে।

বাড়ি থেকে ফোন এলো ইলার। আজ কি সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরতে পারবে?

এখনই তো প্রায় সন্ধ্যে। ফিরতে রাত আটটা ন'টা হবে। কেন?

আমাদের ফ্ল্যাটের ছেলেরা থিয়েটার করছে। তোমাকে চায়। আমায় বলতে এসেছিল—

আমার হয়ে তুমি যাও।

আমি তো যাবোই। আমি ওদের মাসীমা। কিন্তু মন্ত্রী তো নই।

সন্ধ্যের মুখে মুখে হাউসিং থেকে পুরো হিসেব এসে গেল। প্রায় সওয়া কোটি টাকা বাড়ি ভাড়া বাকি ফেলেছে ভাড়াটেরা। অথচ বলা হচ্ছে—গো স্লো। কোন্ দিকে যাবে অক্ষয়।

সরকার একটা বাড়ি বানালে তার ভাড়া ঠিক করার সময় মোট খরচ, সুদ, মেইন্টেনান্স হিসেবে ধরে দেড়শো বছর জুড়ে সে-টাকা সরকার ভাড়ার টাকায় তুলে নেয়। তাঁর মানে অক্ষয়ের মন্ত্রিত্বের পাঁচ বছরে টাকা ফিরছে সামান্যই। তাতে তো নতুন নতুন বাড়ি

বানানোর ভাণ্ডার গড়ে ওঠে না। খরচটা অত বছর ধরে ছড়িয়ে দিয়েও দেখা যাচ্ছে মাসিক ভাড়া কিছুতেই দুশো তিরিশের নিচে আনা যাচ্ছে না। নিম্ন আয়ের লোকজন এ ভাড়া কোত্থেকে দেবে? অক্ষয়ের একটা প্রস্তাব আছে। সে তা মন্ত্রিসভায় তুলবে। ভাড়া ঠিক করা যাক একশো ষাট। বাকিটা সরকার ভরতুকি দিক। প্রিয় ডগলাস! সমাজতন্ত্র যে কদ্দূর? জানি না। জানি না আমি।

ডক্টর রায় সেণ্টারের টাকা নিয়ে ভেড়ি ভরাটের সময় পেয়েছিলেন। অনেক সময় নিয়ে তারপর সল্ট লেক সিটি হয়েছে। অক্ষয়রা চায়—এক্ষুনি জনগণকে কিছু রিলিফ দিতে। শহরের ভেতর—শহরের গায়ে—যেখানে যেটুকু ডাঙা জমি পাওয়া যায়—সেখানেই অক্ষয় দত্ত বাড়ি তুলতে চায়। নানা আয়ের লোকের জন্য কিস্তিতে, বাড়ি কেনার ব্যবস্থা—পাশাপাশি ভাড়ার ফ্ল্যাট তুলতে হবে। কোথাও বা ড্রেনেজ, আলো, রাস্তা, বাসস্টপ করে দিয়েও অক্ষয় সাধারণের জন্যে প্লট বেচতে চায়। তাড়াতাড়ি। দেরি হলেই সিমেণ্ট, ইস্পাত, বালি, স্টোনচিপ, ইট, কাঠ, রং, ফিটিংসের দাম চড়ে যাবে।

কলকাতাকে অক্ষয় চেনে। মধ্য বয়স অব্দি সে এই মহানগরীর বুকে বড় হয়েছে। বাড়ি ফিরে দম ফেলারও জায়গা পায় না অনেকে। অনেকের মাস মাইনের চল্লিশ ভাগ চলে যায় বাড়ি ভাড়ায়। যা থাকে, তাতে বাজার, বাস-ট্রাম, জামাকাপড়, পড়াশুনো, ভদ্রতা চালানোই এক দায় হয়ে ওঠে।

গঙ্গার এপার ওপারে দুই যমজ নগরীর নাড়ি-নক্ষত্র অক্ষয়ের নখদর্পণে। এই শহর তার যৌবনেও ছিল সরল, সস্তা। এখন দিনকে দিন আগুন হয়ে উঠেছে কলকাতা। যাতায়াত এক জটিল জ্বর বিশেষ। খাওয়া-দাওয়া থাকা মাসমাইনের মানুষদের পক্ষে রীতিমত কসরৎ। এখানে ফি-বছর ছ'সাত হাজার বাড়ি বানাতে পারলে একদিন কলকাতায় থাকাটা সাধারণের পক্ষে আবার সরল, সহজসাধ্য হতে পারতো। সেখানে এতদিন বছরে বড়জোর মাত্র হাজার দুই বাড়ি তৈরি হয়ে এসেছে। জিনিসপত্রের যা দাম—মজুরি

যেখানে গিয়ে ঠেকেছে—তাতে আগেকার সরকারের টেম্পো রাখাই দায়।

এতকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে কাগজ পড়া অভ্যেস অক্ষয়ের। আজই পড়া হয়নি। শরৎসেতু তার কাজকম্ম গুলিয়ে দিয়েছে। তারকবাবু শহরের দশটা দৈনিকের প্রাসঙ্গিক জায়গাগুলো কেটে কাগজে আঠা মেরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাংলা কাগজের ভেতর ছুটো বড় কাগজ তার ডগলাস নামটি আদর করে উল্লেখ করেছে। বিধান-বাবুর আমলে অপোজিশন হিসেবে অক্ষয়ের টেবিল চাপড়ানো, ওয়াকআউট—সবই. পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি ইংরেজি দৈনিক তার শপথ গ্রহণের ছবি পয়লা পাতায় ছেপেছে। এদেরই এডিটোরিয়ালে শহরবাসীর বসবাসের ছুরবস্থার দিকে অক্ষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শেষদিকে তাকে বলা হয়েছে—ডিস্টিং-গুইসড ক্যালকাটান।

বাড়ি ফিরে অক্ষয় দেখলো আলো নিভিয়ে খোলা বারান্দায় ইলা বসে আছে। ঘরের ভেতর ইলাকে লক্ষ্য করে টেবিল ফ্যানটা শব্দ করে অন্ধকারে ঘুরছে। পাজামা পরে নিয়ে খালি গায়ে অক্ষয় মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। এটাই তার বিশ্রাম—এটাই আরাম। কাজের বাচ্চা ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। অক্ষয়ের মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তার কাছে একটা ফুলশার্ট চেয়েছে। ওর কল্পনায় মন্ত্রী মানে পুলিশের চেয়েও বড় জিনিস। সবাইকে দারুণ পেটায়। জগাই যদি জানতো মন্ত্রী হওয়া কি জিনিস—তাহলে ভুলেও এদিকে পা বাড়াতো না। হাতাওলা শার্টও চাইতো না অক্ষয়ের কাছে। বরং বলতো, আহা! তোমার তো বড় যন্ত্রনা!

ইলা ঘুমোলে নাকি? দরজা খোলা রেখে বসে আছো?

তোমার আসার সময় রাইটার্স থেকে ফোন করে জানালো—তাই দরজা ভেজিয়ে রেখে এখানটায় এসে বসেছি।

ছেলেদের থিয়েটারে যাওনি ?

গিয়েছিলাম। ভালো লাগালো না বলে চলে এলাম। মন্ত্রীর বউ হয়ে কি জ্বালা বলতো। মাইকে বার বার ঘোষণা। শ্রীমতী অমুক আজ আমাদের নাট্যানুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত হয়েছেন। আমি যত বলি—কী হলো তোদের বল তো ? আমি যে তোদের এত দিনের মাসীমা। সে-কথা ভুলে গেলি ? কে শোনে আমার কথা ! দ্বিতীয় দৃশ্যের তৃতীয় অঙ্কে উঠে এলাম চুপি চুপি। ভৌমিক গিন্নি, পটলের মা, গার্লস্ স্কুলের টিচার সুধা—সবাই ধরেছে—মেয়েদের সবাইকে নিয়ে একটা টি-পার্টি দিতে হবে। তাতে তোমাকেও থাকতে হবে।

তা দেবে না হয় টি-পার্টি।

কক্ষনো না। কোনো দিন দিইনি। আজ নতুন করে কী দেবো আবার।

হাজার হোক মন্ত্রীগিন্নি তুমি।

সাবা দেশে কত মন্ত্রী আছে। সব মন্ত্রীগিন্নি এসব দেয় ? যত গায়ে পড়া আব্দার।

খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল। অক্ষয় বললো, মন্ত্রী হওয়া অব্দি একটা উত্তেজনা ছিল। কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার পর দেখছি—এ যেন অন্য পাঁচটা কাজের মতই একটা কাজ ! ফারাক শুধু—আমার হুকুম তামিল করতে অনেক লোক রেডি হয়ে আছে। তবে এই রেডি ভাবের কতটা চাকরির দায়—কতটা আন্তরিক টান—তা বোঝার উপায় নেই কোন।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। অক্ষয় বললো, চলো কোথাও ঘুরে আসি। গাড়ি তো রয়েছে। ফোন করে দিলেই চলে আসবে।

নাঃ ! কোথায় যাবো ? যাবার কোন জায়গা নেই। যেখানেই যাব সবাই সমান চোখে তাকাবে—যেন তুমি মন্ত্রী হতেই আমাদের হাতের পেছনে একজোড়া ডানা গজিয়েছে। তুমি বাড়ি ফিরছো—একথাও অফিস থেকে ফোন করে জানাবার কি আছে ! তোমার

ফেরার দিকে চেয়ে থেকে বাড়িতেও কি আমরা অফিস খুলে বসে থাকবো ?

হয়তো নিয়ম আছে—ফোন করে জানিয়ে দেওয়ার। কাল বারণ করে দেবো।

তাই দিও। অ্যাতো ভি আই পি ট্রিটমেন্ট কেন ? এর ফলে তুমি সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। পরে আর কোন কাজ করতে পারবে না। গাড়ির দৌলতে পায়ে হাঁটার অভ্যেসটা হারিয়ে ফেলবে। তোমার ওজন আর বয়সটা ভেবে হাঁটার অভ্যেসটা রাখা খুবই জরুরী।

তোমার কাছে মন্ত্রীদের শেখার আছে অনেক কিছু।

ঠাট্টা রাখো।

ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি ইলা। আমি মন্ত্রী হওয়ায় তোমার মাথায় কোন ছিট দেখা দেয়নি। স্বাভাবিক থাকাটা সবচেয়ে কঠিন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। ইলা বললো, বড় মেয়ে হবার পর ছোট মেয়ের আগে যেটা পেটে এসেছিল—সেটা নিশ্চয় ছেলে ছিল। অপারেশন করা তখন ঠিক হয়নি।

কী অবস্থা গেছে আমাদের মনে পড়ে। দিনের পর দিন তখন খিচুড়ি খেয়ে চালিয়ে দিয়েছি।

সে ছেলে থাকলে কবে বিয়ে দিয়ে বৌ আনতে পারতাম ঘরে। এখন বড় ফাঁকা লাগে। কোন কাজ নেই হাতে। যাবার কোন জায়গা নেই। মেয়েদের সংসার বাড়ছে।

আমার সঙ্গে আজ গেলে রূপনারায়ণ দেখতে পেতে।

তুমি তো গেলে ব্রিজের কাজ দেখতে।

ব্রিজ মানেই তো নিচে কিছু থাকে ইলা।

আহা! তুমি যাচ্ছো সরেজমিনে তদন্ত করতে। আমি সেখানে সঙ্গী হই কি করে ? তোমার অফিসের লোক কি বলবে ?

* * *

দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনের রাজ্য আবাসন মন্ত্রীদের সম্মেলন উদ্বোধন

করছেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী সাধারণের জন্যে ঘরবাড়ির প্রয়োজন নিয়ে যেমন বললেন—তেমনি বললেন, রাজ্যে রাজ্যে ঘরবাড়ি বানানোর জন্যে পরিকল্পনায় কত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজধানীর রাস্তায় নতুন অ্যামবাসাডারে চড়ে ঠাণ্ডা সম্মেলন ঘরে পৌঁছলে মনেই হয় না—আমরা ভারতবর্ষে আছি। গোল হর্সসু টেবিলে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি বসবার সুযোগ পেল অক্ষয় দত্ত। সব মন্ত্রীর সঙ্গেই কাগজপত্র সমেত ওয়াকিবহাল অফিসার মজুত। প্রধানমন্ত্রীর হাতের কাছে দিস্তে দিস্তে কাগজ নিয়ে আধ ডজন অফিসার। তাদের হাতে ট্যাগ লাগানো ডজন ডজন ফাইল।

রাজ্যের সিমেণ্ট ইস্পাতের কোটা বাড়ানো দরকার বলে অক্ষয় খুবই নিরামিষ জবাব পেল।

প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে সাহায্য করতে একজন প্রবীণ অফিসার বললেন, দরকারের কথাটা আমরা জানি। দি রিকোয়েস্ট ইজ বিয়িং লুকড্ ইনটু।

অক্ষয় দত্ত নাছোড়। সে বললো, বেশির ভাগ সিমেণ্ট চলে যাচ্ছে পাতাল রেলের কাজে।

পাতাল রেলও তো আপনাদের রাজ্যের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

ট্রেনে চড়ে কোথাও যাবার আগে কোথাও তো থাকার ব্যবস্থা করে মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী খচ্ করে বললেন, সবাই কি গাছতলায় শুয়ে আছে?

তা হয়তো না। কিন্তু যে-অবস্থায় মানুষজন আছে—তাতে তারা গাছতলায় গিয়ে থাকাও শ্রেয় মনে করতো। আলো নেই। হাওয়া নেই। প্রপার স্যানিটেশনের অভাব। বাড়ি ভাড়া প্রচণ্ড।

মিস্টার দত্ত—আপনারা লেজিসলেশন করে ভাড়া কমাতে পারেন। এটা রাজ্যের ব্যাপার।

সেখানে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটসের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে ম্যাডাম। আর্টিকল টুটোয়েন্টি সিক্স।

সংবিধান তো মানতেই হবে—যতক্ষণ না বদলানো যাচ্ছে। সর্ব-

শ্রেণীর স্বার্থ ও প্রয়োজনের সমঝোতাই হলো গিয়ে আমাদের সংবিধান। বিশ্বব্যাঙ্ক, কেন্দ্রের টাকায় স্লাম এরিয়ায় স্যানিটেশনের কাজ তো অনেক হয়েছে। আরও হবে। সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে সম্পদ বাড়ান। স্টেট কোন প্রোগ্রাম নিলে স্যানিটেশনের জন্যে আমরাও ম্যাচিংগ্র্যাণ্ট দেব। পাওয়ার স্টেশনগুলো ঠিকমত চালান—তাহলেই আলো হাওয়ার কিছুটা ব্যবস্থা হবে। ঠিক মত প্ল্যান করে নতুন টাউনশিপ তৈরিতে আমরা সর্বদাই টাকা দিতে রাজি।

ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার—এসবই দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। আমাদের রাজ্যে এখুনি কিছু একটা করা দরকার। হাউসিংকে যদি প্রায়োরিটি দেওয়া যায়—

সেরকম রিসোর্স তো আমাদের নেই। জনগণকে বুঝিয়ে বলতে হবে—যে কোন ভাল কাজই সময়সাপেক্ষ। রিসোর্স আছে—তা প্রায়োরিটির ভিত্তিতে ফুড, ডিফেন্স, স্টিল, শিপিং, হেলথ, ফার্টিলাই-জারের জন্যে তো রাখতেই হবে। আরও আছে—ড্রিংকিং ওয়াটার, থারমাল পাওয়ার, অ্যাডাল্ট এডুকেশন। আগামী মাসে ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের মিটিং। আসছেন তো? তখন আমরা প্রস্তাব নিয়ে কথা বলে দেখবো সবার সঙ্গে। বলতে বলতে প্রধান-মন্ত্রী চোখের চশমা তুলে নাকের ঠিক জায়গায় বসালেন। তারপর সামনের কাগজে ঝুঁকে পড়লেন।

অক্ষয়কে ঘিরে কাশ্মীর কেরলের হাউসিং মিনিস্টাররা সম্মেলনের পর প্রায় একই ভাষায় যা বললো—তা অনেকটা এরকম: আপনি আমাদের মনের কথাটি বলেছেন ভাই। তামিলনাড়ুর আবাসনমন্ত্রী বললো তোমাদের রাজ্যে সিমেণ্ট কারখানা থাকলে ওদের ওপর চাপ দাও। একসাইজ ডিউটি অক্ট্রোয়, অ্যাড্‌ভেলোরাম রোড ট্রান্সপোর্টে চেপে ধরো। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নকে উসকে দাও। সুড়সুড় করে সিমেণ্ট বের করে দেবে। দরকার হলে প্রোডাকশন ইউনিট বাড়াবে। নেহাত আশাবাদী না হলে সিমেণ্টের জন্যে কেউ দিল্লিতে দরবার করে? আমরা তো নিরুপায় হয়ে ওই পথে গিয়ে সুফল পেয়েছি।

সন্ধ্যেটা ওয়েস্টার্ন কোর্টে দলের তিন এম. পি'র ফ্লাটে কাটালো অক্ষয়। হরিশবাবু চুয়াত্তর। পরপর চারটে টার্ম লোকসভায় আছেন। রাতে শীতকালটা রে নিতে হয়। এখন বেশ চাঙ্গা। কোন কমিটিতে আজকাল থাকতে চান না। বাকি দুজন বয়সে পঞ্চাশের নিচে। তারা সেশন না থাকলে তোফা আরামে এম. পি'র পাস পকেটে নিয়ে ভারতভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। দুজনেরই এটা সেকেণ্ড টার্ম। লোক-সভার নানা কমিটির মেম্বার ওরা। সেই সুবাদে এরোপ্লেনে এদিক ওদিক যেতে হয় মাঝে মাঝে। তাও ওরা জানিয়ে দিল অক্ষয়কে।

রাত আটটা নাগাদ বঙ্গভবনে ফিরে অক্ষয় দেখে সি এম বেরিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় চললেন? কখন এসেছিলেন?

দুপুরে। আপনি তখন সেমিনারে। যাচ্ছি মাদ্রাজ। স্টেট ইন-ফরমেশন ব্যুরোর একটা সেণ্টার কাল ওপেন করবো। যাচ্চি মায়লা-পুরমে। কেমন হলো? পি এম ছিলেন তো।

রীতিমত ছিলেন। হালে পানি পাওয়া গেল না।

তুলেছিলেন তো কথাটা।

হ্যাঁ।

তাহলেই হবে। ন্যাশনাল ডেভলপমেণ্ট কাউন্সিলে ফিরে তুলবো আপনার প্রোপোজাল। চলি—আপনি তো ফিরছেন কাল সকালে। সন্ধ্যেবেলা রাইটার্সে থাকলে দেখা হবে। আমি ফিরছি দুপুরের ফ্লাইটে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা রাইটার্সে যাবো।

সি এম বেরিয়ে গেলো। অক্ষয় খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়িতে ইলাকে একটা ফোন করলো। আর কাকেই বা করবো। মা নেই। বাবা নেই। আমি কলকাতায় নেই। হর্ষ ঘোষ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে অফিস ঘরে। কে আর তাকে জাগাবে এখন।

মন্ত্রী হবার পর এই দু'মাসে অক্ষয়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অফিসে বড় একটা পাইপ ধরায় না। বাড়িতে—নয়তো অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে সে পাইপ ধরায়। এখন ফোন করতে করতেই পাইপ ধরালো।

ইলার গলা পেয়ে বললো, তুমি এলে পারতে সঙ্গে। এ বয়সে কার কাগজপত্তর নিয়ে মিটিং করে বেড়াতে ভালো লাগে বলো।

তা দেশের লোকের ভালো করতে মন্ত্রী হতে গেলে কেন!

আমি তো অন্য কোন কাজ শিখিনি ইলা।

ল পড়েছিলে—ওকালতি করতে পারতে। এই যে বিধানসভা খুললে কৈফিয়ৎ দেওয়া—এ ঝকমারি তো থাকতো না। যাগ্ গিয়ে। মন খারাপ করো না। কালই তো ফিরে আসছো।

পরদিন খুব ভোরে কলকাতার এয়ার বাস ধরলো অক্ষয়। দু' ঘণ্টা দশ মিনিটের ফ্লাইট। সারাটা পথ আগাগোড়া সাদা ফিতের মত গঙ্গা নদীটা পড়ে থাকলো। দমদম কাছে আসতেই নারকেল গাছের মাথায় লটকানো নানা রকমের দিগন্ত ডাইভিং প্লেনের জানালায় বসে দেখা গেল।

কাচাকুচির পর ইলার যাতে ভিজে কাপড় শুকোবার সুবিধে হয়—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই অক্ষয় তলতা বাঁশের একখানা ধাপ-সিঁড়ি কিনেছে। ভাঁজ করে রাখা আছে সঙ্গের ব্যাগে। মন্ত্রী হবার পর রাজধানীতে খাদি ভবনে এই তার প্রথম শপিং।

কাচাকুচি করে জগাই অনেক সময় ফালি ঝুল বারান্দাটায় ক্লিপ এঁটে দেয় ভিজে জামা কি শাড়ীতে। নির্ঘাত নিচের ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দায় পড়ে গিয়ে ছোটখাটো কথা কাটাকাটির কারণ হয়ে দাঁড়ায় শেষে।

॥ ৩ ॥

মন্ত্রী হবার পর অনেক রকম চিঠি পায় অক্ষয়। নেহাত ফুর্তিবাজ, নিরামিষ খেয়ে বড় হওয়া অক্ষয় কোন দিনই জীবনে কোন বোঝা বাড়ায়নি। পরাধীন আমলে বাবার কাছে সাশ্রয়ের ভেতর বড় হয়েছে সে। কোনদিন বড় লোক হবে বলে—অনেক পয়সা আয় করবে বলে কোন টেনশনে ভোগেনি। সতেজ স্নায়ু। অল্পে খুশী।

কিশোর বয়স অব্দি গড়ের মাঠে গিয়ে টেন থাউজ্যাণ্ড ইয়ার্ড দৌড় প্র্যাকটিস করতো। মন খারাপ হলে বিবেকানন্দের বিবেকবাণী বুক পকেট থেকে বের করে পড়েছে। আর ফাঁক পেলেই থিয়েটারের রিহার্সেল। সে নাটক স্টেজে হোক ছাই না হোক। এক-একটা চরিত্রে ঢুকে পড়ে অক্ষয় দুঃসাহসী ডগলাস হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। ল পড়ার সময় ফরডাইস লেনের মেস থেকে মোহনবাগানের মাঠেও যেমন যেতো—তেমনি যেতো ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুটে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখতে। খেলা, অভিনয়, দৌড়, নিরামিষ আর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়ে একদিন অক্ষয় আবিষ্কার করেছিল—দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে—সে সবে একটি মেয়ের বাবা আর নিজে সাইকেলে টংটং করে ঘুরে বেড়ানো একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। তখন নতুন বাজারে একখানা ঘরে পার্টির সাইনবোর্ড লাগিয়ে অক্ষয় অফিস খুলেছে সবে। বিড়ি শ্রমিক সমিতি। বাসন মজদুর সঙ্ঘ। কত কি!

তখনো সে হাল্কা ছিল—এখনো সে হালকা। সব ব্যাপারেই তাই তার সমান উৎসাহ। তারকবাবু অনেক চিঠির ভেতর থেকে একখানা চিঠি এনে অক্ষয়ের হাতে দিল।

প্রিয় অক্ষয়,

আমি তোমায় ছোট দেখিয়াছি। সবে কলেজে পড়িতেছো। বাহান্ন তিপান্ন বছর আগের কথা। আমি ত্রৈলোক্যদার নির্দেশে রবি সেনকে সঙ্গে লইয়া পুরানো অনুশীলনের ভাঙাহাট আবার জমজমাট করিয়া তুলিবার জন্য নিত্যদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটের নীলকণ্ঠ কেবিনে আসিয়া বসি। আনন্দবাজার পত্রিকার মাখন সেনও আসেন। সেই সময় কয়েকজন তরুণের সঙ্গে তুমিও আসিতে।

কাগজে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও দফতর বণ্টনের কথা পড়িয়া তোমার নামটি পাইলাম। মনে নিল—এই অক্ষয় দত্ত নিশ্চয় সেই অক্ষয় দত্ত। কেননা—সেই সময়ের পরেও রাজনীতিতে এই নামটিকে নানা ব্যাপারে উল্লেখিত হইতে দেখিয়াছি। মাঝে তো দ্বাদশ বর্ষ আন্দামানে ছিলাম। তাই অনেক নাম ভুলিয়াও গিয়াছি।

দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া দেখি—দেশের রাজনীতি অন্য মোড় লইয়াছে। আমি খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া বসিয়া যাই। বাবা মা ভাই বোন—সবাইকে দ্বীপান্তরে থাকিতে হারাইয়াছি। এক ভাইপো নাইরোবিতে চলিয়া গিয়াছিল। সে কিছুকাল খবর পাইয়া টাকা পাঠায়। বহুকাল তাহারও কোন হদিস নাই।

সেই তুমি যদি পশুপালন, পূর্ত ও আবাসান মন্ত্রী হইয়া থাকো—তবে একবার অবশ্যই আমাদের এই বিপ্লবী নিকেতনে আসিবে। পূর্তমন্ত্রী হিসেবে এই সরকারী বিপ্লবী নিকেতনের ছাদ ও বাড়িটি যদি সারাইয়া দাও তো খুব ভালো হয়। আমরা সাতাশজন প্রাক্তন বিপ্লবী এখানে যমের অরুচি হইয়া পড়িয়া আছি। আমার বয়স এখন ৯২ এখানে আছি বিগত ন'বছর। তুমি আসিয়া দেখিলে সবই বুঝিবে। আমি গত শতাব্দীতে আনন্দমঠ পড়িয়া বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। এই শতাব্দীও শেষ হইতে চলিল। আমরা আদি অনুশীলন। তুমি স্বাধীন দেশের মন্ত্রী। তোমার অসাধ্য কিছু নাই। আমরা এই সাতাশ জনের কেহ তাম্রপত্র বা কোন ভাতা লই নাই। লইবার চেষ্টাও করি নাই।

ইতি

আশীর্বাদক

সর্বানন্দ দাসঠাকুর

পুনশ্চ : আমাদের আদিবাড়ি ছিল নবীনগরে। তোমরা সম্ভবত চাঁদপুরের তাম্রশাসনের দত্তবাড়ির ছেলে। তখনকার সংগঠনে সব্বাই আমাকে সর্বা বলিয়া চিনিত। ঢাকা মেলে ডাকাইতি আমাকে একসময় বিখ্যাত করিয়াছিল। তখন তোমরা স্কুলে পড়ো। বিকালে আসিলে আমাদের সামনের মাঠে পাইবে। ওই সময় আমরা সবাই মুড়ি গুড় দিয়া টিফিন করি। তারপর পায়চারি। আগেকার কথা সবই এখন গল্পগাছা।

তারকবাবুকে গাড়ির খবর করতে বলে অক্ষয় হাতের কাজ গুছিয়ে নিল। ঘড়িতে পৌনে দুটো। আমি সত্তরের কাছাকাছি গিয়ে কতটা

নিরাপদ। সর্বানন্দ দাসঠাকুর নব্বইয়ের ওপারে গিয়েও কতটা অনিশ্চিত। বারুইপুর পেরিয়ে ক্যানিং যাবার রাস্তা থেকে ভাঙড় যাবার পথে—চিনে মোড় পড়বে বাঁ হাতে। একটু ভেতরে গিয়েই পুরনো গ্রাম। জমিদার বাড়ি কিনে নিয়ে সরকারী টাকায় বিপ্লবী নিকেতন। সবই পরিষ্কার লিখেছেন সর্বানন্দবাবু। চেহারাটা ঠিক মনে পড়ছে না অক্ষয়ের। নীলকণ্ঠ কেবিনে রবি সেন আসতেন— এটা ঠিক। মাখন সেনও আসতেন। সব মুখ কি করে যে হারিয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হয়েছে—তাও তো তিরিশ বছর হয়ে গেল। তারও দুই যুগ আগে। ফোনে অক্ষয় বললো, তারকবাবু—সিকিউ-রিটির লোকের যাবার দরকার নেই।

কলকাতার বাইরে অতটা যাবেন একা একা—

কোথায় অতটা। সঙ্গে তো ড্রাইভার থাকলো।

পৌঁছতে প্রায় চারটে। এখন তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে আসে। তিন-দিকে তিনটে পানাপুকুর। মাঝখানে কলি ফেরানো একটা বেঢপ চারতলা। বর্ষার জল নিকাশের ফাটা মেটে নালীর পাশাপাশি বাড়ির গা ধরে জং-পড়া ফুটো রেন ওয়াটার পাইপ। গাড়ি থেকে তখনো নামেনি অক্ষয়। পেছনের দরজায় এক ক্ষীণ বৃদ্ধ—মাথায় লাল মাংকি ক্যাপ—চোখে ছানি কাটানোর পরেকার ঘষা কাচের চশমা—দাঁত বলতে বোধহয় একটাও নেই। তুমি আসবে জানতাম। চেহারা অনেক পাল্টে গেছে—

তা আমারও তো সত্তর হলো।

তাই নাকি? মনে করার চেষ্টা করে সর্বানন্দ বললেন, এখনো পুরো সত্তর হয়নি তোমার। আমায় চিনতে পেরেছো? শরীরের খাঁচাটা আগের মতই আছে। শুধু মাংস নেই। গ্রন্থিগুলো ঢিলে হয়ে গেছে অনেক দিন।

ওরে আলোটা নিয়ে আয়—বলে সামনেই ভাটুইভরা মাঠ থেকে সর্বানন্দের বয়সী কয়েকজন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। গাঁয়ের কোন্ বাড়ি থেকে মঙ্গলশঙ্খ বাজলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অক্ষয় জানতে চাইলো, আলো নেই?

সর্বানন্দ বললেন, নেই অনেক কিছু। এসেছো অতদূর থেকে। আগে বোসো।

অন্ধকার সন্ধ্যেবেলা দোতলার ঘরের ছাদের সামনে খোলা ছাদে অক্ষয়কে ঘিরে সবাই বসলেন। বয়সে সবাই তার চেয়ে বড়। এ যেন অক্ষয় অনেককাল পরে নৌকোয় করে আবার অন্ধকার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছেন। সেই তখনকার কোন সভায় তিনি এসেছেন। কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে মালব্যজীর দলের প্রার্থীকে জেতাতে হবে।

বর্ষায় জল পড়ে। কেয়ারটেকার বিকেল হলেই সন্ধ্যের শোয়ে সিনেমায় যান। মাছের সাইজ ভাতের পাতে এখন টিকটিকির দশা। বিকেলের জল খাবারের মুড়ির সঙ্গে গুড়ে কেরোসিনের গন্ধ। বোধ-হয় পাটনাই গরুর খাবার যে গুড়—তাই কেনা হয়েছে পয়সা বাঁচিয়ে। সবার মাথার ওপরেই শীতকালের মশার ঝাঁক। একটু পরে পিন-পিন গান শোনা যাবে।

বুক চেপে অন্ধকার হয়ে আসছিল অক্ষয়ের। সর্বানন্দকে বললো, আমরা কিন্তু পুরনো দলে আঁকড়ে থাকিনি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দল গড়েছি রামগড় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে।

ওসব কে মনে রাখে অক্ষয়। দেশের কাজ করছো—এইটেই লোকে ভাবে। আমরা আন্দামানে থাকতে সমাজতন্ত্রের কথা প্রথম শুনি। অবিশ্যি তার আগে শিবনাথই প্রথম বেরিয়ে যায় দল থেকে। সে তো পায়ে হেঁটে আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে রাশিয়ায় গিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখাও করে। অকালে লেনিন গেলেন। স্ট্যালিনের চক্ষুশূল হওয়ায় ফিরে আসতে হয় শিবনাথকে।

পুরনো বাড়ির গায়ে বুড়ো নারকেল গাছ বিকেল থেকেই ডাবের ঘিয়ে সাদা মুকুল-ফুল শ্যাওলা ধরা ছাদে ফেলছিল—সন্ধ্যের প্রথম ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় সেগুলো ফুটে উঠছে। পরাধীন আমলে—অক্ষয় দেখেছে—হেরিকেনে যেন বড় তাড়াতাড়ি শিস উঠে কালি পড়ে যেতো। ফেরার পথে গড়িয়া পুলের মুখটায় রাস্তায় ঢেলে শার্ট বিক্রি

হচ্ছিল। জগাইয়ের গায়ের আন্দাজে একটা ফুলশার্ট কিনে ফেললেন অক্ষয়। গাড়িটা দূরে দাঁড় করিয়ে। নয়তো গাড়িই পাবলিকের কাছে তাঁকে চিনিয়ে দিত—সে একজন মন্ত্রী। সামনেই একটা সিনেমা হলের দেওয়ালে লেখা—এই ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে এর ঘুণ ধরা কাঠামোটাকে গুঁড়িয়ে ধসিয়ে দিতে হবে।

অক্ষয়ের ইচ্ছে হলো—এই লাইনটার নিচে লিখে দেয়—কে কাকে খায়!

আরেক জায়গায় লেখা—এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বেকারদের চাকরির ব্যবস্থার জন্যে সরকার তোমায় সেলাম।

গাড়িতে বসে অক্ষয়ের মনে হলো—চাকরিটা হোক আগে—তারপর তো সেলাম! পার্টির ছেলেরা মুখিয়ে আছে চাকরির জন্যে। সতেরোটি ফরেস্ট গার্ডের চাকরিতে জিলাওয়ারি মাত্র একজন করে কমরেডকে ঢোকানো সম্ভব হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নে অনেক বুঝদার লোক নিয়ে নাড়াচাড়া। কারখানায় কারখানায় কর্মীদের রিটায়ারের সঙ্গে সঙ্গে যার যার ফ্যামিলি থেকে একজন উঠে আসে কাজে। কিন্তু এই যে ভদ্দরলোক—হাফ ভদ্দরলোক ক্লাসের ফ্যামিলি—এদের বাড়ির ছেলেরা চায় টেবিল চেয়্যার—মাস গেলে মাইনে। সেই সুতোয় ঝোলা চাকরির জন্যে কত মানত—কত সন্তোষী মা—কত তাবিজ। ধরাধরি। উমেদারির চোটে বনমন্ত্রী প্রবোধের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। বেকার ভাতাটা চালু করে কিছুটা তিষ্ঠোনো যাচ্ছে। নয়তো—

হর্ষ ঘোষ ক'দিন আগেও বলেছে—এত দিন কিসের দিকে তাকিয়ে ছেলেরা বুক বেঁধেছে? ভোটে জিতলাম—সরকার করলাম—আর বিপ্লব হয়ে গেল। এতো হতে পারে না। কিন্তু কিছু একটা তো পাওয়া দরকার ওদের। ওদেরও তো মনে হওয়া দরকার—আমরা এই সরকারের পার্টনার।

জেলা কমিটি—মহকুমা কমিটিতে তো ওদের রাখা হচ্ছে হর্ষ।

সেখানে বড় শরিকের চাপে আমাদের ছেলেরা সিমেণ্ট, চিনি, লোহা, কেরোসিনের কোথাও কোন পাত্তা পাচ্ছে না।

অক্ষয় বলেছিল, তার মানে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়—সংগঠন আরও ভালো করে করা দরকার। চা পাট ওঠানো নামানোর জায়গায় ডকে আমরা ভালো সংগঠন করতে পেরেছি—তার ডিভিডেণ্ডও পাচ্ছি।

দল রাখতে গেলে টাকা চাই। দল রাখতে গেলে ক্যাডার চাই। জীবিকা বা জীবনের বিভিন্ন সিঁড়িতে পার্টিকে ক্যাডার বেস্ড করতে পারলে তবে না সংগঠন আর সাকসেস। অক্ষয়ের এক-এক সময় মনে হয়—আমরা যেমন—আমাদের পার্টিগুলোও তেমনি। যোগ্যং যোগ্যেন······

বিপ্লবী নিকেতনের খরচার টাকা আসে হোম পলিটিক্যাল থেকে। বাড়িটা সারাইয়ের দায়িত্ব অক্ষয়ের দফতরের। সবদিকই দেখতে হবে অক্ষয়কে।

হর্ষ ঘোষ বলেছিল, বহরমপুরে আমাদের পার্টির বেস আরও জোরালো করতে হলে ওখানে তোমার দফতরের যেসব বাড়ি তৈরি হচ্ছে—হৃষীকেশের হেল্‌থ সেণ্টার—প্রবোধের বনবিভাগের কাজ—সব জায়গায় কোন না কোন পথে আমাদের ক্যাডারদের একটা ফুট হোল্ড—একটা কিছু করা দরকার। ওই জেলাই হবে আমাদের পার্টির দুর্গ।

তাহলে তো ঠিকেদারদের ধরতে হয়। বলতে হয়—আমাদের লোক সঙ্গে নিন।

দরকারে তাই বলতে হবে অক্ষয়।

তাহলে ওরা কনসেশনও চাইবে হর্ষ।

দিতে হবে।

আমরা কি পার্টিকে নাইন্টিন থার্টি এইট থেকে সেভাবে গড়ে তুলেছি?

ওকথা বাদ দাও অক্ষয়। সেটা ছিল আদর্শবাদের যুগ।

স্বাধীনতার পরেও তো অ্যাতোগুলো বছর চালিয়ে আসা হয়েছে।

বাজার সস্তা ছিল অক্ষয়। বাড়ির ভাত খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানো সম্ভব ছিল। এখন আর তা যায় না।

আমি বলি কি হর্ষ—আমাদের তো যাবার সময় হলো।

কোথায় যাবো ?

না বলছিলাম—আমরা তো ভাতখোর বাঙালী। সত্তর ছুঁই ছুঁই—এবারে তো টিকিট কাটতেই হবে। তা নতুন ছেলেরা আসুক না। তারাই পার্টি চালাক। আমরা সরে দাঁড়াই। ওদের তো নেতৃত্বে আসা দরকার। আমরা কোন্ বয়সে এগিয়ে গেছি ? রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যদা তো সময় মতো সরে গিয়ে আমাদের ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়েছেন।

পাগল হয়েছো অক্ষয়! তখন পার্টি বলতে ছিল কয়েকখানা ভাঙা আলমারি—একটা ঘর আর হোল-টাইমারের নাম-ঠিকানা সমেত একখানা খাতা—

তাই দিয়েই তো পার্টি এত বড় হয়েছিল হর্ষ।

এখন তো আরও বিপদ ভাই। তোমরা তিনজন মন্ত্রী। লেবার ফ্রণ্টে তিন-চার জায়গায় আমরাই এক নম্বর। এত কাঁচা পয়সা হাতে পড়লে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না ওরা—

ভার দিয়েই ছাখো না। কিছু নষ্ট হবে। কিছু তো থাকবে হর্ষ।

সব উড়িয়ে দেবে। এখনো পার্টির নিজের বাড়ি হয়নি। বাড়িটা হোক। হোলটাইমারদের নেটওয়ার্ক পাকা হয়ে জমুক- -তারপর না হয় তোমার কথাগুলো ভেবে দেখা যাবে অক্ষয়।

কেন হর্ষ ? তুমি আর আমি একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে অবজারভার থাকতে পারি না ?

থেকো। প্রাণ ভরে অবজারভারি কোরো। তখন সময় পাবে। এখন তো পার্টির গোড়া শক্ত করে বাঁধো। বাড়িটা উঠুক। এখনকার বাড়ি ভেঙেই ওখানে ছ'তলা উঠবে। চা বাগানের ওরা গিয়েছিল তোমার কাছে ?

হয়তো আসবে।

হয়তো নয় অক্ষয়—যাবেই ওরা তোমার কাছে। নর্থ বেঙ্গলের

নদীগুলো বর্ষায় পাথর আর বালি বয়ে নিয়ে বাগানে ঢোকে। এনব্যাংকমেণ্ট বানানো দরকার।

সেজন্য তো সেণ্ট্রাল ফাণ্ড রয়েছে।

রাজ্যকেও এগিয়ে যেতে হবে। নাহলে অক্ষয় ওরাই বা কেন আমাদের ইউনিয়নগুলোর পাশে দাঁড়াবে? কি করেই বা পার্টি সেক্রেটারিয়েট বসবার মত বাড়ি পাবে? কতকাল ভাড়া করা ঘরে অফিস বসাবো অক্ষয়।

তুমি কিন্তু হর্ষ পার্টির সম্পত্তি বাড়াচ্ছো। পার্টি বাড়াচ্ছো না।

ভালো করে কথা বলারও তো একটা জায়গা চাই।

হ্যাঁ। ভালো করে গোড়া বাঁধো পার্টির!

আজকাল প্রায় আশি হাজার টাকা দামের অ্যামবাসাডার গাড়ির ব্যাকসিটে বসে বা হেলান দিয়ে অক্ষয় দত্ত মনে মনে ডায়ালগের চাপান উতোর কাটেন। কখনো বা চীফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজের সঙ্গে। কখনো একজোট সরকারের বড় শরিকের কর্তার সঙ্গে। কখনো বা নিজের দলের প্রেসিডেণ্ট হর্ষ ঘোষের সঙ্গে।

ইলা তো পরিষ্কার বলে—দ্যাখো বাপু—আমি সাধারণ স্কুল-টিচারের মেয়ে। নিজে এগারো বছর মাস্টারনী ছিলাম—তোমার সংসারে সুরাহা করতে। তারপর যদি মন্ত্রী হলে এই বয়সে—সে কি সবার বায়না মেটাতে? না, সত্যিকারের কিছু কাজ করতে? সন্ধ্যে হলেই টিভিতে যদি দেখতে হয়—তুমি ওখানে ফিতে কাটছো—সেখানে দ্বারোদ্ঘাটন করছো—তাহলে আগের মন্ত্রীরা কি দোষ করে-ছিল শুনি? তোমার না সত্যিকারের কাজ করার কথা। সেকথা ভুলে যাও কেন?

মনে মনে ইলার প্রশংসা করেও অক্ষয় মুখে বলেছিল—তুমি আমার মূর্তিমতী বিবেক!

ঠাট্টা কোরো না। মনে রেখো আমার মত সাধারণ মানুষরাই তোমায় ভোট দিয়ে মন্ত্রী করেছে।

মন্ত্রী মানে কি? এই প্রশ্ন নিজেকেও করেছে অক্ষয়। বেশ

কয়েক মাস হয়ে গেল—সে একজন মন্ত্রী। এখন তার মনে হচ্ছে—মন্ত্রী—মানে—পার্টি আর ক্যাডারদের কথা ভেবে চলতেই হবে। জায়গায় জায়গায় ইউনিয়নগুলো যাতে জোরালো থাকে—সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। আমলারা নিয়ম-কানুনের সরু গলি দিয়ে—হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা—অবস্থায় মন্ত্রীকে পেতে চায়। এর এদিক ওদিক হলেই কাজের ভেতর ফ্যাকড়া ওঠানো হবে। সব আমলা তেমন নন্। কিন্তু সিস্টেমটাই এমন যে সবাইকে টেনে নিজের পথে নামাবে। বিধানসভা মানে কত সতর্কভাবে নিজের দপ্তরের না-পারা-কাজগুলো ঢেকে রেখে ভাষণ দেওয়া। সামনে কত বড় স্বপ্ন আছে—তারও রঙীন আভাস দিয়ে যাওয়া। একদম একটা সার্কাসে দড়ির খেলা দেখানো। এরই ভেতর সামনের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে জায়গায় জায়গায় একটা করে ঘুটি রেখে যেতে হবে। সময়মত সেসব ঘুটি পাকবে।

এর ভেতরেও নিজের অফিসে আছে কর্মী ইউনিয়ন। দু'তিন রকমের। এই রাইটার্সেই রিটায়ার হওয়া বয়স্ক পুরনো কর্মীরা নাকি এক কাউন্টারে গিয়ে নতুন দিনের ছোকরা এক কর্মীকে হরলিকসের কৌটো উপহার দিত। যাতে পেনসনের কাগজপত্র তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। এসবের ভেতর আশি হাজারী অ্যামবাসাডর—একান্ত সচিব—ব্লুপ্রিণ্ট,বিজয় মিছিল—লাল এনগেজ্ড আলো কেন যেন এক এক সময় খেলনা মনে হয় অক্ষয়ের।

বাজেট নিয়ে ক'দিন খুব কুস্তি গেল। আক্রায় সেকেণ্ড স্টেজে আটশো বাড়ি তুলতে টাকা দরকার। দরকার কালীদহের ড্রেনেজ, ইলেকট্রিসিটি বাবদে। বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাড়ি তৈরি মাঝপথে থেমে আছে। তাছাড়া ঘরবাড়ি তোলার লোন স্কিম অথৈ জলে। এম-এল-এ থাকতে এক এক সময় অক্ষয়ের মনে হোত—আমি যদি কোনোদিন মন্ত্রী হই তো—কলকাতার পুরনো বাড়িগুলো ভেঙে সেখানে মাল্টিস্টোরিড তুলতাম। কলকাতাকে ওপরদিকে ঠেলে তুললাম। সাধারণ অবস্থার মানুষ সে

বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে পারতো। নাহয় তুশো বছরে শোধ হতো বাড়ির খরচা—ভাড়ার টাকায়।

বাজেট প্রোপোজাল তৈরী হওয়ার পর সামনেই অ্যাসেমব্লি সেসন। অক্ষয় রাইটার্স-পার্টি অফিস করে ফেরার পর সন্ধ্যেরাতেই পাজামা পরে শুয়ে পড়লো। আমি আর পারছি না ইলা। এত অঙ্ক। আমার শরীর খারাপ লাগে—

গাড়িটা ছাড়ো তো আগে। ফের হাঁটা অভ্যেস করো। আবার বাজারে যাওয়া ধরো তো সকালে।—

বাজারে গেলে লোকে নানান প্রশ্ন করবে। ভোরে হাঁটতে বেরোলে এই শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

মাঙ্কিক্যাপ, কোট, গরম মোজা পরে বেরোবে। বাজারে কেউ কোশ্চেন করলে জবাব দেবে। বিধানসভায় দিতে হয় না তোমাকে—

একা হাঁটতে ভালো লাগে না ইলা। ভীষণ একা লাগে কুয়াশার ভেতর। পার্কে তখন ছেলেরা দৌড়োয় শুধু।

তোমার বয়সী অনেকেই যায়। পটলের বাবাও যান। তুমিও তো একসময় দৌড়োতে গড়ের মাঠে।

সে তো কলেজ লাইফে।

আবার যাবে। না হয় আমি সঙ্গে যাবো। এভাবে গাড়ি চড়লে তুমি তো একদিন মারা যাবে। দরকার নেই আমাদের মিনিস্টার থেকে। এম এল এ থেকেছো কত বছর—আমাদের তো কোন অসুবিধে হয়নি।

প্রোমোশনটা যদি আর একটু কম বয়সে হোত।

প্রোমোশন কি বলছো? আমি তো বলবো এটা ডিমোশন! থ্যাঙ্কলেস জব। কেউ খুশী হয় না। সম্ভ্রম কতটা জানি না—আমার তো মনে হয় ভয় থেকে লোকে আমাদের দিকে তাকায়।

এতেটা খারাপ ভেবো না ইলা। এখন আমাদের সংসার ছোট—দিব্যি তো চলে যাচ্ছে সব ইলা।

পরদিন সকালে ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে প্রায় বত্রিশ বছরের পুরনো

দম্পতি হাঁটতে বেরোলো। শীতের ছ'টা। পার্ক সার্কাস ময়দানে আরও কিছু মানুষজন একই পোশাকে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছে। ইলা আর অক্ষয় কুয়াশার ভেতর দিব্যি হাঁটতে লাগলো। অক্ষয় পিছিয়ে পড়ছিল। তাই ইলাকে থেমে পড়ে অক্ষয়ের সঙ্গে এক লয়ে আসতে হচ্ছিল।

এমন সময় আরেক মাংকিটুপি ওদের সামনে থেমে গেল। আরে অক্ষয়বাবু যে—মিনিস্টার হইয়ে তো একদম দেখাই পাই না। হামি লালা। লালা ঘাসিরাম মতিলাল! হাপনার মাসকাবারি মুদি আছি!

ওঃ! ভালো আছো লালা!

হামি তো ভাল আছে। আসলী কড়ুয়া-কা-তেল যায় আপনার বাড়ি। মিনিস্টার হইয়া চেহারা-সকল এমন হৈল কৈসে? খুব খাটুনী কা কাম?

থোড়া বহুৎ। বলেই অক্ষয় হাঁটতে শুরু করে দিল।

ইলা একটু থামলো। রেশন এসেছে লালা?

কাল ব্যাগ পাঠাবেন। ভালো চাল আসবে।

রেপসিড অয়েল এসেছে?

ও ভি পাইয়ে যাবেন। মসুর ডাল ভি পাবেন।

দুজনে আবার একই লয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। ইলা বললো, জগাইকে কালই সকালে পাঠাতে হবে। চিনিও দেবে নিশ্চয়।

হাঁটতে হাঁটতে অক্ষয় বললো, চিনি দিয়ে কি করবে? আমি বা তুমি কেউই তো খাই না।

মেয়েরা আসে তো।

কুয়াশার ভেতরেও রক্ষা নেই। দেখলে—ঠিক চিনেছে।

তা চিনুকগে। কোন গায়ে পড়া মেশা নেই তো লালার। এসো ওই গোলপোস্ট অবধি হাঁটবে।

আর হাঁটতে পারছি না ইলা।

অভ্যেস করো।

পরদিন খুব ভোরে একা একাই হাঁটতে বেরুলো অক্ষয়। গতকাল হেঁটে সারাদিন শরীরটা হাল্কা লেগেছে। কাজও করতে পেরেছে অনেকটা। বিপ্লবী নিকেতনের কেয়ারটেকারকে বদলী করে সঙ্গে সঙ্গে একজন ছোকরা কেয়ারটেকারকে ওখানে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পূর্ত দফতরের লোকজন গিয়ে বাড়িটা সারানোর হিসাব কষেছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজ শরৎ সেতুর ফাইল থেকে দরকারী জায়গাগুলো তারকবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

পার্ক সার্কাস ময়দানের যেদিকটা ট্রাম ডিপোর গা ধরে বেশ নির্জন—সেখানটায় অক্ষয় হাঁটছিল। তার পাশাপাশি আরো একজন। খালি মাথা। বেশ সুন্দর চেহারার মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক অক্ষয়ের সঙ্গে সমানে হাঁটছে। একসময় অক্ষয় ব্যাপারটা যাচাই করতে আচমকা মোড় ঘুরলো।

লোকটিও মোড় ঘুরলো। অক্ষয় বিরক্ত হয়ে মনে মনে বললো, মন্ত্রী এমনকি দেখার জিনিস! সে তো ফিল্মস্টার নয়। লোকটি এইসময় কাছাকাছি এসে বললো, নমস্কার। আমায় চিনতে পারছেন?

অক্ষয় হাঁটা না থামিয়ে পরিষ্কার এড়িয়ে গিয়ে হাঁটতে লাগলো। কোন কথাই বললো না।

এবারে লোকটি এগিয়ে এসে অক্ষয়ের হাঁটার পথ আটকালো। অক্ষয় একটু ঘাবড়ে গেল। হাতে যদি একখানা ছড়িও থাকতো। কী করে লোকটা বলা তো যায় না। সিকিউরিটির লোক নিয়ে এবারে হাঁটতে বেরুবে।

দাঁড়িয়ে গিয়ে ধমকে উঠলো অক্ষয়। কোন কাজ থাকলে অফিসে যাবেন। এখানে কি?

অফিসে তো যেতেই হবে। এখানে আপনাকে একলা পাবো জানতাম।

অক্ষয়ের খুব অপমান লাগলো। পথ ছাড়ুন—

লোকটি সরে গিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চললো, আমি স্যার কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়ার—

দাঁড়িয়ে পড়লো অক্ষয়। সকালবেলার আনকোরা মনে তার কিছুতেই এ নামটার প্রসঙ্গ মনে পড়লো না। তাই আন্দাজে বললো, তা এখানে কি ?

আপনার সঙ্গে এমনিতেই দেখা করতে হবে স্যার তাই আগে থেকে—

সব মনে পড়ে গেল অক্ষয়ের— শরৎ সেতু ? তা অফিসে আসবেন। এখানে কি ?

আমাদের প্রতিষ্ঠানের গুডউইলের কথা মনে রেখে আপনি যদি ব্যাপারটা—

একটা কথাও আপনার সঙ্গে এখানে বলবো না। বিরক্ত করবেন না। যান—যান বলছি।

লোকটি দাঁড়িয়ে পড়লো। শুধু শুধু রেগে যাবেন না স্যার। আপনার চেয়ারে আগে যারা বসতেন—তাঁদের সঙ্গেও দরকারে আমরা আলাদা বসেছি—

আমার সঙ্গেও বসতে হতে পারে। তবে অফিসে। পার্কে নিশ্চয় নয়। আসুন এখন—

বেলা দশটায় অফিসে এসেই ডি সি এনফোর্সমেণ্টকে লালবাজার থেকে ডেকে পাঠালো অক্ষয়। তিনি আসতেই অক্ষয় বললো, এই প্রতিষ্ঠানের গোডাউনের ঠিকানা—অন্যসব ঠিকানা—আগেই আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ওদের ওখানে রেইড করতে হলে বড় ফোর্স দরকার।

সকালেই আমি হোম সেক্রেটারি, পুলিশ কমিশনার, আই-জি সবাইকে বলে রেখেছি। দরকারী ফোর্স আপনি পাবেন—

বুঝতেই তো পারছেন স্যার—বড় প্রতিষ্ঠান। সারা কলকাতায় গোডাউন ছড়ানো।

আমরা কাশীপুর গোডাউনেই যাবো। আপনার তদন্ত রিপোর্টে পাচ্ছি—সিমেন্টের নয়ছয় হয়ে থাকে।

আমি তো তাই পেয়েছি। আমাদের ইনটেলিজেন্স তাই বলে। স্পটে আরও গোলমাল বেরিয়ে পড়বে দেখবেন।

আমিও সঙ্গে থাকবো আপনার।

তাহলে তো কোন কথাই নেই স্যার। আপনার প্রেজেন্স মানেই আস্ত একটা ব্যাটালিয়ন।

সন্ধ্যের বেশ খানিক পরে ছ' ছখানা ব্ল্যাক মারিয়া বোঝাই দিয়ে রিজার্ভ ফোর্স গিয়ে নামলো—কাশীপুরে রতনবাবুর ঘাটের কাছাকাছি। শীতকালের রাত আটটা। কাছেই গঙ্গায় আলো জ্বালিয়ে গাদাবোট ভাসছে। খাপরা টিনের ছাদওয়ালা পরপর গোডাউন। পুলিশ নেমেই গোড়ায় বেরোবার পথগুলো সিল করে দিল। তারপর বড় ব্যাটারির সার্চলাইট হাতে ঝুলিয়ে ছ'সাত জনের দলে ভাগ হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ডি সি এনফোর্সমেন্টের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল অক্ষয়, কোন গোলমাল হলে—

আগে ওরা ভেতরে ঢুকে সব স্মুদ করে নেবে। স্মুদিং হয়ে গেলেই—সিগন্যাল আসবে—

স্মুদিং মানে এখন জানে অক্ষয়। বাধা দিতে এলেই প্রথমে ছলে—না হলে বলে—প্রতিরোধের মাজা ভেঙে দেওয়াই ওদের কাজ। বিরাট একটা শব্দ হলো। তারপর কিছু চীৎকার। খুব জোর গলায় জড়ানো একটা গালাগালি।

পাছে মেইন অফ করে দিয়ে—সব অন্ধকার করে ফেলে—তাই সার্চ লাইট। তাছাড়া আছে লোডশেডিং—তবে সি ই এস সি-কে লালবাজার বলে রেখেছিল—পিক আওয়ারে কাশীপুর আজ যেন অন্ধকার না করা হয়।

এবার চলুন স্যার। আপনারাও চলুন।. সিগন্যাল দিচ্ছে—

মিনিট চল্লিশের মামলা। ফেরার পথে খবরের কাগজের রিপোর্টার

আর ফটোগ্রাফার তো খুব খুশী। সিমেন্টে মেশানোর জন্য পাথর গুঁড়োনোর ইলিকট্রিক জাঁতার ছবি তোলা গেছে। সিমেন্টের বস্তার লাট। সেলাই করার মেশিন। সুতোলির ডাই। থরে থরে সাজানো ব্যাগ। ভেজাল মিশে গিয়ে এক টন মাল দেড় দু'টন হয়ে যাচ্ছে। চালান বই। একসাইজের জাল সিল। কোম্পানীর খাতা। রিপোর্টারটি অক্ষয়ের অপোজিশনে থাকার সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রোজ সকালে কাগজ পড়ার পর অক্ষয় ফোনে তাকে মতামত দিয়ে থাকে। উপরন্তু কনস্ট্রাকশন ইণ্ডিয়ার পারমানেণ্ট লেবারফোর্স থেকে সতেরজন ধরা পড়েছে। এদের কাউকে নিশ্চয়ই অ্যাপ্রুভার করা যাবে। ডি সি এনফোর্সমেণ্ট বললো, আরও জনা ছয়েক ধরা পড়তো স্যার। গঙ্গার দিককার নালা সাঁতরে অন্ধকার নদীতে চলে গেল।

ডুবে যাবে না তো?

অক্ষয়ের একথায় ডি সি এনফোর্সমেণ্ট বললো, না স্যার। এরা পাকা লোক। বিশ্বাসী বলেই ভেজাল কারবারে রেখেছে কোম্পানী। ওদের কথা ভাববেন না স্যার। আজ রাতটা লালবাজার লকআপে কাটাক। কাল তো কোর্টে প্রোডিউস করবো। তখন আপনি কিন্তু সরকারী উকিল দেবেন স্যার। কেস না কেঁচে যায় শেষে।

না না। ও আপনি ভাববেন না। আমি নিজেও তো একজন উকিল।

তাই নাকি স্যার। ও হ্যাঁ—মন্ত্রী হবার সময় আপনার শর্ট স্কেচ পড়েছি কাগজে।

ইউনিয়নগুলোর হয়ে অনেকবার মুভ করেছি লেবার কোর্টে।

লালবাজারে, গেটে নেমে যাবার সময় রিপোর্টার ভদ্রলোক এনফোর্সমেণ্টকে বললেন, দেখবেন—আই জি বোর্ড যেন খবরটা চাউর করে না দেয় অন্য কাগজকে। তাহলে আমাদের স্কুপ—

ডি সি এনফোর্সমেণ্ট বললেন, আমরা জানি মশাই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

হাতঘড়িতে পৌনে দশটা। অক্ষয় সোজা বাড়িতে যাবে। যাবার সময় রিপোর্টার, ফটোগ্রাফারকে ডাকলো। চলো, তোমাদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে যাই—

ফটোগ্রাফার বললো, না না—আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন?

অতো বুড়ো হইনি ভাই। চলো—খানিকটা এগিয়ে দিই।

খানিকটা নয়—একদম অফিস অব্দি এগিয়ে দিল অক্ষয়। খবরটার গুরুত্ব একজোট সরকারের পক্ষে কতখানি—তা নিয়ে রিপোর্টারের সঙ্গে কিছুটা কথা হলো অক্ষয়ের। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই রাত সাড়ে দশটা।

ওপরে উঠে অক্ষয় দেখলো, বসার ঘরের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। বোধহয় জামাইরা কোন একজন এসেছে। আজ তাহলে অক্ষয়কে ক্যাম্পখাট নিয়ে বারান্দায় শুতে হবে। কোন্ মেয়ে এলো? বড় না ছোট?

ঘরে ঢুকে অবাক হলো অক্ষয়। কি ব্যাপার হর্ষ? এত রাতে? খারাপ খবর কিছু?

আরে না না। তুমি খেয়ে নাও। সারাদিন খেটে-পিটে এলে।

তুমি খেয়েছো?

আমি তো অফিসে বসেই খেয়ে নিই। তারপর বৌঠান গুচ্ছের খাওয়ালেন। এই তো উঠে গেছেন খানিকক্ষণ।

তুমি বসবে একটু।

আমার জন্যে চিন্তা কোরো না কোনো। সারারাত পার্টি অফিসে শুয়ে থাকি। এটা সেটা পড়ি। ঘুম আসতে চায় না।

তাহলে আমি জামাকাপড় ছাড়ি। বলে ভেতরে গেল অক্ষয়। ইলাকে বলে কিছু জানা গেল না। খেতে বসে তবু ইলাকে চাপা গলায় বললো, কিছু বলেছে হর্ষ?

ইলা মাথা নাড়লো। খেয়ে উঠে অক্ষয় এসে বসলো। আজ রাতটা এখানে থেকে যাও। কাল সকালে চা খেয়ে যাবে।

না না। আমি ট্যাকসি নিয়ে চলে যাবো।

অক্ষয় বললো, আজ বড় একটা এনকোয়ারির প্রাইমারি এভিডেন্স যোগাড় হলো হর্ষ। সিমেন্ট গোডাউনে রেইড করাতে হলো।

কাজটা কি ঠিক হলো অক্ষয়।

একটু থতমত খেয়ে গেল অক্ষয়! কেন? জনসাধারণের অনেক আশা—আমরা কিছু করবো। ভেজাল রন্ধ্রে। তা একটা কেসও যদি ঠিকমত আলোতে আনা যায়—

এভাবে কি আসল শত্রুকে ঘায়েল করা যাবে ভেবেছো?

হর্ষ ঘোষের কথায় কেমন খটকা লাগছে অক্ষয়ের। আসল শত্রু বলতে তো তুমি বড় পুঁজির কথা বলছো? সেখানে কি করে পৌঁছাবো? কিন্তু সে পথের যেখানে যতটুকু পারি—এই সামান্য ক্ষমতার ভেতর সেটুকু কেন করবো না হর্ষ?

তাতে বড় পুঁজি যে গলে বেরোবার পথ পেয়ে যাবে। মাঝখান থেকে সামান্য ক্ষমতার উৎসও বন্ধ হয়ে যাবে—

তাহলে কি চুপ করে বসে বসে সব দেখবো বলতে চাও।

শক্তি সঞ্চয় করে চরম আঘাত হানবার সময়—সুযোগ পরে আসবে অক্ষয়।

ততদিন পাবলিক আমাদের দর্শক হয়ে থাকতে দেবে? টেনে ফেলে দেবে না—

আশার আলো জাগিয়ে রাখতে হবে অক্ষয়।

তুমি বলছো সেই বিখ্যাত অ্যাওকেনিংয়ের কথা! যে আলো নাকি একদিন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে! অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে যাওয়া—আর চাদ্দিক জাগিয়ে তোলা?

এই তো ঠিক ধরেছ অক্ষয়। একথাটাই আমি তোমায় বোঝাতে চাইছি অনেকদিন ধরে।

তুমিও হর্ষ? তুমিও সেই বড় পার্টির গলায় কথা বলছো শেষে—

না বলে উপায় কি বলো? কথাটা তো বেঠিক কিছু নয়। পরিবেশ অনুযায়ী কর্মপন্থা লেনিনই তো—

আবার লেনিনকে কেন টানছো? তা এত রাতে তুমি কি শুধু এই

কথাটা বোঝাতে আমার বাড়িতে এসে বসে আছো ? এ তো কালও তুমি সন্ধ্যেবেলা আমায় পার্টি অফিসে বলতে পারতে। সরেজমিনে রেইডের পর—

ওই ব্যাপারেই তো আমার আসা।

তাই বলো কমরেড !

এটা ঠাট্টার সময় নয় অক্ষয়। সবদিক ভেবেই আমি এসেছি। আমার আসা দরকার। আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট। শাসকশ্রেণীর হামলার ভেতর পার্টিকে চোখের মণির মত আগলে আগলে রেখে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি।

একদম অন্ধ হয়ে গেলে মণি কি কাজে লাগবে হর্ষ ! তুমি কি ভেবেছো—আমরা শুধু চারদিক জাগিয়ে রাখবো—কাউকে ঘুমিয়ে পড়তে দেবো না—এই ব্যাপারটায় জনগণ মুগ্ধ হবে ? আর হাতের কাছে অপরাধীকে দেখলেও—হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেবো ?

পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ছাড়তে হবে অক্ষয়। আঘাতের সময় যারা আমাদের টিকিয়ে রেখেছে—যারা আমাদের পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে—তাদেরও তো দেখতে হবে। এখন আমাদের পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় অক্ষয়।

তুমি কখন খবর পেলে ?

যখন রেইড চলছে—তখনই ওঁরা এসেছিলেন। রেইড্ করার আগে একজোট সরকারের কমিটিকে জানানো উচিত ছিল অক্ষয়।

তাহলে তো সরকার একজন মন্ত্রী দিয়েই চালানো যায়। কমিটি সব সিদ্ধান্ত নেবে—আর একজন মন্ত্রী সব দফতরকে নির্দেশগুলো পাঠিয়ে দেবে ! পার্টি বা সরকারের কিছুই করার থাকবে না।

হর্ষ ঘোষ ও কথায় গেল না। পরিষ্কার বললো, রেইড্ করালে—তার ওপর আবার ফোটোগ্রাফার রিপোর্টার ?

অক্ষয় দত্ত গুম হয়ে গেল। সরকারে আসার আগে এমন একটা অবস্থা যে ঘটতে পারে কোনদিন—তা তার কল্পনাতেও আসেনি কোনদিন।

এখবর তো কাল সকালে বেরিয়ে যাবে ?

তা যাবে হর্ষ। আমরা এতদিন খবরের কাগজের স্বাধীনতার কথা বলে এসেছি।

মনে রাখবে —স্বাধীনতা মানেই দায়িত্বহীনতা নয়।

অক্ষয় ভাবছিল—এই ক'বছরে পুরো পার্টি হর্ষের কবজায় চলে গেছে। লেবার ফ্রন্ট স্টুডেন্ট উইং ইয়ুথ ফ্রন্ট—সব জায়গায় হোল-টাইমার,ক্যাশ—সবই হর্ষের হাতে। অক্ষয় শুধু জনসভার পর জনসভা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। এস্প্ল্যানেড ইস্টে আইন অমান্য করে পুলিশ ভ্যানে উঠেছে। তখন হর্ষ ঘোষ পেছনে বসে জেলায় জেলায় পার্টির ক্যাডার থেকে হোলটাইমার বেছে খাতায় নামঠিকানা তুলেছে। হর্ষ ঘোষ আজ নিজেই একজন প্রতিষ্ঠান। একজোট কমিটির বৈঠকে যখন যায়—তখন হর্ষের নামের আগে কাগজগুলো লেখে—প্রবীণ জননেতা।

এটা বুঝছো না কেন অক্ষয়—আজকে পার্টির সবচেয়ে বেশি যা দরকার—তা হোল পার্টিকে এগিয়ে দেবার জন্যে—গাঁয়ে গঞ্জে ছড়িয়ে দেবার জন্যে—রিসোর্স। ওরা ছাড়া আমরা কোথায় টাকা পাবো ? চাঁদার—পাবলিক ডোনেশনে—কুপন বেচে কতই বা ওঠে ! আমাদের কাছে কাজ না পেলে ওরা ওদের সব রিসোর্স নিয়ে বড় শরিকের দরজায় গিয়ে হাজির হবে। আমরা আরো দুর্বল হবো—ওরা ফুলেফেঁপে আরও বড় হবে। একদিন তুমি সুদ্ধ আমরা সবাই ছিটকে পড়ে যাবো। সেটা ভালো হবে ?

আগে যারা ছিল—তারা সব রিসোর্স হাতের মুঠোয় পেয়েও ছিটকে পড়ে গেল কেন হর্ষ ?

ওরা আইন করতো সংস্কারের জন্যে—আইন প্রয়োগ করতো না ! তাতে সাধারণ মানুষ চটে যেতো। আর দেশের ভালো করবো—বড় পুঁজিকে সমাজতন্ত্রে আনবো আনবো বলে চেঁচাতো—কাজের বেলায় আমলাবাজি, লালফিতের চোটে সবার নাভিশ্বাস তুলতো—ফলে সবাই চটে গিয়েছিল—তাই এই অবস্থা।

তাহলে হর্ষ আমরা ওদেরই একটা রকমফের মাত্র! আর এজন্যেই এতোকাল অপোজিশনে ছিলাম?

ওসব চুলচেরা বিচার পরে কোরো। আগে ফোন করো। খবরটা যেন না ছাপে।

পাগল হয়েছো। এ খবর ছাপতে আমি বারণ করবো? কক্ষণো নয়।

আমি আর কি বলব অক্ষয়। তোমারো বয়স হয়েছে। হঠকারিতা কথাটা তোমার নামের সঙ্গে জড়াতে কষ্ট হয়—আর এও বুঝি ওই কথাটা বললেও—তোমার সবটা বলা হয় না। আমি পার্টি অফিসে ফিরে যাচ্ছি। দেখি ফোন করে কিছু করা যায় কিনা—

দ্যাখো চেষ্টা করে। তোমার পাকা মাথা।

হর্ষ ঘোষ চলে যেতে সদর বন্ধ করে অক্ষয় ভেতরের ঘরে গেল। ইলা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাতঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা। হয়তো না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে ইলা।

টেলিফোনটা তুলে খুব আস্তে ডায়াল করলো অক্ষয়।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো, হ্যালো। নিউজ—

অক্ষয় রিপোর্টারের নাম বললো। ওপাশ থেকে ভেসে এলো—বাড়ি চলে গেছেন অনেকক্ষণ।

ফোন নামিয়ে রাখলো অক্ষয়। খবরটা ছাপতেই হবে—একথা সে বলতে পারে না। খবরটা যেন কিছুতেই ছাপা না হয়—একথাও সে বলতে পারে না। দুটো কাজই তার এক্তিয়ারের বাইরে। আমি পশুপালন আবাসন মন্ত্রী অক্ষয় দত্ত বলছি—ওখবর অবশ্য ছাপবেন—ইণ্টারেস্টেড পার্টি অন্যায় অনুরোধ করতে পারে—একথাও তার বলার এক্তিয়ার নেই।

এক যদি কাগজের প্রোপাইটারকে ঘুম থেকে তুলে হর্ষ কিছু বলে। বলার কথা বেশি কিছু নেই। একনম্বর কথা—ওসব আজেবাজে খবর ছাপতে পারেন—কিন্তু এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন মনে রাখবেন আমাদের অ্যাফিলিয়েশনে আছে। দু'নম্বর কথা—জোট

সরকারের মাথায় যে কমিটি—আমিও তার একজন মেম্বার। অতএব—

খবরটা বেরোতেও পারে—আবার নাও পারে—এসব কথা ভাবতে ভাবতেই পূর্ত ও আবাসন মন্ত্রী অক্ষয় দত্ত ঘুমিয়ে পড়লো।

॥ ৪ ॥

তাম্রশাসন গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটু জল ভেঙে দু'টি ছেলে চলেছে। পরনে ইজের, গায়ে নিমা। হাতে দড়িতে ঝোলানো দোয়াতদানি। ডান বগলে খাগ কেটে কয়েকটা কলম সুতুলির আসন গুটিয়ে বাল্যশিক্ষার সঙ্গে পাকানো। কাল রাতের বৃষ্টিতে দু'ধারের তল্লা বাঁশের ঝাড় আগাগোড়া ভিজে। এই দাদা—আজ আর যেয়ে কাজ নেই—কত জল দেখেছিস—

দাদা নামে যাকে পাশের ছেলেটি বাড়ি ফেরার কথা বললো—তাকে অক্ষয় চিনতে পারলো।

ওই তো সে। দাদা তার ছোট ভাইয়ের চেয়ে লম্বায় কিছু ছোট। পাশে চ্যাপ্টা। হাসিখুশি গোলমুখ। ওই তো সে নিজে। কেমন পরিতৃপ্ত পরিতৃপ্ত ভাব। না। আজ জাড্য, আড্য—বানান দেবেন পণ্ডিতমশাই।

বাঃ! দাদা—ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য—এগুলো আগে হয়ে নিক।

তুই তো যাসনি পাঠশালায় কাল। পণ্ডিতমশাই ও পাতা পড়িয়ে দিয়েছেন তো—

অক্ষয় দত্ত দেখছিল—আর ভাবতে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছিল—তাহলে কি আমি আর বড় হইনি? এখনো আমরা দিগম্বরীতলা পাঠশালায় পড়তে যাই? তাহলে তো মা বেঁচে আছে। বাবা বেঁচে আছে। উঁ অ্যাতোগুলো বছরের সবই তাহলে দুঃস্বপ্ন। বাবাঃ! বাঁচা গেল। সাবালক হওয়ার নামে কে চায় এত সঙ্ঘর্ষ, এত যন্ত্রণা,

এত বিচ্ছেদ। অক্ষয় ভাবলো—তাহলে আমি বোধহয় আমার ভবিষ্যতের দরজা খুলে আগাম ঢুকে পড়েছিলাম। নয়তো ইলা নামে কে একজন যেন আছে আমার। এই এখন থেকে ভবিষ্যতের কোনো একটা সময়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা। আমি অনেক আগেই সেইসব দেখাসাক্ষাতের কথা জেনে ফেলেছি। নাহলে এখন তো আমি সবে দিগম্বরীতলা পাঠশালায় চলেছি।

কোনটা সত্যি? আগাম ভবিষ্যতের সাবালক কোনো কিছু জটাঘটি পাকানো স্মৃতি? না, বর্ষার তাম্রশাসন পেরিয়ে গাঁয়ের শেষ সীমানায় দিগম্বরীতলা পাঠশালায় যাওয়া? কোনটা অলীক? কোনটা সত্যি? লেনিন কি বলেন? কে লেনিন? এখানে লেনিন কি করে আসেন?

ইলার ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যাওয়াতে অক্ষয় খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলো না। চা খাও। সিমেণ্ট গুদামে হানা দেওয়ার কথা তো কাল বলোনি।

অক্ষয় কোনমতে চোখ খুলে বললো, কাগজটা দাও তো।

দাঁড়াও। পড়া হয়নি আমার।

দাও না একটু। দেখেই দিয়ে দেবো তোমায়।

অক্ষয় আঁতিপাতি করে দেখলো খবরটা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দু'বার পড়লো।

দারুণ কাজ করেছো। ও ভালো কথা—হর্ষবাবু ফোন করেছিলেন খুব ভোরে। তুমি তখন মড়ার মত ঘুমোচ্ছিলে। বললাম সেকথা। তা উনি বললেন, ঘুম থেকে উঠে ওকে যেন ফোন করো তুমি। কাল রাতে অতক্ষণ কথা বললে দুজনে—আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। তা কি এত কথা—

অক্ষয় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আজ হাঁটা হলো না ইলা—

হেঁটে বাজার যাও এখন। তাহলেই শরীরটা ঠিক থাকবে তোমার।

বাথরুমে ঢোকার মুখে অক্ষয় বললো, হ্যাঁ। তাই যাবো। ফোনটা নামিয়ে রাখো তো। নয়তো ঘন ঘন ফোন ধরতে হবে।

অনেক দিন পরে বাথরুম থেকে চানটান করে বেরিয়ে নিজেকে রীতিমত ফ্রেস লাগলো অক্ষয়ের। বাজারে যাবার সময় ডেকে বললো, ইলা—আজ বড় খুকীকে আসতে বলো। ছেলেমেয়ে নিয়ে আসুক। আজ সবাই রাতে এখানে খাবে।

তাহলে জগাইকে সঙ্গে নাও বাজারে।

কোন দরকার নেই! বলেই অক্ষয় বেরিয়ে পড়লো। চির-কালের খোশমেজাজী গেরস্থ চালে।

অফিসেও আজ সবার আগে এসে পৌঁছালো অক্ষয়। কেয়ার-টেকারকে ডাকিয়ে এনে ঘর খোলাতে হলো। ফরাস এসে যত্ন করে টেবিল মুছলো। একখানা চিঠি পড়ে যাচ্ছিলো টেবিল থেকে। নিজেই কুড়িয়ে তুললো অক্ষয়। পোস্টকার্ড। সে কাল বেরিয়ে যাবার পরে এসেছে হয়তো। কাঁচা হাতে লেখা ঠিকানায় তার নাম। শুরু এভাবে—

প্রিয় মন্ত্রীমহাশয়,

আমরা হেয়ার স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্রবৃন্দ—আপনাকে বিনীত অনুরোধ যদি একটা 'শেড' বানাইয়া দেন। আমাদের ক্লাস রুমের বাহিরেই খোলা চাতালে আমরা খেলি। এখন শীতকালে ভালো। কিন্তু গরমকালে কিংবা বৃষ্টিতে ওখানে খেলিতে—দাঁড়াইয়া টিফিন খাইতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়।

আশা—আপনি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন।

ইতি—

বিনীত

ক্লাস সিক্সের ছাত্রবৃন্দ

হেয়ার স্কুল, কলিকাতা

চিঠিখানা পড়ে পুরো চাতালটা ঝক করে অক্ষয়ের মাথার ভিতর বিঁধে গেল। তাম্রশাসন থেকে বাবা আমাদের কলকাতায় নিয়ে

এলেন। দিগম্বরীতলা পাঠশালা থেকে একলাফে হেয়ার স্কুল। সেই ইজের-নিমা পাল্টালো না। মাসে ছাত্র বেতন চার টাকা। আমরা দু' ভাই পড়ি। বাকি দু'ভাই তখন অনেক ছোট। তবে সু জুতো উঠলো পায়ে। পটুয়াটোলা লেন থেকে হেঁটে স্কুলে যাই—কাছেই তো। মা টিফিন দিতো—ভিজে চিড়ে—তাতে চিনি আর লেবু। আমি আর আমার পরের ভাই চাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতাম। গায়ে বাড়িতে কাচা ইজের আর নিমা। মা বাবা নিরামিষ খেতেন। ঘি আসতো। বোধ হয় ছ' আনা সের ছিল। মা বাবা আগ্রার রাধেস্বামীদের বড় হুজুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাড়িতে পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস, ডিম ঢুকতো না। আমি জন্ম থেকেই নিরামিষাশী। পরে ছোট দু' ভাই আমিষ ধরে। মা চার আনায় চারটি আম কিনতো। লনড্রির বালাই ছিল না তখন কলকাতায়। কী সুন্দর দিন গেছে। সর্বাধিকারী-বাড়ি থেকে ভালো টিফিন আসতো। সবচেয়ে ভালো আসতো লক্ষ্মীনারায়ণদের বাড়ি থেকে। লক্ষ্মী আমার মায়ের ভিজানো চিড়ে খেয়েছে। আমি খেয়েছি লক্ষ্মীদের বাড়ির ঘিয়ে ভাজা সরের কেক। ওই চাতালে দাঁড়িয়ে। তখনো বৃষ্টি লাগতো। রোদ লাগতো। শীতে রোদ্দুরের আরাম—

বেলা এগারোটা নাগাদ হেয়ার স্কুলের হেড মাস্টারমশাই তাঁর টেবিলের সামনে জলজ্যান্ত একজন মন্ত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পটাং করে উঠে দাঁড়ালেন। অক্ষয়ের চেহারা সবাই চেনে। কাগজে ছবিই ছাপা হচ্ছে বছর তিরিশেক। নাম আরও আগে থেকে। আপনি স্যার? কি ব্যাপার? ডেকে পাঠালেই যেতাম।

অক্ষয় মন্ত্রীর উপযুক্ত গলায় বললো, এখানে আমায় স্যার বলবেন না। এখানে আপনি সর্বময়। চলুন তো আপনার স্কুলের উঠোনটা দেখবো—মানে চাতাল—যেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেরা টিফিন খায়—খেলাধুলো করে—

চলুন। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

চাতালে দাঁড়িয়ে অক্ষয় দত্ত চারদিক তাকালেন। বড় করে

নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ভরে ফেললেন। স্মৃতিই কি মানুষের সাহসের উৎস? মনে পড়লো, হেডমাস্টার মশাইকে তাঁর কথার জবাব দেওয়া হয়নি। আচমকাই অক্ষয় বলে ফেললো, এখানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পেতাম—গান্ধীজীর ননকোঅপারেশনের ডাকে দলে দলে স্টুডেন্টরা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—অ্যালবার্ট হলের মিটিংয়ে যাচ্ছে। আমরা তখন ছোট।—সবে ফাইভে পড়ি।

আপনি আমাদের এক্স-স্টুডেন্ট?

সে কথায় না গিয়ে অক্ষয় বললো, সিক্সের ছেলেদের একবার ডাকা যায়—যদি কোন অসুবিধে না থাকে।

অসুবিধে কিসের! এখুনি ডাকছি। একটা চেয়ার দিক আপনাকে এখানে—

না। কোন দরকার নেই। একবার ওদের ডাকুন।

অক্ষয় দেখলো, হেডমাস্টার তার চেয়ে না হোক বছর কুড়ির তো ছোটোই হবেন। রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন। লাইন দিয়ে ছেলেদের নিয়ে ফিরে এলেন হেডমাস্টার মশাই। ছাত্রদের বললেন, ওঁকে সবাই হাত তুলে নমস্কার করো। এ রাজ্যের একজন মন্ত্রী—আমাদের পুরনো স্টুডেন্ট—

থাক থাক। পকেট থেকে পোস্টকার্ড বের করে অক্ষয় বললো, এ চিঠিখানা তোমাদের লেখা?

তিনটি ছেলে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো। আমরা লিখেছি। বৃষ্টির সময় এখানটায় খেলা যায় না। পা পিছলে পড়ে যাই।

ঠিকই তো লিখেছো। আমরাও বৃষ্টিতে এখানে আছাড় খেয়েছি।

আপনারা খেলতেন?

খুব খেলতাম। এখানে দাঁড়িয়ে টিফিন খেতাম।

আমরাও খাই।

তোমাদের এখানে শেডের ব্যবস্থা হবে। খুশী?

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। হেডমাস্টারমশাই নিজের চেয়ারে বসিয়ে অক্ষয়কে মিষ্টি খাওয়াতে চাইলেন। অন্য মাষ্টারমশাইরা ঘিরে

দাঁড়িয়ে। অক্ষয় বলল, উঁহু। শুধু এক কাপ চা খাবো—আপনাদের সবার সঙ্গে বসে। আমার চায়ে চিনি দিতে বারণ করবেন।

রাইটার্সে ফিরতে ফিরতে বেলা বারোটা হয়ে গেল। ঘরে ঢুকেই অক্ষয় দেখলো, বাইরে অপেক্ষা করা লোকজনের স্লিপ তার টেবিলে ডাঁই হয়ে উঠেছে।

তারকবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, একবার হর্ষবাবুকে ফোন করবেন। উনি বলছিলেন—সকাল থেকে চেষ্টা করেও আপনাকে ধরতে পারছেন না।

ঠিক আছে। আপনি আগে কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়ার ভদ্রলোককে পাঠান।

দেখেই চিনতে পারলো অক্ষয়। সকালবেলা হাঁটার সময় এই লোকটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা এতদিনকার ফার্ম—ডাকলেই এসে দেখা করতাম স্যার।

দেখা করার দরকার পড়বে কেন বলুন? এত বড় শরৎসেতু—তার এগারো নম্বর গার্ডার কেন ডেবে যাবে?

আমরা তো অনেক দিন ব্রিজ বানাচ্ছি স্যার।

অন্যগুলোতেও খুঁত বেরিয়েছে কিনা দেখতে হবে।

আমাদের গুডউইল আজকের নয় স্যার। আমাদের তিন পুরুষের ফার্ম। জুবিলি ব্রিজেও আমরা ছিলাম।

আপনি ছিলেন না। ছিলেন হয়তো আপনার ঠাকুর্দা।

ঠিক বলেছেন স্যার। তখন আমার জন্ম হয়নি। আজকের খবরটায় আমাদের প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি।

সিমেন্টে ভেজাল মেশাবার কারখানা বানালে তো অমন হবেই—

কিছু করা যায় না স্যার? আমরা সব সময়েই আপনাদের সঙ্গে আছি। থাকবোও—

অক্ষয় আর পারছিল না। এই বাজারে তার একবেলার নিরামিষ খাইখরচ দু' তিন টাকার বেশি নয়। সে পরিষ্কার বললো, সেটাই তো বিপদের কথা—আপনি নিশ্চয় একজন কৃতী ইঞ্জিনিয়ার—

ভালো রেজাল্ট করেই শিরপুর থেকে বেরিয়েছিলাম।

তাহলে আপনি নিশ্চয় বুঝবেন—পাবলিকের সামনে অমন ব্রিজ নিয়ে কোন্ মুখে দাঁড়াবো ?

আমাদের কাজে গাফিলতি নেই স্যার।

সে তো সিমেন্ট দেখেই বুঝলাম।

একটা চান্স দিন আমাদের অবস্থা খুলে বলার। আমরা নির্দোষ। এখন জলের নিচে মাটির স্তর যদি গোলমাল করে তো আমরা কি করবো ?

স্তরের গোলমাল ৩০।৪০।৫০বছরে একবার দেখা দেয় কি দেয় না। শরৎ সেতুর তো পাঁচ বছরও হয়নি মশাই। আপনাদের যা বলবার কমিশনের সামনে বলবেন।

বেশ। আমাদের কথা চিফ মিনিস্টারকে জানিয়েছি। বলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

জানিয়েছেন ! তা বেশ তো। একেবারে হাইকোর্ট করে বসে আছেন।

ভদ্রলোক চলে যেতে অক্ষয় তারকবাবুকে ডেকে বললো, ল ডিপার্টমেণ্টে পাঠাবেন। এদিকে আমরা একবার সি এমকে প্রিলিমিনারি রিপোর্টটা দেখিয়ে নেবো। তারপর বিধানসভায় মুভ করবো।

তারকবাবু বললেন, হর্ষবাবু একবার আপনাকে ফোনে কথা বলতে বলেছিলেন।

মনে আছে।

ব্যাংকশাল কোর্টে কালকের রেইডের লোকজনকে প্রোডিউস করবে আজ বিকেলের দিকে।

জানি। সরকারী উকিলের ব্যবস্থা তো থাকবেই। বলে অক্ষয় দত্ত নেক্সট্ ভিজিটারকে ডাকতে বললো।

খানিকক্ষণের জন্যে ঘর ফাঁকা। কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়ার জাল বহুদূর ছড়ানো।

শেষ অব্দি চিফ মিনিস্টার অব্দি গেছে? হর্ষ ঘোষ আজকাল শুধু প্রবীণ জননেতা হয়ে থাকতে রাজি নয়। অক্ষয়ের মন বললো, পার্টি আগলে রাখা না ছাই। ক্ষমতার গন্ধ সবাইকে আমের ডুমো মাছি করে তোলে।

এক ভদ্রমহিলা ঢুকলেন। বসতে বললো অক্ষয়।

আপনার নোটিশ পেয়েছি আমরা।

ওঃ! বলে অক্ষয় চুপ করে গেল। ইনি তাহলে সেই একশো সতের জনের একজন। হাউসিং এস্টেটে ভাড়া বাকি ফেলে রেখেছেন তু' বছর। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, ভাড়া পরিষ্কার করে ফেলুন।

অত টাকা একসঙ্গে দেবো কোত্থেকে?

মাসে মাসে দিয়ে গেলেই পারতেন। জমতো না।

আমার ফেলে রাখার কোন ইচ্ছে ছিল না।

অক্ষয় মহিলাকে ভালো করে দেখলো। চশমার নিচে চোখ তু'টো কাচের চেয়েও ঘোলা। মাথায় চুল কমে এসেছে। তাঁতের সাধারণ শাড়ি। সাদা জমি। সরু পাড়। মহিলা তখন বলছিলেন, আমি তো রিটায়ার করেছি তিন বছর। পেনশন পেতেই প্রায় তু' বছর চলে গেল।

এখন একসঙ্গে দিয়ে দিন। টাকা তো পেয়েছেন।

আমার দেবার উপায় নেই। যদি কিস্তিতে—

না। সে উপায় আমার নেই। তেমন হলে আপনি বাড়ি ছেড়ে দিন। বলেই নিজের মনে মনে অক্ষয় আরো খানিকটা বললো—এ কি মুশকিল! মহিলার বোঝা উচিত—আমার কাজ থাকতে পারে। পেনশন পাননি বলে আগে টাকা দিতে পারেননি। এখন পেয়েছেন— তবুও দিতে পারছেন না। এ কি আব্দার—

মুখ তুলে তাকালেন মহিলা। তাহলে আমায় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে!

অক্ষয় নিজের সামনের কাগজে চোখ নামিয়ে রাখলো। তারকবাবুর উচিত—দেখা করতে এলে লোকজনকে স্ক্রিন করা। এলোপাথাড়ি

সব্বাইকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন ঘরে। এও কি হর্ষ ঘোষের ইঙ্গিতে। কথাটা ভেবেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল অক্ষয়। ছিঃ! ছিঃ! হর্ষকে আমার ওভাবে ভাবাই অন্যায়। আমরা দু'জন কত দিনের কমরেড। এখন জীবনের শেষদিকে এসে এভাবে কি কেউ আলাদা হয়?

মহিলা ঘুরে চলে যাচ্ছিলেন। আচমকা উঠে দাঁড়ালো অক্ষয়। আচ্ছা—আপনি একটু বসুন তো।—বলেই নিজের ভেতর দু' হাতে খুঁজতে শুরু করলো অক্ষয়। ধপাস করে বসে পড়ে অক্ষয় বললো, আপনি—ব্যারাকপুর সাবজেলর ছিলেন—উঃ! কিছুতেই মনে পড়ছে না—

মহিলা বললেন, মাখনবাবু—

হুঁ। তাঁর বড় মেয়ে তো আপনি? স্লিপের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অক্ষয় হেসে ফেললো, তুমিই সেই প্রতিমা। আমায় চিনতে পারোনি?

এবার মহিলা আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ। আপনাকে কে না চেনে।

তাহলে ঘরে ঢুকেই চেনা দাওনি কেন?

যদি আমায় চিনতে না চান—তার ওপর ভাড়া বাকি—।

কথা শেষ হলো না প্রতিমার। দু'জনেই একসঙ্গে হেসে ফেললো। অক্ষয় একসঙ্গে অনেক কিছু জানতে চাইছিল—কিন্তু কোন্‌টা আগে জানবে—তা ঠিক করতে না পেরে ফস করে বলে বসলো, তোমাদের জেলে যখন আমি—তুমি তো—

আমাদের জেল নয়। ব্রিটিশের—আমার বাবা মা—আমার দু' বোন এক ভাই—সবাই বাবার কোয়ার্টারে থাকতাম। আপনারা তখন কুইট ইণ্ডিয়ার রাজবন্দী। আমি সেবারে প্রাইভেটে বি. এ দিয়ে ফেল হই—

তোমার ষাট হয়ে গেল প্রতিমা—

ষাট নয়। একষট্টি। আপনিও তো সত্তর-টত্তর হবেন বোধ হয়।

তা হয়েছি। বিয়েটা করোনি দেখছি। কেন ?

আপনি প্রেমে পড়লেন আমার। আমিও একটু একটু। বাঁকুড়া জেলে বদলি হলেন বাবা। সেখানে ডেথ্—

কিছুই জানতাম না প্রতিমা।

আপনাদের জানবার কথাও নয়। জেলে জেলে ঘুরছেন তখন। তারপর নিরুপায় বড় ফ্যামিলির প্রথম সন্তান যা করে—আমিও তাই করেছি। নতুন কিছু নয়।

অক্ষয় দত্ত ভেবে দেখলো, সে এখন প্রেম কথাটার আলাদা করে কোন মানে বোঝে না। যেমন বইতে লেখা থাকে তেমন আর কি। পেনসনের টাকা পেয়েও একসঙ্গে ভাড়া মেটাতে পারবে না কেন ?

সে আরেক গল্প—আজ থাক।

বাঃ! উঠছো কেন ? মন্ত্রীর কাছে আর্জি নিয়ে এসেছো। সব তো খুলে বলতে হবে।

বিল্টুর কথা মনে নেই নিশ্চয়। আমাদের ভাই। তিনি ব্যবসা করতে নেমে আমায় গ্যারাণ্টর করেছিলেন ব্যাংকের কাছে। কবে গণেশ উল্টে সে সরে গেছে। আমি আজ এগারো বছর মাসে মাসে টাকা শুধে যাচ্ছি। পেনসন গ্রাচুইটির একটা ভাগ তো ওতেই চলে যাচ্ছে।

অক্ষয় মনে মনে বললেন, আহা! মেয়েটা বড় হতভাগিনী। মুখে হাসি এনে বললো, তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও। একটা উপায় ঠিক বেরোবে—

কৃতজ্ঞতায় একষট্টি বছরের আইবুড়ো প্রতিমা একটু নুয়ে পড়লো। চোখ মুখ আগের চেয়ে অনেক প্রসন্ন।

হর্ষ ঘোষের সঙ্গে মনকষাকষি, দু'দিন নাগাড়ে ছোটাছুটি—দেখাসাক্ষাৎ' করেও অক্ষয় সন্ধ্যে নাগাদ একটুও ক্লান্ত বোধ করলো না। ফোনে সি-এম দু'বার কথা বলেছেন। একবার তাঁর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি। মোট তিনবারের সব কথাই আগামী ন্যাশনাল ডেভলপমেণ্ট কাউন্সিলের প্রোগ্রাম নিয়ে। রাজ্যের

ঘরবাড়ি বানানোর ব্যাপারটাকে কি করে প্রায়োরিটিতে নিয়ে গিয়ে যোজনার টাকা পাওয়া যায়—নয়তো এ রাজ্যে থাকবার ঘর নিয়ে দুঃখকষ্ট কোনদিনই মেটার নয়।

সন্ধ্যেবেলা পার্টি অফিসে অক্ষয়কে হর্ষের মুখোমুখি হতে হলো। হর্ষের চোখে তাকিয়ে অক্ষয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। দু'জনে পাশাপাশি কতকাল পার্টি করে আসছে। পার্টির দুর্দিনে একজন অন্যজনকে সাহস দিয়েছে। আর এখন? এখন তো অতটা সমস্যা থাকার কথা নয়। অথচ এখনই!

ঘর কখন ফাঁকা হবে—সেজন্যে দু'জনই অপেক্ষা করছিল। সওয়া ন'টা নাগাদ পার্টি সেক্রেটারিয়েটের দুই প্রধান যখন মুখোমুখি হলো—তখন ঘরে অন্য কেউ নেই।

হর্ষ পরিষ্কার গলায় বললো, এই বয়সে আমাদের আর শোডাউন মানায় না অক্ষয়। আমাদের হাত মিলিয়ে চলা দরকার। প্রধানমন্ত্রীর দল আমাদের ফেলে পাঁয়তাড়া কষছে। আমাদের জোটের বড় শরিক আরও বড় হবে বলে আমাদের গ্রাস করতে পারে। আর ঠিক এইসময় তুমি আর আমি---

আমিও তো তাই ভাবছি হর্ষ। এইসময় আমাদের পার্টির ইমেজ বড় হবে যদি আমি যা করছি তাতে তোমার সায় থাকে।

হর্ষের মাথাটি কাঁচাপাকায় ভুলভুল করছে। সে ঝুঁকে পড়ে বললো—এখন গিমিকের চেয়ে অনেক বেশি দরকার—গ্রাসরুটে—সাধারণ নতুন কর্মীদের ভেতর কাজ করা।

কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়াকে জায়গামত ধরাকে তুমি গিমিক বলছো কেন?

ক'টা অমন ফার্ম তুমি ধরতে পারবে অক্ষয়? বরং ওদের ঘাড়ে বন্দুকটা রেখে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ নাকি? ওরা তো পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে আসছেই। দরকারে আরও দেবে। তুমি মামলা উঠিয়ে নাও। আর এগোবে না।

একটা অমন ফার্মকে যদি খোলাখুলি পানিশ করা যায়—তাহলে কি পাবলিক আমাদের বেশি বিশ্বাস করবে না?

হ্যাখো অক্ষয়—জনগণের নামে সব পার্টিই হুইসিল বাজাচ্ছে। জনগণ তাই কোন পার্টিকেই না বাজিয়ে নেবে না। জনগণ বড়দিকে ফেলে দিয়েছিল। আবার জনগণই কিন্তু বড়দিকে ফিরিয়ে এনেছে।

আমরা জনগণকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে পারিনি—তাই আজ এই অবস্থা।

কথা আর এগোলো না। হর্ষের ভাত এলো হোটেল থেকে। অক্ষয় বললো, এখন উঠি। হর্ষ ঘোষ তাকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মেয়ে জামাই চলে যেতে অক্ষয় ইলাকে পরিষ্কার বললো, কি করি বলো তো? হাতের ভেতর পেয়েও ডিসঅনেস্ট ঠিকেদারকে ছেড়ে দেবো।

সেই সিমেণ্টওয়ালা তো।

শুধু সিমেণ্ট হলে হোত। আস্ত একটা ব্রিজ। যার ওপর দিয়ে আরও একশো বছর পর নদী পার হবে—সেই ব্রিজেও গণ্ডগোল করেছে।

প্রমাণ থাকলে ছাড়বে কেন? মন্ত্রী হয়ে তুমি একদিন হাতেনাতে ধরেও দোষীকে ছেড়ে দেবে বলেই কি আমি তোমার ইলেকশন মিটিংয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি? মুচিপাড়ায় সেই মেয়েদের আশার কথা এজন্যে শুনিয়েছিলাম। ওরাও তো তোমার ইলেকশন ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছিল। তার বদলে ওই মেয়েরা তো কিছু চায়নি।

ইলার একথায় একদম গুম হয়ে গেল অক্ষয়। সত্যিই তো! মুচি-পাড়ায় ভোটের আগে ইলাকে নিয়ে অক্ষয়কে কয়েক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। বিশেষ করে ইলা একটা জায়গায় একাই যায় সেবারে। তিনশো বাইশজন বেশ্যা হলেও তাদের ভোটগুলো তো ফেলনা নয়। তাদের বিশেষ বোঝাতে হয়নি ইলার। কপালে গোল করে সিঁদুরের টিপ দিয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়াতেই—সব ঘরের মেয়ে চলে এলো একটা বড় রোয়াকে। এমনকি কয়েকজন মাসীও এসেছিল। গুণ্ডারা

শাসিয়েছিল—তারা এ মিটিং হতে দেবে না। কিন্তু ইলার দাঁড়ানো—তাঁকে ঘিরে পাড়ার মেয়েদের উৎসাহ—সবকিছু দেখে গুণ্ডারা আর এগোয়নি। ফেরার সময় দুটাকা পাঁচটাকা, আটটাকা—যে যা পারে দিয়েছিল। সত্যিই তো তার বদলে ওরা কিছু চায়নি। শুধু বলেছিল—বৌদিদি—দেশটা আরেকটু ভালো করে দিন। ওদেরই দেওয়া একটি কাঁচা টাকা ইলা লক্ষ্মীর আসনে রেখে দিয়েছে—অক্ষয় জানে।

রাতে ঘুমের ভেতর অক্ষয় ছোট হয়ে গিয়ে ছুতোর পাড়ার ভাড়া করা বাবার সেই বাসাবাড়িতে চলে গেল। ওড়িয়া বাড়িয়ালা অক্ষয়দের খুব ভালবাসতো। দোল পূর্ণিমার রাতে বাড়িব চাতালে তিনি ওড়িশী যাত্রা দিলেন। মা বাবার সঙ্গে অক্ষয় আর তার তিন ভাই দুই বোন শুনতে বসেছে। লাইন টেনে এনে বড় আলো ফেলা হয়েছে। কৃষ্ণ আর রাধিকা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে খচমচ খচমচ শব্দ করে নাচছে। কথাগুলো সব বোঝা যাচ্ছে না। তাম্রশাসন থেকে কলকাতায় উঠে আসার পর এটাই তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রাইভেট টিউটর মুরারীবাবুও কোন্ সময়ে এসে শুনতে বসে গেছেন। একসময় তিনিই অক্ষয়কে বললেন, যাও বাবা—ঘুমে ঢুলে পড়ছো। শুয়ে পড়োগে।' কাল তো ছুটি। তোমাদের বড় দু'ভাইকে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ দেখাতে যাবো। যাও অক্ষয়—শুয়ে পড়ো।

শুতে গিয়ে অক্ষয় অবাক হলো। সে তো ফেবারিট কেবিনে ঢুকে পড়েছে। ওই তো কমলেশদা বসে। চুপচাপ পাইপের পোড়া তামাক খুঁচিয়ে বের করছেন। এবার জল দিয়ে ধুয়ে পাইপ ধরাবেন। তামাকের গন্ধটা বড় ভাল লাগে অক্ষয়ের। একদিন কমলেশ ব্যানার্জি বলেছিলেন—তুমি তো এখন ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট। খেলাধুলো যেমন করছো করো—পাশাপাশি দরকারী বইগুলোও পড়তে হবে।

অক্ষয়কে কমলেশদা বলে উঠলো, এই যে অক্ষয়। এসো। বোসো।

আপনি কি তামাক খাচ্ছেন।

হাভানা স্পেশাল। আট্যিদের দোকান থেকে কেনা। খাবে?

না না। আমি বিড়ি সিগারেট খাইনে।

মনে হয় অক্ষয়—একদিন হয়তো সোজা পাইপ ধরবে তুমি। পাইপ কামড়াতে কামড়াতে চিন্তাগুলো বেশ সহজে সাজিয়ে নেওয়া যায় মনে মনে। যাগ্‌গিয়ে—একটা বই এনেছি তোমার জন্যে। আমার ঝোলা ব্যাগটা টেনে তোমার পাশে রাখো। দু'জনে বেরোবার সময় ব্যাগটা তোমার কাঁধে নেবে। যেন তুমিই ব্যাগ নিয়ে ঢুকেছ দোকানে। বলতে বলতে কমলেশদা দোকানদারকে চেঁচিয়ে বললো, আমাদের দু'টো চা আর দু'খানা করে মাখন মাখানো টোস্ট দেবেন।

নিচু গলায় অক্ষয় বললো, কী বই আছে, ব্যাগে?

বাড়ি গিয়ে দেখো।

আপনি তো কমলেশদা অস্ট্রিয়া যাচ্ছেন শুনলাম।

হুঁ। ইউরোপের চেহারাও পালটে যাচ্ছে। জার্মানীতে নাৎসী গুণ্ডাদের পাণ্ডা হয়েছে হিটলার। কদ্দিন অস্ট্রিয়ায় থাকতে পারবো জানি না। সেখান থেকে যাবো স্পেনে।

মাস্টারদার ফাঁসির দিন তো এগিয়ে এলো।

আমাদের খবরও তাই অক্ষয়। কবে যে এতবড় দেশটা স্বাধীন হবে—কে জানে!

নিরাশ হবার কিছু নেই কমলেশদা। সব দেশের বিপ্লবের ইতিহাসই এমন ছড়ানো—অগোছালো।

বিপ্লব পরে। আগে টোস্টটা খেয়ে নাও। আমি উঠে দাঁড়ালে একসঙ্গে বেরোবে। আমি যাবো শ্রদ্ধানন্দ পার্কে—

কোন মিটিং আছে সেখানে?

না। আজ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে চার অধ্যায় পোড়ানো হবে।

আম যাবো।

না অক্ষয়। ব্যাগকাঁধে সোজা তুমি বাড়ি যাবে।

কথা মতো কাজ হলো। রিপন কলেজের ফোর্থ ইয়ার বি. এ

ক্লাসের স্টুডেণ্ট অক্ষয় দত্ত বাড়ি চলে এলো। তারপর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে ব্যাগটা খুললো। উঃ? সেই বই। বইখানা দুহাতে ধরে তাকিয়ে থাকলো খানিকক্ষণ। পথের দাবি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকার ঘরে তার পড়ার টেবিলে তাকালো অক্ষয়। ছোট বই। বিবেকবাণী। তার পাশেই নজরুল। আস্তে জানালাটা খুলে পড়ার টেবিলে পড়তে বসলো অক্ষয়। পথের দাবি।

॥ ৫ ॥

সকালের কাগজ খুলে ইলার কেমন যেন লাগলো। একটি বাংলা কাগজে হেডিং দিয়েছে—

নতুন যুগের খলিফা

তার নিচেই লেখা—কিভাবে অক্ষয় গতকাল হেয়ার স্কুলে গিয়েছিল। ছাত্রদের কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে—এইসব কথা আর কি। কাগজখানা আর চা বিছানায় অক্ষয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইলা বললো, পড়ে গ্যাখো তো। সুরটা আমার কেমন যেন লাগছে।

অক্ষয় ঘুমচোখে পড়ে নিয়ে বললো, ঠিকই বলেছো। কোথায় যেন একটা ঠাট্টা আছে। অথচ গতকালই ওরা সিমেণ্ট গোডাউনে রেইড্ করার ঘটনাটা ভালোভাবেই লিখেছিল।

কোথায় যেন সুর কাটা মনে হচ্ছে।

টেলিফোনটা দাও তো ইলা।

ইলা দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই ফোন বেজে উঠলো। ইলা রিসিভার তুলে অক্ষয়ের হাতে দিলো।

খানিক বাদে অক্ষয় ফোনে বলতে লাগলো, মনে আছে লক্ষ্মী-নারায়ণ—ওখানটায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর আমরা টিফিন খেতাম।

ফোন নামালে ইলা বললো, লক্ষ্মী বাংলা বলতে পারে?

ইংরেজী কাগজেও বেরিয়েছে। তাই পড়ে ফোন করেছে।

হেডমাস্টারটি নিজেই বোধহয় ফোন করে জানিয়েছে। বলতো ইলা
—কী গেরো!

ভালো করারও উপায় নেই। তার ভেতরেও অতি বুদ্ধিমান কাগজ কীসব মানে খুঁজে পায়।

না ইলা—আমার মনে হয় কেউ উসকেছে।

চান করে উঠে কাগজের দুইয়ের পাতায় ছোট্ট একটা খবর দেখে অক্ষয়ের ঠাণ্ডা মাথার ভেতর রক্ত ফুটতে লাগলো। পুলিশ কাসটোডি থেকে সিমেণ্টের ভেজালদারদের আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু সরকারী উকিল দাঁড়ায়নি। জজ জামিন দিয়ে বসে আছেন।

কি আশ্চর্য! এমন তো হবার কথা নয়। লালবাজারে ফোন করে অ্যাণ্টি-করাপশনের ডি সি-র বাড়ি লাইন চাইলো অক্ষয়।

আমি কি করবো স্যার। আপনি হোম সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করুন। আমরা চুনোপুঁটি।

আপনি আমায় জানালেন না কেন?

আরেকটু উঁচুতে ফোন করলেই সব জানতে পারবেন।

ফোন নামিয়ে অক্ষয় ভাবলো, হোম সেক্রেটারিকে ফোন করবে। কিন্তু হোম সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টারের পোর্টফোলিও হোম পলি-টিক্যালের ভেতর পড়েন। তাঁকে প্রশ্ন করলেই তিনি অক্ষয়কে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তাছাড়া এভাবে জবাবদিহি চাওয়াও খারাপ দেখায় অক্ষয়ের পক্ষে। অ্যাডভোকেট জেনারেলকে সে সরা-সরি ফোন করতে পারে না। তিনি এ-দেশের একজন পুরানো আইনজ্ঞ। অনুরোধে পড়ে একজোট সরকারের অ্যাডভোকেট জেনা-রেল হয়েছেন। বড় শরিকদের পুরনো বন্ধু ভদ্রলোক।

কী মনে হলো অক্ষয়ের। ফোনে হর্ষ ঘোষকে পার্টি অফিসে ধরলো। কাগজ দেখেছো?

কে? অক্ষয়? হুঁ।

চুপ করে আছো কেন?

আমার কিছু বলার নেই অক্ষয়—

আমার বলার আছে। বলেই দড়াম করে রিসিভারটা রেখে দিল অক্ষয়। সামনেই আয়না। তাতে দেখলো—সত্তর বছর তিন মাস বয়সের অক্ষয় দত্তর শরীরটা বেশ ভেঙে গেছে। অক্ষয় আরও দেখলো—যৌবনের—মানে এর বছর দশ বারো আগেকার লাবণ্যও ওর মুখে নেই। স্রেফ একজন মন্ত্রী খালি গায়ে তার বিছানায় বসে আছে। অক্ষয়ের মনের ভেতর একটা কথাই পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল তখন—তাহলে এই চল্লিশ বছর কি করলাম? শুধু শুধুই চল্লিশটা বছর খরচ করলাম? এখন এই বয়সে আবার কি গোড়া থেকে শুরু করা যায়! কেঁচে গণ্ডূষ!!

আমি বেরোচ্ছি ইলা।

ভেতর থেকে ইলা বেরিয়ে এলো। খেয়ে বেরোবে না?

খিদে নেই। দুপুরে হাল্কা কিছু খেয়ে নেবো—বাইরে এসে অক্ষয় গাড়িতে বসলো, কিন্তু কোনদিকে যাবে, তা তখন তখনই ড্রাইভারকে বলতে পারল না। হঠাৎ বলে—শিবপুর হাউসিং এস্টেটে চলুন।

কলকাতার রাস্তায় তখনো অফিসযাত্রীরা বোরায়নি। একটু পরেই ভিড় হয়ে যাবে। অক্ষয়ের কথা বলার দরকার তো অনেকের সঙ্গে। হর্ষ, প্রবোধ, হৃষীকেশ তো আছেই। আছে হোম সেক্রেটারি, অ্যাডভোকেট জেনারেল। সবার আগে দরকার সি এম-এর সঙ্গে কথা বলা। সি এম-কে একা পাওয়া দরকার। আর দরকার এক-জোট সরকারের মাথার উপরকার বাকি সব প্রবীণ জননেতার সঙ্গে কথা বলা। অ্যান্টি-করাপশনের একজন ডি. সি. কি করতে পারে। তার তো করার কিছু নেই। সেই রিপোর্টার নিশ্চয় দুপুরের দিকে একবার আসবে। তার সঙ্গেও কথা বলতে হবে অক্ষয়ের। এক দিনের তফাতে খবরের ভেতর এতটা তেতো এসে গেল কি করে? একটা অন্ধকার অপমান চাপ ব্যথা ধরিয়ে দিচ্ছে তার মাথার ভেতর। এ জন্যেই কি জীবনের চল্লিশটা বছর খরচ করে দিলাম?

দানেশ শেখ লেনে গাড়িটা রেখে অক্ষয় পায়ে হেঁটে সরকারী

এস্টেটের কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। নম্বরটা মনে ছিল। দোতলায় উঠে কড়া নাড়লো অক্ষয়।

একি? আপনি? আসুন আসুন। বৌদিকে এনেছেন?

না প্রতিমা। অফিস বেরোবার পথে চলে এলাম। সেই চল্লিশ বছর আগে দেখেছিলাম—আর এই—

চিনে আসতে পারলেন?

কেন পারবো না। তোমাদের জেলে থাকতে কত যত্ন করেছো।

জেলটা ব্রিটিশের ছিল। বসুন তো। কি খাবেন? অবিশ্যি বিশেষ কিছু খাওয়াতে পারবো না। রিটায়ারের পর বোটানিকসে গিয়ে গাছতলায় বসি। বই পড়ি। একঘেয়ে লাগলে নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই। নয়তো গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটি।

আমারও ইচ্ছে করে প্রতিমা।

না। আপনার দ্বারা হবে না। যেখানেই যাবেন—ভিড় হয়ে যাবে। লোক এসে কিছু না কিছু চাইবে।

আমারও তো রিটায়ারের বয়স হয়ে গেছে অনেক দিন।

পলিটিকসে তো রিটায়ারমেণ্ট নেই কোন!

সবই কেমন পণ্ডশ্রম মনে হয় প্রতিমা।

একথা বলছেন কেন? আপনারা পাওয়ারে আসায় অনেক কিছু আশা করছে।

আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না প্রতিমা।

ও কথা বলবেন না। সাধারণের মাথা গুঁজবার জায়গা করতে কতরকম প্ল্যান নিয়েছেন—কাগজে তো বিজ্ঞাপন দেখি।

প্রতিমা, তুমি কেমন আছো?

চলে যাচ্ছে একরকম করে।

চলো তোমায় বোটানিকসে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাবো।

কোন দরকার নেই। আমি হেঁটে যেতে পারবো। এইটুকু তো পথ।

ট্র্যাফিক জটের ভেতর রাইটার্সে পৌঁছতে অক্ষয়ের এগারোটা হয়ে গেল। রোজ সে ভি আই পি লিফ্‌ট দিয়ে ওঠে। আজ কি

কি হলো—সবার সঙ্গে সাধারণের লিফটে গিয়ে উঠলো। নিজের ঘরে না গিয়ে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হলো। ভেতরে না ঢুকে দরজায় দাঁড়ালো।

অন্তত দেড়শো চেয়ার ঠাসাঠাসি করে টেবিলের সঙ্গে লাগানো। তার ভেতর বেশির ভাগই খালি। জনা কুড়ি বাইশ বসে গল্প করছে। এদের ভেতর—অক্ষয় গুণে দেখলো---ন'জন মেয়ে। দু'জনের চেয়ারে বসে আরাম হয়নি বলে তারা টেবিলে বসেছে। তাদের একজনকে গরম শাল দেখাচ্ছে একজন ফেরিওয়ালা মত লোক। করিডরে চা, সিগারেট, জলখাবারওয়ালাদের কলতান। নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে অক্ষয়ের মনে পড়লো---মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে অর্থমন্ত্রী যা আভাস দিয়েছেন---তাতে এ বছরটা শেষ হওয়ার আগেই পে কমিশন বসাতে হবে।

তারকবাবু বললেন, ল্যাণ্ড রিফর্মস্ মিনিস্টার সরলবাবু ফোন করেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন---

কে আছে ঘরে ?

একাই আছেন বললেন।

এই সরলকে অক্ষয় চেনে তা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর। এমনিতে চুপচাপ। একটু গুমমারা স্বভাবের। ক্রাইসিসে ভদ্রলোকের বুদ্ধি খোলে ভালো। ক্যাবিনেট দু'নম্বর হয়েও এই সরলই পার্টির তাগদে আসলে এক নম্বর। কিন্তু অক্ষয়ের ব্যাপারটা এতই ডেলিকেট---সরাসরি প্রশ্ন করা যায় না। কিংবা হোম সেক্রেটারিই কি অ্যান্টি-করাপশনের ডি সি-কে ঢিলেঢালা হতে বলেছিলেন ? আমাদের মাথার ওপরকার প্রবীণ জননেতারা কি নাক গলিয়েছেন ? কনট্রাকশন ইণ্ডিয়া আপনাদের কত দিনকার পরিচিত ? যে বাঘের পিঠে আমি—আমরাও তো সে বাঘেরই পিঠে !

ব্যাপারটা যদি এমন হোত---হর্ষ ঘোষ নয়---তার চেয়েও বড় কোন প্রবীণ জননেতার চাপে বড় দল সরকারকে দিয়ে সিমেণ্ট মামলায় আসামীদের জামিন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকতো—তাহলে

অক্ষয় এতোটা ক্ষয় হোত না ভেতরে ভেতরে। সে সরলের ঘরে যেতে যেতে নিজের মনের ভেতরে স্লোগান দিচ্ছিল—ডগলাস! ও ডগলাস !!

যদি হর্ষ না হয়ে ব্যাপারটা ওরকম হোত—তাহলে প্রবোধ হালদার আর হৃষীকেশকে নিয়ে অক্ষয় একসঙ্গে কিছু একটা করবার চেষ্টা করে দেখতো। অবশ্যি—প্রবোধ আর হৃষীকেশ যেভাবে চেয়ারের সঙ্গে আঠা দিয়ে নিজেদের জুড়ে বসে আছে তাতে কি তারা অক্ষয়ের সঙ্গে একজোট হতে চাইতো? হৃষি তো পরিষ্কার বলে, না অক্ষয়বাবু—ছোটোখাটো ব্যাপারে ওদের খোঁচাবেন না শুধু শুধু। এখন ক্ষমতায় থেকে আমাদের কনসলিডেশনের সময়। কার কনসলিডেশন! —ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অক্ষয়। ডগলাস! ও ডগলাস!

সরলবাবু একা ছিলেন। আপনার জন্যেই বসে আছি একা। মাত্র দু'দিনে চাদ্দিক লণ্ডভণ্ড করে বসে আছেন।

অক্ষয় গোড়ায় কিছু বলতে পারলো না। একসঙ্গে দুজন প্রায় তিরিশ বছর বিধানসভায় অপোজিশনে বসেছেন। এক-এক ব্যাপারে একমত হয়ে একসঙ্গে ওয়াকআউট করেছেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের গাড়িতে উঠেছেন। এরকম লাজুক মুখ করে কৈফিয়ৎ দেবার অবস্থায় একদিন পৌঁছতে হতে পারে তা একদম মনেই হয়নি অক্ষয়ের।

পুরো রাইটার্স বিল্ডিংটাই মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে অক্ষয়ের কাছে।

আপনাকে তো বলা হয়েছিল গো স্লো। শেষে কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে—আপনি কোথায় কি করে বসে আছেন।

অক্ষয়কে তখন ডগলাস বললো, ওঁকে তোমার বন্ধু বলে মনে করতে পারি? অক্ষয় মনে মনেই বললো, নিশ্চয় আমরা বহু দিনের বন্ধু। ডগলাস বললো, তাহলে মন খুলে কথা বলো।

অক্ষয় তখন সরলবাবুকে বললেন, আপনার নিশ্চয় মনে আছে গতবছরও আমরা জানতাম না—মিনিস্ট্রি করতে পারবো—কিন্তু তখনও

আপনি আমি আলোচনা করেছি—কি করে লাল ফিতে টপকে দ্রুত কাজ করবো।

সবই বুঝলাম অক্ষয়বাবু। মিনিস্ট্রিতে এসে কিন্তু আমাদের অন্যরকমভাবে চলতে হবে। এ সরকার এখন শিশু। একে টিকিয়ে না রাখলে আমরা আবার তলিয়ে যাবো। বরং এখন কোন ব্যাপারে অ্যাডজাস্ট করেও সরকারের হাত শক্ত করতে হবে।

ভেজালদার সিমেন্টওয়ালা জামিন পেয়ে যাচ্ছে—এতে কি সরকারের হাত শক্ত হচ্ছে— !

ওসব ছোটখাটো ব্যাপারে চোখ বুজে থাকলেই পারেন।

সরলবাবুর কথাগুলো গরম সিসের গুলি হয়ে অক্ষয়ের কানে ঢুকলো। নানা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সমঝোতা হতে হতে আজকের এই একজোট সরকার। অনেক বিশ্বাসের পরীক্ষায় পাস হবার পর আজ উনিশ শো বিরানব্বই-তে এই জোট। অন্তত বিশ বছরের হাত মিলিয়ে চলার শেষে এসে এই সরকার। এর কোথাও কোন অবিশ্বাসের ধুলো টুলো লুকিয়ে ছিলো না। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সহজ কথাগুলো কঠিন হয়ে উঠছে। কে যে কোনদিকে—কে যে কার ?—তা বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়ছে। অন্তত অক্ষয় তো এখন সরাসরি প্রশ্ন করতে পারছে না। তার প্রশ্ন একটাই—তা হলো—সরকারী উকিল কেন হাজির হননি ? এই অ্যাবসেন্স কি আগে থেকে ঠিক করা ছিল ? নইলে ওদের তো জামিন পাবার কথা নয়।

সরল বললেন, আমাদের প্রতিটি স্টেপ হবে সতর্ক। বুঝলেন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বরং গো স্লো। সময় হলেই একটা একটা করে কাঁটা তোলা যাবে—

সে সময় কি পরে আর পাওয়া যাবে ?

কেন ? পাবো না কেন ? পরে আটঘাঁট বেঁধে নামলেই হবে। এখন তো শিশু সরকার। একে আড়াল দিয়ে আগলে রেখে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

এদেশে শিশু মৃত্যুর হার বড্ড বেশি। আগাম কিছু অ্যান্টি-বায়োটিক ঠুসে না দিলে বাঁচানোই দায়—

সরল একটু অবাক হয়ে হাসলেন। কিন্তু ক্রাইসিস এলেই সরকারের হয়ে ওঁকে দিয়ে কথা বলানো হয়। জনগণ ওঁর কথা শুনতে ভালোবাসে। সরল নিজেও তা জানেন। তাই বাঙালীর পছন্দের চুড়িহাতা পাঞ্জাবি, ধুতি, পাম্পসু তিনি পরেন। জনতার ডারলিং।

অক্ষয় জানে—খুব সাধারণ কথাও সরল শেষ দিকে চাপ দিয়ে বলেন—তাতেই জনগণ খুশী হয়—আশ্বস্ত হয়—হাততালি দেয়।

ইলা একদিন রেডিওতে সরলের বক্তৃতা শুনতে শুনতে অক্ষয়কে বলেছিল, শেষের কথাগুলো অমন গোল্লা গোল্লা করে ছাড়ছেন কেন বল তো?

ওইটেই পাবলিক ওরেটারির খেলা ইলা! ওভাবে কথা বললে সরলের একটা বেশ দৃপ্তভাব ফুটে ওঠে। যেমন ছাখো—হয়েছে তো তাতে কি? আমরাও করবো। আমরাও করতে পারি। অনেকটা ঠিক এভাবে কথা বলে যাওয়া—

অক্ষয়ের এই গলা শুনে ইলা হোহো করে হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—ওকি! তুমি মুকুট নাটকের রিহার্সেল দিচ্ছো?

অক্ষয় চলে এলো নিজের ঘরে। হর্সসু টেবিলটার সামনে বসে মনে হলো—সরলবাবু কত পাল্টে গেল এই ক'মাসে। ছিলেন ছিমছাম—এখন বেশ প্রলেপ পড়েছে। তবু ওই মানুষটিই এই ভাঙা বঙ্গে বাঙালীর শেষ আশা।

সি এম কলকাতার বাইরে।

সেই রিপোর্টার ঘরে ঢুকলো। অক্ষয় চোখ তুলে তাকালো। বলুন। কি ব্যাপার বলুন তো—

রিপোর্টার ভদ্রলোকও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। বললেন, আমিও

তো বুঝতে পারছি না অক্ষয়বাবু। সেদিনের রিপোর্ট বেরোবার পরই অফিসে শুনলাম—ছবি দেওয়া ঠিক হয়নি।

কে বললেন ?

বিশেষভাবে কেউ নয়। কিন্তু সবাই যেন একই কথা বলতে চান।

তারপর দিনই খবরে আমায় বাঁকাভাবে মন্তব্য করা হলো।

আমারও অবাক লাগছে অক্ষয়বাবু। তবে আমি তো চুনোপুটি। আপনাদের জোটের সঙ্গে তো কর্তাদের দেখা-সাক্ষাৎ আছে। আপনি খোঁজ নিন না।

না। আমি কেন খোঁজখবর নিতে যাবো ? আমার কাজ আমি করলেই হলো।

কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়া হুমকি দিয়েছে—বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবে। আর যদি এক লাইন লেখা হয় তো কোর্টে যাবে। ড্যামেজ স্যুট আনবে।

চিঠি দিয়ে বলেছে ?

উঁহু। এরা লিখিত প্রমাণ রাখে না। ফোনেই কাজ সেরে রাখে। দেখুন না—আপনাদের সরকারের কেউ বিজ্ঞাপনের বিল পেমেন্ট ঝুলিয়ে রাখা হবে বলে শাসাননি তো। অনেকে পছন্দ নাও করতে পারেন।

অক্ষয় মনে মনে ভাবছিলেন---গণতন্ত্রের আজব তিনখানা হাত। জনগণ, বিধানসভা, খবরের কাগজ। এর সঙ্গে আছে বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন ভাবতে ভাবতে অক্ষয় বললো, আচ্ছা শান্তবাবু—এখন যদি রিজাইন দিয়ে ফের ভোটে দাঁড়াই ?

আপনি বলছেন—জোট সরকার রিজাইন দেবে ? এখন ? কেন ?

উঁহু। সরকার নয়। ধরুন আমরা—

মানে আপনাদের পার্টির তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। কেন ?

অন্য দু'জন করবেন কিনা—বলতে পারি না। ধরুন আমিই যদি পদত্যাগ করি।

বিধানসভা থেকেও ?

হ্যাঁ। তারপর বাই-ইলেকশনে দাঁড়াবো।

আপনি বিভেদপন্থী বলে চিহ্নিত হবেন। বিশ্বাসঘাতক নামও কিনতে পারেন।

কেন? আমি ইস্যুর ওপর রিজাইন দিয়ে ফের ভোটে দাঁড়াবো।

তাহলে তো আপনাকে পার্টি থেকেও সরে আসতে হবে। কিন্তু এমন কি ব্যাপার ঘটলো?

না। তেমন কিছু ঘটেনি।

আপনি একা রিজাইন দিলে এক দিনের জন্যে নিউজ হবেন ঠিকই কিন্তু তারপর বিবৃতি আর পাল্টা বিবৃতির জঙ্গলে খবরের কাগজের পাতায় আপনি হারিয়ে যাবেন অক্ষয়বাবু। যারা এখন কলকাঠি নাড়ছে—তাদের হাতের কাজের খেলায় হয়তো আপনি কাগজে ব্ল্যাক আউটও হয়ে যেতে পারেন। একা কি করবেন বলুন? আপনার একার গলা চাপা পড়ে যাবে অক্ষয়বাবু।

আমি ভোটারদের সামনে গিয়ে হাজির হবো।

কত জনসভা করবেন! দেখবেন সভায় গণ্ডগোল হচ্ছে বলে লোক আসছে না। কিংবা কাগজে কাগজে উল্টোপাল্টা গসিপ, কেচ্ছা বেরিয়ে আপনার ভোটারদের মন বিষিয়ে গেছে। তখন কি করবেন? আর একলা চলোরে রাজনীতি করা সম্ভব নয় অক্ষয়বাবু। এসব মনে হচ্ছে কেন আপনার?

দেখবেন লিখে বসবেন না এসব এখন।

আমি লিখলেই যে ছাপা হবে তার কোন ঠিক নেই। এ কি বিধানবাবু—না নেহরুর আমল।

তা অবিশ্যি। বলেই চুপ করে গেল অক্ষয় দত্ত। সেই অপোজিশনের আমল থেকে বহুদিনের সম্পর্ক শান্তবাবুর সঙ্গে। অনেকদিন অনেক সময় অনেক কথা হয়েছে শান্তর সঙ্গে।

কোন খবর আছে নাকি?

খবর হলে জানতে পারবেন।

দেখবেন। তড়িঘড়ি যেন রিজাইন দিয়ে না বসেন।

ভোর রাতে ঘুম ভাঙলো অক্ষয়ের। ইলা শুয়ে আছে। অক্ষয় জাগালো না। আজ থেকে সে আবার নিয়ম করে হাঁটাহাঁটি করবে। মর্নিংওয়াক ছেড়ে দিয়ে শরীরটা যেন ঢ্যাবঢেবে হয়েছে। গরম মোজা দিয়ে কেড্‌স পরলো। মাথায় মাংকি টুপি। ট্রাউজারের ওপর কোট।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হলো—বড় আগে বেরিয়ে পড়েছেন। শেষে ঠাণ্ডা না লেগে যায়। আজ আবার বিধানসভাও রয়েছে। তার দফতরের ব্যয়বরাদ্দের বাজেট বক্তৃতা দাঁড়িয়ে পড়ে যেতে হবে। হাতঘড়িটা নিয়ে বেরোনো হয়নি। সময় বোঝা যাচ্ছে না। বড় পিচরাস্তার দুধারে আলো জ্বলছে। বাড়িগুলো অন্ধকার।

অক্ষয় হাঁটতে শুরু করলো। শীত কুয়াশা হয়ে জমে আছে। হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে দিল অক্ষয়। এ কি আমি ফিরে জীবন শুরু করলাম? তাই তো মনে হলো অক্ষয়ের। বেশ ভালো হাঁটতে পারছি। এরকম হাঁটতে পারলে আমি এখনো অনেকদিন বাঁচবো। আবার নতুন করে ঝুঁকি নেবার সাহস ফিরে পাবো নিশ্চয়।

হাঁটতে হাঁটতে অক্ষয় দেখলো—সে মুচিপাড়া থানার কাছাকাছি চলে এসেছে। এই থানার ও-সি একবার তার ইলেকশন মিটিংয়ে ফোর্স পাঠিয়েছিল। পাছে গোলমাল হয়। এটা আমার কন্সটিটুয়েন্সি। আমার ভোটাররা বাড়ি বাড়ি ঘুমোচ্ছে। অক্ষয়ের একবার ইচ্ছে হলো—চেঁচিয়ে বলে—এই যে দেখে যান—আমি আপনাদের প্রতিনিধি।

অনেকদিন পরে সেই গলির মুখে এসে দাঁড়ালো অক্ষয়। এখানে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ইলা ভেতরে গিয়েছিল। এখানেই তিনশো বাইশটি ভোটার থাকে।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। বেশির ভাগ জানালা বন্ধ। কে একজন ফুটপাথে বসে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করছিল। অক্ষয় ফুটপাথ বদলে একদম জোড়া পাহারার মুখে পড়লো। ওদের গলা থেকে

হাসি বেরিয়ে এলো। বাঙালী পুলিশ। দুই পুলিশের একজন হেসে বললো, এই মহাদেব! চললি কোথায়?

অক্ষয় এড়িয়ে সরে গিয়ে হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে দিল। রাত তাহলে এখন ক'টা? রাস্তায় তো কোনো ট্রামবাস বেরোলো না। এতক্ষণ তো হেঁটেই চলেছি শুধু। রাস্তার ওপর একখানা ঘর থেকে ফাটা রেকর্ডে ভাঙা বাজনার সঙ্গে চেরা গলায় গান।

পাড়াটা পেরিয়ে গিয়ে অক্ষয় ওপাশের ট্রামলাইনে পড়লো। এতক্ষণে ফার্স্ট ট্রাম দুলতে দুলতে আসছে।

দুপুরবেলা বিধানসভায় স্পীকারের ঘরে গিয়ে ঢুকলো অক্ষয়। স্পিকারকে বললো, একটু যে বদলাতে হবে।

কিন্তু খানিক বাদেই তো সেসন বসবে। এখন বদলাবেন? আপনারই তো আজ ব্যয়বরাদ্দের বাজেট নিয়ে স্পিচ—

খুব জরুরী একটা কমিশন বসাবো। তদন্ত কমিশন। শরৎ সেতুর ঠিকেদার—

লিডার অব দি হাউস জানেন?

তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।

তবু একবার কথা বলে নিন। দু'টো ঘর পরেই তো বসে আছেন। চিফ হুইপকেও পাবেন ওখানে।

ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিল অক্ষয়—ততটা সহজ নয়। সরলবাবু বললেন, মন্ত্রিসভায় একবার অন্তত আলোচনা না করে আজকেই অ্যানাউন্স করেন কি করে? আপনার কলিগদের তো আপনি বলবেন একবার। হর্ষবাবু জানেন? আপনার পার্টির মিনিস্টারদের সায় আছে?

করাপশনকে এমনি ল'কোর্টে নিয়ে গেলে অনেক সময় যাবে। তার চেয়ে কোন এক্সপার্টকে নিয়ে ওয়ানম্যান কমিশন—

সে তো জানি অক্ষয়বাবু। কিন্তু এটা ডিমোক্র্যাসি। তাছাড়া ল' ডিপার্টমেণ্ট কি বলছে?

এই তো ফাইল। প্রাইমা-ফেসি কেস এসট্যাবলিস্‌ড।

সেই এগারো নম্বর গার্ডার বসে যাওয়ার কেসটা তো—

হুঁ। আপনি তো সবই জানেন। যাদের সিমেণ্টের গোডাউনে রেড্ হলো—কিন্তু সরকারী উকিল হাজির না হওয়ায় সবাই জামিন পেয়ে গেল।

সরলবাবু শুধু বললেন, হুঁ। তারপর একটু থেমে থেকে শুরু করলেন—আজ আপনার দফতরের ব্যয়বরাদ্দের ওপর আপনারই বাজেট স্পিচ—তার মাঝখানে কোনরকম পরামর্শ না করে কমিশন বসাবেন?

অক্ষয় সরলের চোখের দিকে তাকালো। এই চোখে কোন পলক পড়ে না। কাগজের ফটোগ্রাফাররা নাকি বলে থাকেন—ক্যামেরার ফ্ল্যাশেও ও-চোখ চমকায় না। অক্ষয়ের চেয়ে তিনি কয়েক বছরের ছোটোই হবেন। তিনি বাঙালীর কাছে শ্রেণীহীন সমাজগঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনতার ডারলিং। ভদ্রলোক শেষে কন্সট্রাকশন ইণ্ডিয়ার কথায় চলবেন? তা বিশ্বাস হয় না অক্ষয়ের। বরং হর্ষ ঘোষ তলে তলে কিছু বুঝিয়ে থাকতে পারে। কিংবা জোট সরকারের মাথার ওপরকার কমিটির চেয়ারম্যান এখন বাঙালীর প্রবীণতম জননেতা। তাঁকেই হয়ত জুনিয়র জননেতা হর্ষ ঘোষ বুঝিয়ে সুঝিয়ে চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে রেখেছে। প্রবীণতমের পরামর্শেই হয়তো চলছেন।

অক্ষয় নিরুপায়ের গলায় বললো, আপনিই হয়তো ঠিক বলছেন—

আপনার স্পিরিট আমি বুঝতে পারছি অক্ষয়বাবু। কিন্তু এই সেসনেই অর্থমন্ত্রী পে কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করবেন। একই সেসনে দু'টো কমিশন বসালে দু'টোরই জেল্লা মার খাবে—এটা বুঝতে চান না কেন আপনারা?

বেশ। আপনার কথাই থাকলো। কিন্তু আমি তো দম ফেলতে পারছি না।

এই তো মোটে ক'মাস হলো মন্ত্রী হয়েছেন। এখন কোথায় দম

গোছাবেন—সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন—তারপর মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন আছে—এখুনি তড়িঘড়ি কিছু করতে যাবেন না সেটা করলে শুভ কিছু না হয়ে—শেষে অশুভ ব্যাপারটাও ঘটে যেতে পারে। মনে রাখবেন—বিভেদপন্থীরা সক্রিয়। মনে রাখবেন—ক্ষমতা হারিয়ে ওরা পাগল হতে আছে। এখন কি এ অবস্থায় ওদের হাতে কোন সুযোগ তুলে দেওয়া ঠিক হবে অক্ষয়বাবু?

অক্ষয় আর কথা বাড়ালো না। চিফ হুইপ এসে ঘরে ঢুকলো। অল্প কিছুদিন আগেও ছেলেটি ছাত্রনেতা ছিল। অক্ষয়ের বড় মেয়ের বয়সী হবে। বিধানসভার করিডরে এম এল এ, মন্ত্রী, সান্ত্রী, রিপোর্টারদের জুতোর শব্দ। এই করিডর দিয়ে অক্ষয়ও একদিন মসমস করে হেঁটে গেছে। তখন তার বয়স কম ছিল। তখন পা ফেলতো—যেন এক একটা অন্যায় বালির নানা হয়ে জুতোর নিচে কিচকিচ করে উঠতো। ডক্টর রায় একবার ডেকে বলেছিলেন—ওহে অক্ষয়! আজ আমায় পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে ব্যতিব্যস্ত কোরো না কিন্তু। আমার শরীর ভালো নেই আজ। কি বলতে কি বলে বসবো—সব গুলিয়ে যাবে—

আর এখনকার অপোজিশন দলবেঁধে ব্যারাকিং করে কোন কথা শুনতে চায় না। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা এলো। আসার পর চল্লিশটা বছরও চলে গেল। নিজের ঘরে ফিরে এসে ফাঁকা টেবিলে বসেই প্রথম কথা মনে হলো—প্রতিমা তো ব্যাংকের কাছে ছোটে ভাইয়ের দায়দায়িত্ব নিয়ে কোনরকম খেলাপি করেনি শুধু আমিই পারলাম না। শুধু আমি—

ও দাদা! এখনো বসে আছেন। স্পিকার এবার ঘণ্টা দেবেন। আপনাকে খুঁজছিলেন যেন। চলুন। চলুন। শরীরটা খারাপ নয়তো?

না প্রবোধ। যাচ্ছি। তুমি যাও—

পার্টির কনিষ্ঠ মন্ত্রী প্রবোধ হালদার চলে যেতে অক্ষয় উঠে দাঁড়ালো। দফতরের বাজেট কমিটি, সেক্রেটারি—সবাই মিলে

বাজেট বক্তৃতা আগাগোড়া দাগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে যে যে জায়গা জোর দিয়ে পড়তে হবে বিধানসভায়। বক্তৃতার আগাম কপি জানা রিপোর্টাররা সন্ধ্যের আগেই পেয়ে যাবেন।

অক্ষয় দত্ত বেরোচ্ছিল। তার ভেতর থেকে ডগলাস ডেকে উঠলো, এ তুমি কি করলে অক্ষয় ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে জবাব দিল অক্ষয় দত্ত—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না ডগলাস। সরকার চালাতে গেলে—মন্ত্রিত্ব করতে গেলে—পার্টি রাখতে গেলে এটা করতেই হয়।

ওই তিনশো বাইশজনের টাকা নিয়েছিলে না তুমি ? তাহলে ফেরৎ দিয়ে দাও।

গোনা নেই। তাছাড়া ইলেকশন ফাণ্ডে তো আমায় যারা ভালবাসে—তারাই টাকা দিয়ে থাকে।

আজ ভোররাতেও তো দেখলে—ও টাকা ওদের গায়েগতরে আয় করা টাকা। এতখানি দিয়ে তো তোমরা টাকা পাও না অক্ষয় !

সবাইকে কিছু না কিছু টাকা পেতে হয়। আমি মন্ত্রী হয়েই ওদের গলিটা চওড়া করেছি। করপোরেশন মন্ত্রীকে বলে ভালো স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা করেছি। এখন আর অন্ধকারের দরুন ওদের ছিনতাই হতে হয় না, ডগলাস।

যদি টিকে থাকার জন্যে মন্ত্রী থেকে যেতে চাও—তাহলে আরও ভালো জায়গা আছে তোমার জন্যে। সেখানে কোন টেনশন নেই। কোন কৈফিয়ৎ নেই। তোফা থাকবে সেখানে।

কোথায় ডগলাস ? সে জায়গাটা কোথায় ?

কেন ? তুমি তো চেনো। বিপ্লবী নিকেতন। তুমি তো ঘুরে এসেছো একবার।

ওঃ ! না। এতদিন একভাবে চালিয়ে এসেছি নিজেকে। এখন আর কারও হাততোলা হয়ে থাকতে পারবো না ডগলাস। বড় দেরি হয়ে গেছে। তাম্রপত্র নিইনি। কোন পেনশনও নিইনি।

প্রবীণ রিপোর্টার শান্তবাবু সাংবাদিকদের গ্যালারিতে আগে

থেকেই বলে রেখেছিল—আজ একটা বড় খবর ব্রেক করতে পারে। হয় কোন মন্ত্রী কমিশন বসাতে পারেন—তদন্ত কমিশন। নয়তো তিনি রিজাইন দেবেন।

কোন্ মন্ত্রী দাদা ?

ছেলেছোকরা রিপোর্টারদের তিনি নামটা বলেননি। শুধু বলেছেন—গেস মাই ফ্রেণ্ড। গেস—

কিন্তু বিধানসভায় তেমন কিছুই ঘটলো না। অক্ষয় দত্ত তার দফতরের ব্যয়বরাদ্দের বাজেট দিব্যি পড়ে গেল। বেশ জবরদস্ত মন্ত্রীর মত। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে পাইপ টানলো অক্ষয়। তার বাজেট বক্তৃতার থিম একটাই—সাধারণের জন্যে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। কেন্দ্র সাহায্যের হাত না বাড়ালে সে ব্যবস্থা করা কত দুরূহ তাও বললো অক্ষয়।

অক্ষয়ের ব্যয়বরাদ্দের ওপর বিরোধী পক্ষ ডিভিশন দাবি করলো। অপোজিশনের সে দাবি হাত তোলা ভোটেই নাকচ হয়ে গেল।

বিধানসভায় অক্ষয়ের ওপর চোখ রেখে' দু'জন বসেছিলেন। একজন স্বয়ং সরল। অন্যজন চিফ হুইপ। অক্ষয় বেরিয়ে যেতেই দু'জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বাইরে বেরিয়ে অক্ষয় দত্ত আর নিজের ঘরে গেল না। সোজা গাড়িতে গিয়ে বসে ড্রাইভারকে বললো, চলুন শিবপুর। একটু বটানিকসে যাবো। বলে হাতঘড়ি দেখলো অক্ষয়। পোনে তিনটে।

প্রতিমা তখন একটা বুড়ো ঘোড়া নিমগাছের ছড়ানো ডালপালার ছায়ায় বসে বটানিকসের মজা ডোবার জলপিপিগুলোকে উড়তে দেখছিলো—তন্ময় হয়ে। তারই দিকে একটি লোককে হেঁটে আসতে দেখে চোখ নামিয়ে নিলো।

আচমকা লোকটির মুখে তার নিজের নাম শুনে এই একষট্টি বছরেও প্রতিমা আরও জড়োসড়ো হয়ে বসলো। মাথা আরও নামিয়ে নিলো। ঠিক করলো, কিছুতেই চোখ তুলবে না।

অক্ষয় আরও একবার বললো, আমি এসে পড়লাম প্রতিমা।

এবারে এক অজানা আনন্দে চোখ তুললো প্রতিমা। কি ব্যাপার? এত ঘন ঘন আসছেন আপনি। একজন মন্ত্রীর তো এমন শোভা পায় না।

তোমার পাশে বসি একটু।

আরও জড়োসড়ো হয়ে বসলো প্রতিমা। চলুন বাড়ি গিয়ে বসবেন।

না। এখানেই বসি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

বাঃ! আমার সঙ্গে কি কথা থাকতে পারে আপনার? গাড়ি কোথায়?

ভেতরে আনতে পারতাম। আনিনি। তুমি তখন স্টুডেন্ট। আমাদের মর্নিং প্যারেডের সময় তুমি তোমার বাবার কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াতে। একটা কথাও বলতে না। চোখে-মুখে আমাদের জন্যে তোমার মুখে সেই বয়সের কষ্টটা ফুটে উঠতো শুধু।

আপনার বিয়ের প্রীতিভোজের একখানা চিঠি অনেক জেল ঘুরে শেষে তিন মাস পরে হুগলী জেলে এসে হাজির। বাবার সেসময় এখন তখন অবস্থা। ওর ভেতরেই একখানা পোস্টকার্ড লিখেছিলাম পেয়েছিলেন?

পেয়েছিলাম হয়তো। মনে নেই কিছু প্রতিমা।

সেসব দিনও আর নেই। সে পৃথিবীও নেই। দেখুন তো মজা। সেদিনের রাজবন্দী আজকেরও একরকমের রাজপ্রতিনিধি। তাই না? কি মজা বলুন তো!

আমার মন্ত্রী হওয়াটাকে অত বড় করে দেখো না প্রতিমা। মন্ত্রী ব্যাপারটা বড় ছোটো।

এই ক'মাসেই সাধ মিটে গেল! বলুন তো বৌদির কেমন লাগে—মন্ত্রী গিন্নী হতে?

তার কোনো উনিশবিশ নেই। এতদিন ধরে এত কষ্ট করেছে এখন আনন্দ করার নিয়মকানুনও ভুলে বসে আছে ইলা।

কম জ্বালাননি তো। আজ এ জেল—কাল সে-জেল। তারপর আইন অমান্য। হরতাল। জোড়া বাংলা বন্ধ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। বৌদির কি কিছু কম গেছে। ইলা নামটি বড়ো ভালো। কেমন দেখতে ?

অক্ষয়ের হাসি পেল। তুমি যে এখনো একজন মেয়ে—তা তুমি ঢাকতে পারোনি।

উঃ! আপনি সব লক্ষ্য করেন দেখছি। বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছি। মাফ করবেন। আমি—জানেন সেই মেয়ে হয়েই আছি। অথচ চাকরিতে রিটায়ার হয়ে গেলাম। আমি তো বিয়ে করার সময় পাইনি। এখনো আমি একজন অখণ্ড মেয়ে। তাই না ?

অক্ষয়ের খুব ভালো লাগল প্রতিমাকে। ইলাকে তোমার কথা বলেছি কিনা মনে নেই এখন। হয়তো বলেছি। হয়তো বলিনি। সে যা-ই হোক। ওই যে বললে না—সে পৃথিবী আর নেই—কথাটা সত্যি—আবার কথাটা মিথ্যেও বটে।

একথা বলছেন কেন ?

স্কুলে আমার এক সহপাঠী—এখন সারা পৃথিবী তাকে চেনে। বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ক্যাপিটালিস্টদের চাঁই। আমার সঙ্গে কিন্তু স্কুলের বন্ধুর মতই কথা হয় ফোনে। পলিটিকসে কিছু করে আমি যদি নিউজ হই—তাহলে ও ঠিক আমায় ফোন করবে। ফোন করে বলবে—খবরটা পড়লাম অক্ষয়। মাঝে মাঝে আমি এমনিতেও ফোন করি। ফোন করে বলি—কেমন আছো ? ও আমার শরীরের কথা জানতে চায়।

শেষ কবে ফোন করেছেন ?

দিন দশ-বারো আগে। ইণ্ডিয়ায় নেই। ইথিওপিয়ায় গেছে—কাপড়কল বসাতে। আমি যদি মাঝে মাঝে আসি—আপত্তি আছে তোমার ?

আপত্তি থাকবে কেন ? ভালো লাগলে আসবেন। আমার তো জীবনের শেষ এখন।

আমারও শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু টের পাইনি।

প্রতিমা বললো, চলুন—হাঁটি একটু। হাঁটতে হাঁটতে বললো, আপনার শেষ কোথায়? আপনি তো কয়েক মাস হলো মন্ত্রী হয়েছেন। এখনো প্রায় পাঁচ বছর চুটিয়ে মন্ত্রিত্ব করবেন। এই তো সবে শুরু আপনার।

না প্রতিমা। আমি কালই রিজাইন দেবো।

কি? বলে থেমে দাঁড়ালো প্রতিমা। ও ভুলটি করবেন না। চান্স বার বার আসে না। জানেন—আমার তখনো চল্লিশ হয়নি। প্রায় বিশ বাইশ বছর আগের কথা। সেন্ট্রাল অফিস থেকে বদলী হয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। এসেই বললেন, আমায় বিয়ে করবেন। তা আমি পিছিয়ে গেলাম। ভয় হলো। যদি বিয়ে করে সুখী না করতে পারি। যদি নিজে সুখী না হই।—তা আর চান্স এলো? এলো না। ও ভুলটি করবেন না।

এ শুধু মন্ত্রিত্ব করা প্রতিমা। আর কিছুই করার সুযোগ নেই ওখানে। ব্যাপারটা চল্লিশ বছর আগে যদি জানতাম। এতগুলো বছর শুধু শুধু নষ্ট হলো।

আপনার ডিসিসন বৌদি জানেন।

ইলা না বলবে না। বরং সাহস যোগাবে। আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বড় মাপের মানুষ।

শীতকাল চলে যাবার আগে দিনের আলো লম্বা করে দিয়ে যাচ্ছে। কাল অক্ষয়ের অফিসে কলকাতার সব কাগজের লোক আসবে। একজোট সরকারের ক্ষমতায় আসার দুশো দিন পূর্ণ হবে আসছে সপ্তাহে। সব দফতরের কাজকর্মের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে বাছা বাছা মন্ত্রীর ওপর রাইটআপ ছাপা হবে। সেই ব্যাপারেই কাগজের লোকেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইবে অক্ষয়ের কাছে।

অক্ষয় প্রতিমার পাশাপাশি হাঁটছিল। বিকেলের আর বিশেষ বাকি নেই। সে যেন একটা সিদ্ধান্তের শেকড়ে পৌঁছে গেছে। মোটা পুরনো শেকড়। এখন শুধু ধৈর্য ধরে কুচকুচ করে শেকড়টা কেটে

যাওয়াই তার কাজ। প্রতিমা বললো, রিজাইন দিয়ে কি করবেন ?

মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াবো। তারপর বিধানসভা থেকেও সরে দাঁড়াবো।

তারপর ?

বাই ইলেকশনে দাঁড়াবো যদি জিততে পারি বিধানসভায় ফিরে আসবো প্রতিমা।

জিততে আপনি পারবেন। কিন্তু সেই তো বিধানসভায় ফিরে আসবেন।

হ্যাঁ। স্বাধীনভাবে। ভোটার জানবে—তারই কথা তুলে ধরতে ফিরে এসেছি।

বৌদি কি চাকরি করেন ?

না। আগে করতো। মেয়েরা বড় হতে শুরু করলো। ও ছেড়ে দিল কাজ। আমরা তো খরচ বাড়াইনি—ঠিক চলে যাবে। অল্প বাড়িভাড়া। আমি তো নিরামিষ খাই।

সে জানি। আপনি যখন প্রথম জেলে এলেন—তখন বাবা বলেছিলেন।

ওটাই আমার প্রথম প্রতিমা।

তা জানি। আমি ব্যারাকপুর জেলের কথা বলছি। আসুন—এই বেঞ্চটায় বসি। সানে গঙ্গা। নদীর হু'পারের কলকারখানার চিমনি, গুদামঘর সূর্যের পড়তি আলোয় লাল হয়ে উঠছিল। বেঞ্চে বসে অক্ষয়ের মনে হলো, গত দুশো বছরের ভোগদখল, ক্ষমতা, চিন্তার ও পতনের কালচে পোড়া মবিল গাদ হয়ে নদীটার গায়ে লেগে আছে।

প্রতিমা নদীর সামনে বসে চুপ করে গেল। ঠিক তখনই অক্ষয় দত্ত আসচে কাল দুপুরে কাগজের লোকদের কোশ্চেনগুলো কেমন হতে পারে ভেবে নিয়ে চাপানউতোর স্টাইলে আনসার করতে লাগলো। মনে মনে।

ছ'শো দিন তো হলো—আপনি মিনিস্টার হয়েছেন। মন্ত্রী হয়ে কেমন লাগছে আপনার ?

কচু।

একটু যদি এক্সপ্লেইন করেন।

ওই তো বললাম—কচু। খেতে গিয়ে যদি গলা ধরে—পিপাসা পেলে জল খাবার উপায় নেই। খেলে গলা আরও চুলকোবে।

একথা আমরা লিখতে পারি তো ?

নিশ্চয়। আজ আপনাদের সঙ্গে আমার কোন কথাই অফ দি রেকর্ড নয়।

আপনার ইলেকশন ফাণ্ডে কারা চাঁদা দেন।

সাধারণ মানুষ দেন। তবে তাদের টাকায় এই বিরাট খরচ চলতে পারে না। কিছু বন্ধু আছেন—ব্যবসায়ী, শিল্পপতি—এরা আমায় লাইক করেন—তারা টাকা দেন। দিয়ে থাকেন।

একথা লিখতে পারি তো।

আলবৎ পারেন। স্বাধীনতার আগে থেকেই—এবং পরে তো আরো বেশি করেই—তাবৎ দল এইভাবেই আইনসভায় যায়—অপোজিশন করে—সরকারও করে—মুখে যে যাই বলুন।

প্রতিমা বললো, চলুন উঠি এবারে। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। এখন বাগান বন্ধ করে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় দত্ত উঠে দাঁড়ালেন।

ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ

॥ ১ ॥

মালপত্র চলে গেল লরিতে। সঙ্গে কুলি। ওরাই নামাবে। ঘর ঝাঁট দেবে। খোলা খাট জোড়া দিয়ে সই সই পাতবে। মাঝের ঘরটায় বসবে খাবার টেবিল। তাই তো বলে দিল মোহিত।

ফাঁকা ভাড়াবাড়ির মেঝেতে এখানে ওখানে পুরনো খবরের কাগজের টুকরো। দেওয়ালে ফটো টাঙানোর পেরেক। ছেলেরা যখন পড়ত—তখনকার ফাউন্টেন পেন ঝাড়ার দু-একটা কালির ফোঁটা। আর মশারির ফোকলা পেরেক।

মোহিত বলল, চল চল। ট্যাক্সি চলে গেলে এখন আর পাওয়া যাবে না।

উর্মি তবু দাঁড়িয়ে থাকল। শূন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে।

যাবে তো ?

হুঁ—বলেই উর্মি ঘুরে তাকাল। কলকাতার বাসাবাড়ির জানলা দিয়ে আকাশে তাকালে এখনো দু-একটা নারকেল গাছের মাথা দেখা যায়। ওরা হলো সেই সময়কার গাছ—যখন এসব জায়গায় পুকুর, চালাঘর, গ্রাম গাঁয়ের চেহারা ছিল। যখন জমি এমন আগুন হয়ে যায় নি।

উর্মি বলল, আমরা বারো বছর ছিলাম এখানে—

সুমিত অমিতকে নিয়ে যখন এখানে এসে উঠি—ওরা তখন স্কুলের শেষদিকে—এ-বাড়ি থেকেই ওরা সব পাস দিল। চাকরি পেল। পেয়ে যে যার চাকরির জায়গায়।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহিত বলল, চল। তাড়াতাড়ি চল। এখনই রাত এগারোটা। রাউরকেলার কোয়ার্টারে অমিত এখন হয়ত মশারি টানাচ্ছে—।

এই বালব্‌টা খুলে নেবে না ?

না। এটা থাক এখানে উর্মি।

নিভিয়ে দিয়ে যাই তাহলে ?

না। সারা রাত জ্বলুক উর্মি।

জ্বলতে দেবে নাকি ভেবেছো। আমরা বেরোলেই বাড়িওয়ালার বড়ছেলে এসে তালা দেবে। আলো নেভাবে।

ওই শোন। ট্যাক্সি হর্ন দিচ্ছে—

চল।

উর্মি তুমি নারায়ণ নাও। আমি রবি আর হিমিকে নিয়ে যাচ্ছি। চল—

জানো না—মেয়েদের নারায়ণশিলা ছুঁতে নেই। নারায়ণ তুমি নাও। হিমিকে আমার কাছে দাও। রবিকে তুমি নেবে—

কী বলছো উর্মি! ঠাকুর আর কুকুর একসঙ্গে ? তা হয় নাকি!

তোমার বাবা মারা গেছেন দশ বছর হতে চলল। তাঁর নারায়ণশিলা।

বল আমাদের বংশের নারায়ণশিলা। বয়স নাকি আটশো বছর।

দুজনে দরজা খুলে বেরোল। মোহিত মুখুজ্যের হাতে ছোট সিংহাসনে নারায়ণ। একখান কালো পাথর। তার গায়ে সোনার সুতোর প্যাঁচ। একটি ফুটো। তার পাশেই শ্বেতচন্দনের ফোঁটা—রাস্তার খুঁটি থেকে এসে পড়া আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সারা পাড়ার লোকজন যে-যার ঝুলবারান্দা, জানালা দরজায় দাঁড়িয়ে।

পেছন ফিরে উর্মি আর তাকাল না। সে জানে এখন বাড়িওয়ালার বউ দোতলা থেকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে বলবে—এদিকে এলেই আসবেন কিন্তু ভাই—

যত্ত সব! মনে মনে গজগজ করে উর্মি বলে ফেলল, আটশো বছর না-হাতি! তোমার ঠাকুর্দার বাবার নাম বলো তো।

জানি না।

বাঃ! নিজের বাবার ঠাকুর্দার নাম জানো না—আর নারায়ণ-শিলার আটশো বছর বয়স বলে দিচ্ছ?

একখানা পাথরের পক্ষে আটশো বছর কিছুই না উর্মি। আটলক্ষ বছর আগে হয়তো কোনো উল্কা এসে আছাড় খাওয়ায় এর জন্ম—

তখন তো আর উনি নারায়ণ ছিলেন না! নাও চলো। রবিকে সামলাও--

রবি একটি দেড় বছরের অ্যালসেশিয়ান। প্রমাণ সাইজ। হিমি তারই বোন। সে দিব্যি গিয়ে উর্মির পায়ের কাছে লেজ গুটিয়ে ট্যাক্সির জানালায় ঝোলা জিভ ঝুলিয়ে দিল। তাতে ট্যাক্সি ড্রাইভার বেঁকে বসল। ফিফটি পারসেণ্ট বেশি দিতে হবে—

তাই সই। এ অবস্থায় উপায় তো নেই। নারায়ণ নিয়ে ভেতরে বসে মোহিত রবিকে কিছুতেই বসাতে পারে না। লেজ গুটিয়ে বসে রবি গোড়াতেই ট্যাক্সির ভেতর পেচ্ছাপ করে ফেলল। তারপর ডিজেল ইঞ্জিনের ধড়ফড়ানি শুনে কুইকুই করে কাঁদতে লাগল।

আহা! কাঁদে না মানিক। —এইসব বলে অনেক আদর করে উর্মি তার আঁচল দিয়ে রবির চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল। তাতে কি রবি শোনে—

ড্রাইভার সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পড়েই বলল, দেখবেন—গাড়ির ভেতর যেন বমি না করে—

রাগে গা জ্বলে গেল মোহিতের। মানুষ হলে কী করতেন?

আঃ! থামো তো---বলে উর্মি ড্রাইভারের কান লক্ষ্য করে বলল, ওরা খুবই ছেলেমানুষ। পেট্রল—ডিজেলের গন্ধ একদম সইতে পারে না। আর তো বেশি রাস্তা নয়---

আকাশে—অনেক উঁচুতে কোনো ঝুলবারান্দা থাকলে--সেখানে দাঁড়িয়ে এখন দেখা যেত—শহর কলকাতার নানান পাড়ায় গেরস্থরা ঘুমের আয়োজন করছে। সরু সরু রাস্তায় আলোর খুঁটি। দু-ধারের বাড়িগুলোর জানলায় আলো নিভে আসছে। গড়িয়া, শেয়ালদা, শ্যামবাজার, ডানলপ, হাওড়া, বেহালা দিয়ে লরির যাতায়াত বাড়তির

দিকে। চাঁদ বা তার জ্যোৎস্না---এ শহরের পক্ষে অধিকন্তুর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

খানিক বাদে এই মহানগরীর রাস্তাগুলো রাতপাহারা, ভিখারি কুকুরদের দখলে চলে গেল। গেরস্থরা ঘুমিয়ে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে মেট্রনরা চেয়ারে বসে বসে ঘুমোচ্ছিল। গঙ্গার ঠাণ্ডা বুকে একটা লঞ্চ জোনাকি প্রায় হেডলাইট জ্বেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। খবরের কাগজের বাবুরা পয়লা পাতা সাজাচ্ছে—আর ক'ঘণ্টা বাদেই তো আবার নতুন একখানা ভোর।

ঠিক এই সময় দুর্গা দেবী, বয়স সত্তর—তার স্বামীর ডবলবেডে শুয়ে স্বপ্নে দেখল---হাট্টা কাট্টা জোয়ান—মৃগাঙ্ক মৌলিক ধুতি পাঞ্জাবি পরে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

দুর্গা ঠিক করল, সে কথা বলবে না।

মৃগাঙ্ক ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বলল, ওঠো ওঠো। চা দাও। দুজনে এখুনি ক্লাবের মাঠে গিয়ে মর্নিংওয়াক করব। ভোর হতে আর বাকি নেই।

দুধ নেই।

তাহলে লিকর দাও। সাহেবরা তো রবিবার সকালটা বাদে বাকি সময়টা পাবলিককে বেড়াতে—খেলতে ক্লাবের মাঠ খুলে দিয়েছে। এমন সুযোগ কেউ হারায় দুগ্‌গা ?

খাট থেকে নেমে দুর্গা জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়াল। আমি জানি।

তিরিশ বছর আগে কেনা নিজের প্রমাণ সাইজের দেওয়াল আয়নায় চেহারাটা দেখে নিয়ে মৃগাঙ্ক বলল, কী জানো ?

তুমি মরে গ্যাছো।

তাতে এ্যাতো হাসির কী আছে ? মরে তো গেছিই। কিন্তু তাই বলে কি আসতে নেই ?

তা আসেব না কেন ? তবে ভোর রাতে চা করা কিনা। স্বপ্নের ভেতরে হলেও ঘুম চোখে উঠে চা বানাতে কষ্ট হয়। ঘুম থেকে উঠে

আবার ঘুমোতে হয়। নয়তো সকালবেলাতেই চোখ জড়িয়ে আসে—

নাও নাও। তাড়াতাড়ি কর। এক কাপ তো চা। নিজের স্বামীর জন্যে এটুকু পারবে না? মোটে তো চার বছর হল মরেছি—

একথায় দুর্গা খুব লজ্জা পেল। আহিরিটোলার ঘোষ বাড়ির মেয়ে সে। ছোটবেলায় বাবার চাকরির জায়গায় হাতির পিঠে চড়েছে। কৃতী পুরুষের অভিমান—রাগ বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। তার বাবাও ছিলেন কৃতী। যেমন কিনা স্বামী মৃগাঙ্কমোহনও একজন কৃতী মানুষ ছিলেন। এখন না হয় মারা গেছে।

বেতের এই মোড়াটা নিয়ে বোসো তো। আমুল দিয়ে চা করে দিই?

ও তো বড়খোকার মেয়ের দুধ। বউমা রেগে যাবেন—

রাগল তো বয়েই গেল। তুমি বোসো। বড়খোকার অপারেশন ভালোই হয়েছে—

সে তো সেদিন বললে। তাড়াতাড়ি কর। চা খেয়ে আমরা দুজনে সাহেবদের খেলার মাঠটা পুরো চক্কর দেব। গাছে গাছে পাখিরা জেগে উঠেছে—

থামো। বেঁচে থাকতে তো একটা দিনও বেড়াতে নিয়ে বেরোও নি।

তখন সময় ছিল দুগ্‌গা? কত বড় খরচের সংসারটা বলতো—

তোমার মেজোপুত্তুর ঠিক তোমার ধারা পেয়েছে। সেই চড়া গলা। সেই একরোখা হাঁকডাক—

বিল্ব তো? হ্যাঁ। আমি জানতাম। ওকে যদি আরেকটু পড়াতাম—

যা পড়িয়েছো তাতেই ওর কোম্পানি কুল পাচ্ছে না। ডিক্টেরটর বোর্ডকে সিধে ঘোল খাওয়াচ্ছে। এবার বোধহয় জেনারেল ম্যানেজার হয়ে বসবে দিল্লিতে—

রাখো তো সংসারের কথা! বিয়ের পর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ও-ই

তো করেছি তোমার সঙ্গে। এখন কোথায় তুজন একটু একসঙ্গে বেড়াব—

আঃ! আমি তো মরিনি এখনো!

ওকথা শুনেও শুনল না মৃগাঙ্কমোহন মৌলিক। দেওয়াল আয়নায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একখানা ঝকঝকে চেহারা। চা দিতে দিতে দুর্গার চোখে আয়নার চেহারাটা লেগে গেল। কোথায় যেন মৃগাঙ্ককে সে এমনটি দেখেছিল? হ্যাঁ। মনে পড়েছে। এই বেশে মৃগাঙ্ক তাকে বিয়ে করতে আসে। এখন শুধু চন্দনের ফোঁটাগুলো নেই কপালে।

লজ্জায় মরে যাই!

কেন? কী হল আবার।

মরে গিয়েও লজ্জা হয় না তোমার।

কী করেছি!

নিজের বুড়ি বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতে হবে বলে একে-বারে বিয়ের বয়সটা—চেহারাটা—পোশাকটা অব্দি মিলিয়ে নিয়ে আসবে!

তুমি বোধহয় জানো না—মরে গেলে মানুষ সুন্দর হয়ে যায়।

হয়েছে। ওসব তত্ত্বকথা আমি শুনছি নে—। তোমার ছোট পুত্তুর কলকাতায় এলেই মদ গিলছে।

ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও।

বলে—বাইরে বাইরে ফেরিওয়ালার কাজ করি। ভদ্রলোক মেয়ে দেবে না।

ওসব বাত-কে-বাত শোনো কেন তুগ্‌গা। বিলিতি কোম্পানির রিপ্রেজেণ্টেটিভ। চার হাজার টাকার ওপর মাস গেলে পায়। মেয়ে দিতে মেয়ের বাপরা লাইন দিয়ে দাঁড়াবে—

তুমি একটা কিছু কর।

বা আমি কী করব? আমি তো চার বছর হল মরে গেছি। যা করার তা তুমিই করবে এখন। তবে হ্যাঁ—কুমুদকে সরিয়ে দিয়ে

ভালো করো নি দুগ্‌গা। এই বয়সে বেচারা কোথায় থাকবে ?

ছেলেরা পছন্দ করছিল না।

তোমার ছোটপুত্তুর তো ওর কোলেই মানুষ।

কুমুদ আর তার ছেলেকে আমিই তো ঝিলের ওপারে ঘর ভাড়া করে দিয়েছি। ভাড়াটা আমিই দিয়ে দি। শুধু বড়খোকা জানে। কাজ ছিল না। নিচের নতুন ভাড়াটে মোহিতদের বাড়ি লাগিয়ে দেব ঠিক করেছি। ভাল হবে না ? খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হল। চোখেও দেখতে পাবো কুমুদকে। এই নাও চা—

নিজের চা নিয়ে খাটে বসল দুর্গা মৌলিক। বড় ছেলের ছোট খুকির আমুল দুধ দিয়ে বানানো। মুখে দিয়ে বুঝল—এই স্বপ্নের চাগুলো অবিকল আসল চায়ের ফ্লেবার—স্বাদ দেয়। ওর ছেলেটার যদি একটা কাজ হয়ে যেত।

কে ? নীলু ? ওকে কেউ কাজ দেবে না। আইডেল—তার ওপর সব সময় ভুগছে।

তোমার তো একটা দায়িত্ব ছিল।

দুর্গার মুখে তাকিয়ে আলগা স্বরে মৃগাঙ্কমোহন মৌলিক বলল, অ্যাতো তাড়াতাড়ি ফট করে মরে যাব—তা তো ভাবি নি।

না। মরার বয়স হয়েছিল তোমার। আমার চেয়ে ঠিক এগারো বছরের বড় তুমি।

শেষ রাতের ফিকে জ্যোৎস্না চিরে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। সাহেবদের খেলার মাঠে এক দল কেশিয়া গাছ মগডাল থেকে হলুদ রেণু ছড়াচ্ছিল তল্লাট জুড়ে। এক গাছের নিচু ডালে নতুন উড়তে শেখা একটা কচি কাক, দেখল—বাহারে মজা! আজকাল মানুষ-গুলোর কী হল !! এক বুড়ির হাত ধরে সুন্দর জোয়ান মতো এক ভদ্রলোক দিব্যি হাঁটছে।

॥ ২ ॥

ভাড়াবাড়িতে জানালা খুলেই মোহিত এ-পাড়ায় প্রথম ভোর দেখতে পেল। রাস্তার ওপরেই জানলা। একটা রাস্তা সিধে ট্রাম-লাইনে চলে গেছে। আরেকটা রাস্তা ঝিলের গা ধরে কলোনি বসতির পথ নিয়েছে। এই দুই রাস্তাকে যোগ করে পুব দিকে আরেক পথ। তার গায়ে একতলা, দোতলা, তেতলা। গ্যারেজ ঘরে লণ্ড্রি। মুদিখানা। গুল কয়লার দোকান। অভিজাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন আর কি বাঙালি পাড়া হয়ে থাকে। একটু পর্দা—খানিক টিভি—বাকিটা ডালডা, সোফা সেট—রবীন্দ্রনাথের ছবি।

দোতলার ঝুলবারান্দায় বুড়োমানুষ ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজ গিলছে। খান তিনেক মোটর গাড়ি ধোয়াধুয়ি শুরু হয়ে গেছে। ছাদে সারি সারি অ্যান্টেনা। কারও জানালা দিয়ে বিবিধভারতীর বর্ণালীতে বাংলা গান।

এই রবি—বলতে বলতে মোহিত সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে আসতে গেল। বেরোল কী করে?

তার আগেই নতুন পাড়ায় খোলা রাস্তা পেয়ে অ্যালসেশিয়ান বেরিয়ে পড়েছে। উল্টোদিকের বাড়ি থেকে ভারি সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে রাস্তায় নেমেই রবির মুখোমুখি হল।

আর অমনি রবির ঘেউঘেউ।

মেয়েটি উল্টে পড়েই যাচ্ছিল। মোহিত গিয়ে ধরে ফেলল। এই তো কিছু হয় নি। ভয় নেই। পোষা কুকুর। —এই রবি—

একেবারে তিন রাস্তার মোড়ে কেলেঙ্কারি। মেয়েটির হাতের স্কুলব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। কুড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে হাতে তুলে দিল মোহিত। তারপর রবির কান ধরে এক চড় কষাল।

পেছন থেকে মাজা গলায় কে বলল, মারছেন কেন? ওরা কী বোঝে!

মোহিত ফিরে দেখল, সকালবেলাতেই আটপৌরে শাড়িতে রীতি-

মত গোছানো পোশাকে—একজন মহিলা—মেয়ে ঠিক বলা যায় না—তাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিচ্ছে।

কুকুরদের মারলে ওদের পার্সোনালিটি নষ্ট হয়ে যায়।

পঁয়তাল্লিশের নিচেই হবে। মহিলার নাক মুখ চোখ কাটা কাটা। বেশ লম্বা। কথা বলতে বলতে নিচু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই মহিলা রবিকে মাথার দিক থেকে আধখানা কোলে তুলে নিল। আমাদেরও আগে কুকুর ছিল। ছোট বাড়ি তো—রাখা যায় না। আমাদের নতুন বাড়িতে আবার কুকুর পুষব—

মোহিত দম আটকে রোগা হবার চেষ্টা করল। যাতে কোমর সরু লাগে। কোমর থেকে ওপরের দিকটাই তার বেশি ভারি। মহিলাদের সামনে সে তার নিজের বিশ বছর আগেকার চেহারা চেকনাই ভেবে নিয়ে—যেন এখনো সেরকমই আছে—খুব ঝকঝকে করে হাসতে গেল। আমরা কাল এসেছি।

দেখেছি। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল আপনাদের—

তা একটু।

এমন সময় বারান্দা থেকে দুটি তাজা ছেলে বেরিয়ে এল—এসে প্রায় একসঙ্গেই দুজনে বলে উঠল, তুমি শুয়ে পড়েছিলে মা। কুকুর দুটো কিছুতেই নতুন জায়গায় ঢুকবে না—

তোরা জেগে ছিলি?

হুঁ। টিভি দেখছিলাম। শেষে তো দাদা এই রবিকে কোলে করে ভেতরে দিয়ে এল।

মোহিত অবাক হল। আমি কোথায় ছিলাম?

একটু বড় ছেলেটি বলল, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। আপনার-স্ত্রী রবিকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন রাস্তায়। তখন লোডশেডিং—রাতও অনেক—

ওদের মা ঠোঁটের কোণে একটু হেসে বলল, তোমরা কী করলে?

দাদা আর আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেতরে দিয়ে এলাম রবিকে। ওর নখ কেটে দেবেন।

কাটা যায় না। কথা শুনলে তো!

আচ্ছা আমি এসে কেটে দেব।

মোহিতের বেশ ভালো লাগল ওদের। যেমন এসেছিল—তেমনি চলে গেল ওরা।

রাস্তার গা ধরে দোতলা—তেতলা। এক বাড়ির বারান্দা-আরেক বাড়ির ঘর থেকে সব সমবয়সী বন্ধুরা বেরিয়ে পড়তেই তাদের সঙ্গে মিশে গেল দুই ভাই। সুমিত অমিতের চেয়ে কিছু ছোটই হবে।

আসুন। চা খেয়ে যান—

উর্মি দুকাপ চা হাতে দাঁড়িয়ে। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। কালই রাতে সবে আসা। এর ভেতর চায়ের ছাঁকুনি, অক্সফোর্ড ডিকসনারি—সবই রাস্তা দিয়ে টেবিলে ছড়ানো দেখতে পাচ্ছিল মোহিত।

মোহিতও বলল, আসুন না—চা খেয়ে যান—ওরে বাবা! দেরি হয়ে যাবে। ওদের বাবা বেরবে। আমার বাবাকেও হাতের কাছে সব এগিয়ে দিতে হবে। আজ না। আরেক দিন—হ্যাঁ—বলেই মহিলা—মহিলাই তো—অমন দুটি তাজা ছেলের মা—দিব্যি তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

কলকাতার ভোরবেলার গেরস্থপাড়া। মাদার ডেয়ারি, খবরের কাগজের সাইকেল। ব্যাগ হাতে বাজারের পথে মানুষজন। টিউবয়েল তলায় ঠিকে ঝি—জলের ভারি। স্কুলযাত্রী ছেলে-মেয়ে।

এর ভেতর ভোরখানা বেশ ভালোই লাগছিল মোহিতের। চায়ের জন্যে উর্মির কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করল—তার সঙ্গে সংসার করে করে এই মহিলাও তো ময়লা হয় নি। চোখের টান, ঠোঁটের ভরন্ত ভাবটা এই ভোরের মতোই ডগডগে তাজা।

চা খেতে খেতে হিমি আর রবিকে বিস্কুট দিচ্ছিল উর্মি। রবি কিছুটা তাগড়া ধরনের। সবসময় ছটফট করে। আর হিমি বেশি রকমের

অভিমানী। পান থেকে চুন খসলে সে খাবার থেকে মুখ সরিয়ে নেবে। অপমান বোধ করলে চুপ করে খাটের নিচে গিয়ে শুয়ে পড়বে। দুজন দু-রকমের।

হিমিকে বড় এক টুকরো বিস্কুট দিয়ে উর্মি বলল, বাজারে যাবে না? কোন দিকে বাজার?

কলকাতার যেদিকে ইচ্ছে যাও—একটা না একটা বাজার পাবেই উর্মি। কিন্তু আমার যে বাজার যেতেই ইচ্ছে করছে না।

রবি-হিমি কী খাবে?

ওদের দুধ পাউরুটি দিয়ে চালিয়ে দাও একটা দিন।

আমরা? তুমি?

আমরাও আজ দুধ পাউরুটি খাব। আমাকে রোগা হতে হলে খানাইপানাই করে খাওয়াটা অ্যাভয়েড করতেই হবে উর্মি। আমি আগের মতো পাতলা হয়ে যেতে চাই।

তা কি আর এই বয়সে হবে। কিন্তু নারায়ণের ফুলকলা তো আনতে হবে।

ওই তো ফুল রয়েছে ঝিলের গায়ে। নয়নতারা—

ও তো শ্রীমতী দুগ্‌গা মৌলিকের প্রাইভেট বাগান!

চারটে ফুল নিলে বাড়িয়ালি কিছু বলবেন না উর্মি—

আস্তে বল। বাড়িওয়ালি কথাটা ওঁর পছন্দ নয়। খারাপ লাগারই তো কথা—

মোহিত চেপে গেল। নতুন জায়গা। শ্রীমতী দুর্গা মৌলিক অ্যাডভান্স নিয়ে ভাড়ার রসিদ দেবার সময় বলেছেন—চিন্তা কোর না মোহিত। নারাণ-পুজোর ঠাকুর আর রান্নার লোক আমি দেখে দেব।

ট্রাম লাইন থেকে অনেকটা ভেতরে এসে ঝিলের গায়ে এ বাড়ি। ধানক্ষেতে ঝিল কেটে সে-মাটি ডেভলপ করেই বোধহয় এ তল্লাটে বসতির পত্তন। আগেকার কদমগাছ—ঝাঁকালো ডুমুরগাছ এখনো দাঁড়িয়ে। সেই সময়ের সাক্ষী। ডালে ডালে শুঁয়োপোকা। তাকিয়ে দেখতে গিয়ে মোহিতের চোখে পড়ল—শুঁয়োপোকা খেতে

রাজ্যের পাখি এসেছে এই ভোরবেলাতেই। খানিক খেয়েই তারা ঝিল টপকে সাহেবদের খেলার মাঠের আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

কলকাতার ভেতর এতগুলো পাখি, গাছ—এতখানি জল। আর একটু হেঁটে গেলেই ট্রাম-বাস-মিনি। এবার সে ঠিক করেছে—জীবন-টাকে গোটাতে হবে। ছেলেরা চাকরি পেয়ে চলে গেল। আগেকার বিছানা, মশারি, থালা, বাটি · সবই এখন একসেস লাগে মোহিতের।

সেকথা মনে পড়তেই যেন মোহিত বলে ফেলল, বাজার করা কমাও। এখন আমাদের সবকিছু কমিয়ে হালকা হতে হবে।

কোন দুঃখে!

ঊর্মির ঠোঁটে বাঁকা হাসি দেখে মোহিত গম্ভীর হয়ে বলল, জীবন তো করা হয়ে গেল আমাদের।

এরই ভেতর?

তা না তো কি ঊর্মি! আর পাঁচবছর চাকরি আছে।

তাতে কি? আমার তো মনে হয়—এই শুরু হল আমাদের।

তা বৈকি। তোমায় ভাল রেখেছি বলে চুল পাকে নি। দাঁত ভাল আছে—

আমি কি তোমার ঘোড়া। থাকতে জানি বলে ভালো আছি। আরেকটু লিকার আছে। খাবে?

দাও।

রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিকশা। শীতলপাটির ব্যাপারি। ধুনুরি। জলকর জমা নেওয়া কারবারির লোকজন নৌকোয় বসে ঝিলের মাছেদের জন্যে সর্ষে আর মহুয়ার পচানো খোল ছড়াচ্ছিল। সেই গন্ধ বাতাসে। একটা অরিজিনাল পরিশ্রমের ভাগ এই বাতাসেরই হিউমিডিটি। মানুষের স্বাদ, গন্ধ, সাধের জন্যে চারদিক জুড়ে আয়োজন। ঊর্মি কত মন দিয়ে লিকার ছাঁকছে। আমরা সবাই পৃথিবীটাকে আঁকড়ে আছি।

এইসব ভাবার সময় মোহিত নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল না। তবে সে ইদানীং বেশ ভালই টের পায়—তার এই পাঁচফুট আট ইঞ্চি

শরীরটাকে নিয়ে সেই যে তার মা কোন কবে আঁতুড়ে তোয়াজ শুরু করেছিল—অবিশ্যি তখন সে এতটুকুন ছিল—সেই তোয়াজের ধারা এখনো সমানে চলেছে।

খিদে পেলে খাবার। সঙ্গিনী চাইলে বউ। মনের খাবারে টান পড়লে বই, গানের রেকর্ড। গরম লাগলে পাখার হাওয়া। আলো চাইলে ইলেকট্রিক। কত কি এই মানুষের জন্যে রেডি করা আছে। হাতড়াবার দরকার নেই।

চুয়ান্ন বছর বয়সে পাছে এই পৃথিবী সাতপুরনো লাগে—তাই আকাশ জুড়ে এল এক এক রকম রং। আশা সেই দিগন্ত অব্দি ছড়ানো। সুমিত অমিতকে নিয়ে নাতিনাতনীর একটা ভাবনাও যে তার মনের ভেতর উঁকি দেয় না তা নয়।

বাইরের লোক এখন তাকে দেখলে ভাববে—বড় জোর পঁয়তাল্লিশ। তবে মোটার ধাত। একজোড়া ভালো চোখ—একটা চোখা নাক মাংসের পাউরুটিতে ডুবে যাচ্ছে। সেটাই মোহিত মুখার্জির মুখ। এই মুখ নিয়ে সে কলকাতার ময়দানের উল্টোদিকে একটা ষোলতলা বাড়ির এগারতলার কিউবিকল থেকে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সিগারেট খায়। এক একটা লাইন মাথায় আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবির পাশে লিখে ফেলে।

ছবিগুলো দেশসুদ্ধ লোক চেনে। কখনো কোনো পপুলার মডেল কোনো ব্রাণ্ডের নারকেল তেল মাথায় মাখছে চুল ছেড়ে দিয়ে। কিংবা খুব পরিচিত কোনো সুন্দরী খাচ্ছে ভিটামিন বি। নয়তো গুঁড়ো মশল্লা ঢালছে। টিভি-র সুবাদে আজকাল আবার মডেলের মুখের ভাব মনে রেখে কথা বসাতে হয় তাকে। কোনো কোনো মডেলের খুব সহজ কথা বলতে গিয়েও অনেক সময় আটকে যায় মুখে।

তোমার না কবিতা লেখার কথা ছিল!

অনেকই তো কথা ছিল উর্মি। সময় পেলাম কোথায়? ছেলেরা ছোট ছিল তখন। চোদ্দবেলা বিজ্ঞাপনের রাইটআপ লিখলে কলমে কি কবিতা আসে!

এখন তো ফ্রি তুমি অনেক। লিখলে পারো আবার—। বলেই ঊর্মি হাতের কাপ নেড়েচেড়ে কাপের তলানি মুখে দিল।

আমি এতদিনে কবিতার অনেক পেছনে পড়ে গেছি।

ও কি কথা!—বলে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ঊর্মি। বলা হল না।

আমি কুমুদ—বলে বেশ টট্টরে এক বিধবা সামনে এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। মাসিমা বলেছেন—

আমি কাপড় কাচতে পারব না। বাসনও মাজব না। তবে রান্না মাছকোটা, ঘরঝাঁট, মোছা সব করব। পুরো একশটা টাকা দিতে হবে।

কেমন রাঁধো?

মোহিতের একথায় কুমুদ বলল, সেকথা আপনি ওপরে খোঁজ নিয়ে জানুন। মৃগাঙ্ক মৌলিক মারা যাবার দিনেও আমার হাতে তাঁর জীবনের শেষ কই তেল খেয়ে গেছেন—

খেয়ে খুব সুখ্যাত করলেন।

নাঃ। তখন আর কথা বলতে পারছেন না। শেষ সময় তো—।

গিন্নি রাঁধতেন না?

আগুনের আঁচে উনি আবার কবে গেলেন! সতের বছর বয়সে বিধবা হয়ে এসে এ বাড়িতে তিরিশ বত্রিশ বছর হেঁশেল সামলেছি। মৃগাঙ্ক মৌলিককে কত পদে রান্না করে দিইছি এক একদিন। বাড়িউলি তো মৃগাঙ্ক মৌলিকের সঙ্গে গাড়িতে বেড়িয়ে বেড়াত। দু দুখানা গাড়ি ছিল মৃগাঙ্কবাবুর। বড় দাপটের বাবু ছিলেন।

কাজে লেগে যাও। কিন্তু কুমুদ—আমি যে সেদ্ধ খাই।

ও মা! কেন গো দাদাবাবু? পাথর হয়েছে পেটে?

না না। আমার রোগা হওয়া দরকার—তাই। স্বাদের রান্না ভালবাসি। কিন্তু খাওয়া বারণ।

ওঃ! বুঝেছি। হালকা রান্না। তা সে-ও আমি জানি। বিম্বকে রেঁধে দিয়েছি টাইফয়েডের পর। দোতলার মেজোবাবু হল গিয়ে এখন—বিম্ব মৌলিক।

আমি কিন্তু শাকপাতা খেয়ে পেট ভরিয়ে রাখি কুমুদ।

তা কেন দাদাবাবু?

রোগা হতেই হবে আমায়।

এতক্ষণ উর্মি কোনো কথা বলে নি। সে খুব মন দিয়ে কুমুদকে দেখছিল। নিজেদের বয়সের কথা এরা ঠিকমতো কোনোদিনই বলতে পারে না। ষাট হয়েছে কুমুদের। একসময় চেহারায় ছিরিছাঁদ ছিল।

॥ ৩ ॥

সাহেবদের খেলার মাঠাটার বয়সের গাছপাথর নেই। তিন চার মাইল লম্বা। চওড়াও সমান। আগের শতাব্দীতে সাহেবরা লিজ নিয়ে ক্লাব করেছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে গাছ বসিয়েছে। দেওয়াল দিয়েছে। কাঠের বাড়ি। সাদা রঙের। সামনে সবুজ লন। তার পাশে সুরকি রঙের লাল টেনিস কোর্ট। সঙ্গে গেস্ট হাউস। তাতে লাল টালির ছাদ। চিমনিতে ধোঁয়া। চারদিক ঘিরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ। যেন কোনো উপনিবেশের ১৮৯০ সাল স্তব্ধ—জমাট হয়ে আছে এখানে।

অথচ আমাদের দেশ প্রায় চল্লিশ বছর হল স্বাধীন। এইসব নয়ছয় ভাবতে ভাবতেই সে খেলার মাঠটার বর্ডার দিয়ে হাঁটছিল। কলকাতার ভেতর এতখানি সবুজ মাঠ—বলা যায় আরেকটা গড়ের মাঠ প্রায়—হেঁটে শেষ করা যায় না।

আজ শনিবার। এখন বিকেল। দূরে দূরে এক এক দল বল পেটাচ্ছে। আগাগোড়াই ক্যালেণ্ডারের ছবি। দাঁড়িয়ে পড়ল মোহিত। নিজের জীবনটাও যেন আগাগোড়া ছবি হয়ে গেছে। সামনে কয়েক বছর চাকরি আছে। উর্মির সিঁথিতে কয়েকটা পাকা চুল। ছেলে ছুটো চুটিয়ে চাকরি করছে। আমি আর যুবক নেই? আমার বন্ধু-বান্ধব বাড়ি থেকে কম বেরয়। ব্লাড পেসারে নিচেরটা নব্বই ছাড়ালেই

আমি একটা করে নেপ্রাসল বড়ি খাই। কাবলি জুতোর ফিতের বাইরে আমার গোড়ালিতে কোনো ফাটাচটা দাগ নেই।

এতবড় পৃথিবীতে নারকেল তেল থেকে শিশুদের গুঁড়ো দুধের বিজ্ঞাপনের ভাষা লিখিয়ে—কথার সাজানদার—যে কোনো ভোগ্যপণ্য—মেয়েদের মাসিকের ন্যাকড়ার প্যাকেট থেকে পুরুষকে বলীয়ান করার বড়ি অব্দি পাবলিককে গছাবার নেপথ্য শিল্পী মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় শনিবারের ছুটির বিকেলে এমন মনোমোহিনী সবুজ ঘাসে-ঢাকা বিপুল মাঠে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করল।

আমি খাই খাবার সময়টার হাতনাড়া—হাঁ করা—চিবোনো ইত্যাদি অনুষ্ঠানটা মেনে চলার জন্যে। ঘুমোই শুধু চোখে চামড়ার পর্দাটা খানিকক্ষণ মেলে রাখার জন্যে। ক্লান্ত হই না। বিশ্রামে তৃপ্ত বা পুষ্ট—কোনোটাই হই না। বত্রিশ বছর আগে আমার এক-খানা কবিতার বই বেরিয়ে ছিল। তারপর দু-চারটে কবিতা লিখলেও আর বই করা হয় নি।

ক্লাবের মাঠের পশ্চিমপাড় নিশ্চয় আনোয়ার শা রোড। পুব-দক্ষিণে সরকারের তৈরী গলফ গ্রিন। উত্তর পুবে মাঠের দেওয়ালের বাইরেই একেবারে অন্য জগৎ।

ভাঙা দেওয়াল দিয়ে সব দেখা যায়। পাছে গরু ঢোকে তাই কাউক্যাচার বসানো মাঠে। সেটা পেরিয়েই মোহিতের মনে হল—সে রামায়ণ মহাভারতের রাস্তায় এসে পড়েছে। একদিকে ক্লাবের মাঠ। আরেক দিকে টালির ঘর, ছোট ঘর গেরস্থালি, একতলা বাড়ি, খাটাল, মুদিখানা। লাইটপোস্ট।

বড়ই নির্জন। সেই নির্জনতার সঙ্গে রাস্তার দুধারের বড় বড় গাছের মাথা বাতাসে দুলছিল। এরই ভেতর কে যেন মোহিতের কানের পাশে ফিসফিস করে বলল, এই মাঠটার সবটাই আমাদের ছিল একসময়—

কে?

ঘাবড়াবেন না। আমি প্রফুল্ল দত্ত।

পাশ ফিরে মোহিতকুমার দেখল, রীতিমত মাজা চেহারার মানুষ —টকটকে ফর্সা, টিকলো নাক—তারই কাছাকাছি বয়সের একজন শহুরে মানুষ। সরু পাজামা, পাঞ্জাবি। ক্লাবের মাঠ থেকে চলকে পড়া বিকেলের রোদে বা পায়ের পাম্পশুতে শুকনো গোবর চোখে পড়ল।

নির্জন রাস্তায় একধার ধরে বসতি। আরেক ধারে কবন্ধ দেওয়াল। সারা রাস্তাটাই ফাঁকা। তার ভেতরে সিধে দাঁড়ানো প্রফুল্ল দত্তর কোঁকড়া চুলের খানিকটা সাদা। একদিন কি দুদিনের না-কামানো কয়েকটা সাদা দাড়ির আভাস—বড় বড় চোখের তাকানো আরও ভারি করে তুলল। আর তখনি এই অচেনা প্রফুল্ল দত্ত বলল, এ মাঠ এখনো কিন্তু আমাদেরই—

মাসখানেক হল এদিকে এসেছে মোহিত। সে বলল, কলকাতার বুকে এতটা জমি? সবটাই আপনাদের?

হ্যাঁ। আমাদের। বিশ্বাস হল না!

বিশ্বাস অবিশ্বাস—কোনোটাই হয় নি মোহিতের। সে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

প্রফুল্ল দত্ত বলল, আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এই সবটা জমি লিজ দেন সাহেবদের। নিরানব্বই বছরের লিজ। তা সে লিজের মেয়াদও ফুরিয়ে গেছে প্রায় তিরিশ বছর—

তা আপনারা ফেরত চান নি জায়গাটা? কম করেও একশো বিঘে তো হবে—

কী বলছেন। ছ-শ বিঘের ওপর জায়গা এখানে। কিন্তু দাবি করব কী করে?

কেন? আপনাদের পৈতৃক জায়গা—

সেইটেই তো মুশকিল হয়েছে। ছ-পুরুষ আগের কর্তা লিজ দেন। এই ছ-পুরুষে তাঁর বংশধরদের লুপলাইন ব্রাঞ্চলাইন কোথায় কোথায় গেছে কে খুঁজে বের করবে। তারপর দলিল? সে দলিলের কপি তুলতেই তো দশ বছর কাবার করে দিলাম। এখনো পাই নি। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ।

বংশধরদের সবাইকে পেয়েছেন ?

নাঃ। মোটে সঁইত্রিশটা ফ্যামিলি খুঁজে বের করেছি। কেউ কাউকে চিনি না। এখনো অন্তত আরও সাঁইত্রিশটা ফ্যামিলি খুঁজে পাওয়া দরকার, বুঝলেন—

তা সবাইকে বলুন। এত দামি জায়গা কম করেও কয়েক কোটি টাকা দাম হবে এখন।

বলেন কী ? বাজার দরে এ জায়গার দাম কম করেও আড়াইশো কোটি টাকা হবে—

তা আপনারা বসে আছেন ? —বলতে বলতে মোহিত বুঝল, তার নিজেরই কানের পাশের রগ টিপটিপ করছে।

আপনারা কোথায়! বলুন - আমি একা। যাদের খুঁজে বের করছি এতদিনে—তারা কেউ থাকেন মঙ্গলদই—কেউবা রামেশ্বরমে। কয়েকজন আছে বিলেত আমেরিকায়। ডাইরি করতে হয়েছে। তাতে লেখা আছে—কে কার ছেলে। কার কটি মেয়ে। শুনবেন ? এর ভেতর তিনজন আগের শতাব্দীতে খ্রীস্টান হয়ে যায়। দুটো লাইনের ছেলেপিলে একদম মুছে গেছে। হয়তো প্লেগ হয়েছিল।

দাঁড়ান দত্তমশায়। দাঁড়ান—আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

ঘোরবারই কথা। তবে বুঝুন—এই নিয়ে আছি আমি পঁচিশ বছর। কোনো কোনো পুজোয় বোনাসের টাকাটা পুরোই রেল কোম্পানিকে দিয়ে এসেছি।

মোহিত অবাক হয়ে তাকাল।

বুঝলেন না ? এক জ্ঞাতি খুঁজে বের করতে হয়তো হাজিপুরে গিয়ে নেমেছি—সেখানে গিয়ে শুনলাম—তারা নাকি দশ বছর হল সব পাট চুকিয়ে দিয়ে সীতামারি উঠে গেছে। তখন চলো সীতামারি। বের করেছি গিয়ে ঠিক! কিন্তু আমি বের করলেই তো হবে না। আদালতে জজের সামনে এদের শনাক্ত করবে কে ?

সব গুলিয়ে গেল মোহিতের। প্রায় দেড়শো বছর আগে দত্ত পদবীধারী একজন ভূস্বামী তার বিরাট জায়গা কোম্পানীর সাহেবদের

কাছে ইজারা দিয়েছিল। সাহেবরা খেলবে বলে লিজ নিয়েছিল। সেই দত্তমশায়ের বংশধারা এই বিরাট দুনিয়ায় এতগুলো বছরে কাঁহা কাঁহা মুলুকে রয়ে গেছে। নাতি নাতনীর নাতি নাতনীরাও এত বছরে ঠাকুর্দা ঠাকুরমা—দাদামশায় দিদিমা হয়ে বসে আছে। মেয়ের ঘর ধরে এগোলে—সে তো অন্তহীন।

ও মশাই আমি তো আর ভাবতে পারছি না।

প্রফুল্ল দত্ত বলল, 'তবেই বুঝুন। আমি এদের খুঁজে খুঁজে বের করে চলেছি পঁচিশ বছর ধরে। চিঠি লিখে লিখে ট্রাক রেখে যাচ্ছি। কজন তো এর ভেতর সরেই গেল। তারপর ডিভোর্স আছে ধরুন। ডিভোর্স করে ফের যারা বিয়ে করেছে—তাদের আবার ডবল লাইন। সে এক জগাখিচুড়ি দশা। আমাকে একাই জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে এগোতে হচ্ছে—

সব্বাইকে পেয়েছেন?

কোথায়। এখনো যে কত বাকি। দুনিয়ার কোথায় যে একজন সেঁধিয়ে আছে। অনেকে জানেই না—কে তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। আমি ফি বছর নিজের খরচে বংশলতিকা রিনিউ করে ছেপে দুকপি করে সবাইকে ডাকে পাঠাই। তাও তো অনেককে এখনো খুঁজে পাওয়া বাকি।

পাবেন সবাইকে?

প্রফুল্ল দত্ত চোখ তুলে তাকাল। পঁচিশটা বছর এ ব্যাপারে ঢেলে বসে আছি। আমার তো পেছোনো চলবে না মশাই। আমারই এক ঠাকুর্দা আর বাবার দুই ঠাকুর্দা এর ভেতর আবার বে থা না করে সাধু হয়ে যান। বুঝুন তো মজা! কে বলেছিল আপনাদের সাধু হতে! একজন নাকি আবার তান্ত্রিক ছিলেন। ওঁরা তো বহু বছর বাঁচেন। মরে গেছে কিনা বুঝতে পারছি না—

কী করবেন? হিমালয়ে গিয়ে খুঁজবেন?

হিমালয় কি বিন্ধ্যাচল, কে জানে! কাশীতেও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। একজনকে পেয়েছিলাম বিশ্বনাথের ঘাটের সিঁড়িতে।

টান টান হয়ে শুয়েছিল। পাকা সাড়ে ছ ফুট। পাথরের শরীর। সব মিলে গেল। কিন্তু লোকটা বলে কি—সে নাকি দারা সিংয়ের গুরু ছিল। বুঝুন ? এই লোককে বাবার ঠাকুর্দা বলে জজের সামনে তো হাজির করা যায় না। তাহলে তো কেস কেঁচে যাবে--। তাই ভাবছি লিখে দেব—নট ফাউণ্ড ডিকজড।

সন্ধে হয়ে এল। চলি—

কোথায় যাবেন! ওই তো আপনার কুকুর দুটো খেলছে।

অবাক হয়ে মোহিত দেখল—সত্যিই তো! রবি আর হিমি একপাল ছেলের সঙ্গে পড়ন্ত রোদে সবুজ মাঠে দূরে দৌড়োদৌড়ি করছে।

একটা উপরি লাভ হল আপনার। অনেক হারানো আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পাচ্ছেন। ফের দেখা হয়ে যাচ্ছে।

তা হচ্ছে বাইরের আত্মীয়রা কলকাতায় এলে একবার ঘুরে যায় আমার বাসায়। অসময়ে চা জলখাবার দিতে দিতে পুটু কাহিল—

অবাক হয়ে তাকাল মোহিত।

পুটু ? আমার স্ত্রী। ওর সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে। আমার দুই ছেলে লেবু আর আলুর সঙ্গেও তো পরিচয় হয়েছে আপনার।

ওঃ! আপনি তাহলে আমাদের উল্টোদিকেই থাকেন।

কথাটা বলেই মোহিত বুঝল, এসব ব্যাপারে প্রফুল্ল দত্তর তেমন মন নেই। তার চোখ আবার গাঢ় হয়ে পড়েছে অদৃশ্য সেই সব আত্মীয় বংশধরদের ভেতর—যাদের অনেককে সে নিজেই এখনো খুঁজে পায় নি—অনেকে সাধু বা তান্ত্রিক--কেউ বা ডিভোর্স করে ফের বিয়েয় বসেছে—অনেককে আদালতে শনাক্ত করার মতো লোক পাওয়াই কঠিন। এ তো এক বিশাল যজ্ঞ। ম্যাপে আঁকা নদীর আঁকিবুকির চেয়েও বেশি জট পাকানো। হিমালয়ে গিয়ে সেই তান্ত্রিক ঠাকুর্দা যদি দেড়শো বছর বেঁচে থাকেন? কিংবা তিরিশ বছর আগেই যদি নিউমোনিয়ায় মরে গিয়ে থাকেন? অথবা পাহাড়ী মেয়ে

বিয়ে করে বাংলা ভুলে গিয়ে লামা হয়ে বসে থাকেন ? এমন লোকের নাম কি প্রফুল্লবাবু বংশতালিকায় তুলবেন।

ব্যাপারটা অ্যাতোই বিরাট—আর জটিল যে এর ভেতর থই হারিয়ে ফেলল মোহিত।

প্রফুল্ল দত্ত নিজের থেকেই বলল, এইসব অজানা আত্মীয় কলকাতার বাসায় উঠে জলখাবার গিলে প্রথমেই যা জানতে চাইবে --জমির কী হল ? বিক্রি করে দিয়ে টাকা পাব কবে ? আগাম হবে ?

আপনি তো এদের কাছে খরচ-খরচা চাইতে পারেন।

চেয়েছিলাম। মোটে তিনজন একবার দশটা করে টাকা এম ও করে পাঠিয়েছিল। তারপর সব চুপচাপ। আমিও হিসেব রেখে চলেছি। জমিটা উদ্ধার হোক আগে—। মুশকিল কী জানেন—বাবার ছোট ঠাকুর্দার একটা ব্রাঞ্চলাইন হায়দরাবাদের কাছে এক গাঁয়ে গিয়ে ডেরা বেঁধেছিল সেই ৭০।৮০ বছর আগে—তারা তো বাংলাই বোঝে না। লোকাল তেলুগু ছাড়া কিছু বলতেও পারে না।

রাস্তাটা আরও নির্জন হয়ে পড়ল যেন। দূরে গলফ গ্রিনের দিককার আভাস অন্ধকারে মুছে যাচ্ছে। পাশাপাশি সাত আটটা ষোল সতেরো তলা বাড়ি—একদম খালি পড়ে আছে তৈরি হয়ে ইস্তক। জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে বাড়িগুলোর চারদিকে। ঠিকাদারের গাফিলতির তদন্ত হচ্ছে বলে কোনো বাসিন্দা আসতে পারে নি। সেই বাড়িগুলোর হাজার হাজার জানালা দিয়েও অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে।

রবি হিমিকেও বাড়ি ফেরানো দরকার। কে নিয়ে গেল ওদের ওখানে ? পেছন ফিরে মোহিত দেখল—প্রফুল্ল দত্ত ক্লাবের কাউ-ক্যাচার টপকে দিব্যি মাঠের ঝাপসা হয়ে আসা দিকটায় ঘোরে পাওয়া স্পীডে এগিয়ে গেল। পুরু ঘাস বলে মানুষটার কোনো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল না!

কলকাতার ব্যস্ত জীবনের কাছে—হই হট্টগোলের গায়েই এমন

নির্জন জায়গা যে থাকতে পারে—না এলে কোনদিন জানাই হত না মোহিতের। এরকম রাস্তা—এরকম সবুজ বিরাট মাঠ অনেকদিন দেখে নি সে। এখনি তাকে বাড়ি ফিরে একটা চালু সাবানের জন্যে নতুন স্লোগান লিখতে হবে। সাবানটা অনেকদিনের—আবার নতুন মোড়কে বেরিয়েছে।

॥ ৪ ॥

সবুজ মাঠের এক এক জায়গা এক এক রকম। যেখানে সাহেবরা খেলে সেখানটায় মাঠ একেবারে সমান সমান। বাকি জায়গাগুলো উঁচু নিচু। ঢেউ খেলানো। তার মাঝে মাঝে আমগাছ, জামগাছ - বেশির ভাগই বুনো ভ্যারাইটির—পাখিদের ঠোঁটে বয়ে আনা বীজ থেকে গাছ—আর সে গাছের ফল শুধু পাখিরাই খায় এখন। আশ-পাশের সবাই এসব ফল চেনে এখন।

রোদ চলে যেতে যেতেও লম্বা লম্বা আলোর শলা পাঠিয়েছে সূর্য গাছতলায়। গাছের নিচু দিয়ে বয়ে যাওয়া চওড়া নালায় বর্ষায় জল হয়। তবু সারা বছরই জল থাকে।

নালার তীরে দাঁড়িয়ে রবি ঘেউঘেউ করে যাচ্ছে। বছর বিশের ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, এই দাদা—তুই রবিকে সামলা। হিমিটা গেল কোথায় ?

বাইশ-তেইশের দাদা পাজামা গোটানো অবস্থায় বলল, সাপ দেখে হিমি পালিয়েছে। তুই রবিকে ধর আলু। আমিও লেবু দত্ত। আজ বুড়ো সাপের নিকুচি করব।

আলু রবির গলা জড়িয়ে মাটিতে ঝুলে পড়ল। আর নাবিস নে দাদা। পায়ে পড়ি তোর দাদা—বুড়োবুড়ির বয়স হয়েছে—কামড়ালে নীল হয়ে যাবি দাদা একেবারে—

গাছের নিচে আর আলো ছিলই না। মাঠ প্রায় ফাঁকা। মোহিত হিমিকে একা একা ফিরতে দেখে তাকে নিয়েই গাছতলায় চলে এসেছে। কী করছ তোমরা এখানে ? রবি—

মোহিতের গলা পেয়ে রবি আরও জোরে ঘেউঘেউ করে উঠল। ঠিক তখনি মোহিত দেখল---তেজ মরে যাওয়া আলোয় নীচু নালাটার ভেতরকার শক্ত হোগলা ডাঁটি বেয়ে একটা মিশমিশে কালো সাপ--- যার বেশির ভাগই নালার গায়ের গর্তের ভেতরেই তখনো---ফণা তুলে ফুঁসছে। আর লেবু নালার কিনারায় নেমে গিয়ে লম্বা বাঁশ দিয়ে সেই ফণা ফেঁতলে দেবার চেষ্টা করছে। নাগাল পাচ্ছে না। বার বার ফসকে যাচ্ছে।

মোহিত পেছন থেকে দুহাতে লেবুকে জাপটে ধরে ওপরে তুলে আনল। অনেক হয়েছে! সাপুড়ে হবে নাকি? এসো। চলে এসো বলছি---

বাধা পেয়ে লেবু ক্ষেপে উঠল। করলেন কী বলুন তো? বুড়োটাকে অনেকদিন পরে পেয়েছিলাম। দিলেন তো ফসকে—

সাপ দিয়ে কী করবে তুমি?

ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি—ওই বুড়োটা আর ওর বুড়ি আরেক বুড়ি আমাদের খেলার মাঠে ঢুকে সবাইকে আঁতকে দিয়ে— ভয় পাইয়ে দিয়ে খেলা বন্ধ করে।

তাই বলে তুমি এই সন্ধেবেলা সাপের মাথায় বাঁশের বাড়ি দিতে নেমেছ?

ওদের জন্যে এদিকটায় পাখি পর্যন্ত আসে না।

পাখিরা তোমাদের এ-কাজের ভার দিয়েছে? চল।

সারা মাঠ এখন অন্ধকার। ক্লাবঘরে এখনকার দিশি সাহেবরা উজ্জ্বল আলোয় টেবিল টেনিস খেলছে। দৌড়ন্ত আলু আর লেবুর পেছন পেছন রবি আর হিমি মহানন্দে গেটের দিকে ছুটছে। গেটে এসে পৌছতে মোহিত সময় নিল। এসে দেখল---গেটের সিমেন্ট চাতালে লেবু আর আলু হাঁফাচ্ছে। রবি বা হিমির কিছু হয় নি, তারা যেন চেঞ্জে এসেছে মধুপুরে---এমন ভঙ্গিতে ক্লাববাড়ির উল্টোদিকে একটা টায়ারের বিজ্ঞাপন দেখছে।

প্রথম যৌবনের দৌড়ে আসা শরীরেরও আলাদা একটা ভঙ্গি

আছে। তাই দেখে মোহিত বলল, তোমরা ফ্রিহ্যাণ্ড করলে পারো।

আলু বলল, দাদা তো ভালো ফুটবল খেলত।

খেলত কেন?

চোখে চশমার জন্যে খেলা বন্ধ।

তোমরা পড়তে বসো কখন?

লেবু বলল, খুব ভোরে। ফিজিক্স একটা পেপার ব্যাক আছে। এবার দিয়ে দিলেই বি এস সি—ব্যাস! আর পড়াশুনো নয়।

কী করবে?

ফ্যাশন ডিজাইনার কোর্স করে ডিজাইনার হব। বেশ মজার কাজ। বছরে একবার রাউণ্ড দি ওয়ার্লড্ ট্রিপ। ফিরে এসে ড্রইংবোর্ডে বসব—আর সারা পৃথিবীর স্টাইল এক বছরের জন্যে পাল্টে দেব।

তুমি আলু?

আমি ভোরের কলেজে পড়ি। পার্ট টু। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি আপনার ঘরে আলো জ্বলছে।

আমি উঠি ভোর সাড়ে চারটে।

অত ভোরে উঠে কী করেন?

অফিসের কাজের স্লোগান লিখি। কখনো সাবানের! কখনো স্যাণ্ডো গেঞ্জির। আমার কথা বাদ দাও। আমার তো আর কোনো ফিউচার নেই। ফিউচার এখন তোমাদের—

ফিউচার! বলে হাসল আলু।

সময় থাকলে টিউশনি করলে পারো।

বাবা করতে দেবে না। করলে মাকে নিয়ে সিনেমা যেতাম—

লেবু আলুর একথায় চেঁচিয়ে উঠল, আমি একটা কাজ করি। আমাদের তো একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে ভোরে উঠে কাজ দেখতে যাই মিস্ত্রিদের। এজন্যে বাবা আমায় মাইনে দেয়। মাসে দেড়শো।

সেই টাকায় কী কর?

হাঁটতে হাঁটতেই কথা হচ্ছিল। লেবু বলল ওসিবিসা এসেছিল ; তখন টিকিট কেটে শুনতে গিয়েছি।

সে তো কয়েক বছর আগে—

তখন থেকেই তো আমাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তারপরেও গেছি। জ্যাজ্ এসেছিল। রকস্—

মোহিত বুঝতে পারছিল না—সে এদের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলবে। সে নিজে রকস্ বা জ্যাজ বোঝে না। শুনতে মন্দ লাগে না। যদি বড়ে গোলাম আলির দরবারি কানাড়া রেকর্ড বাজিয়ে শোনায় এদের ? কিংবা ছায়ানটে ফৈয়াজ ? ভালো লাগবে কি ওদের ? না—ভাবতে পারে মাস্টারি করছি। সেও তো বিপদ।

হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ কোয়ার্টার এসে গেল। শর্ট কাট করে নিজেদের রাস্তায় এসে পড়ার আগে মোহিত বলল, বাড়িতে কোন ম্যাগাজিন পড় ?

বাবা রিডার্স ডাইজেস্ট আনে। তাই পড়ি মাঝে মাঝে। সুন্দর সব জোক্স—

আলু বলল, লাইব্রেরির বই আনতে হয় মায়ের জন্যে। ওসব আমার ভালো লাগে না।

লেবু বলল, আমরা বন্ধুরা মিলে কাল দশখানা ওয়েস্টার্ন ছবির ক্যাসেট আনব। সারা রাত ধরে ভিডিওতে দেখব। আপনি আঠারো টাকা চাঁদা দিলে আপনিও দশখানা ছবি দেখতে পারেন। দারুণ দারুণ ছবি।

দেখি। এখুনি বলতে পারছি না।

বলে মোহিত পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার দুধারের বাড়ি বাড়ি আলো জ্বলছে।

লেবু আর আলু তাদের বন্ধুদের পেয়ে গেল। মোহিত প্রায় বেকুবের মতোই তখন রাস্তার মাঝখানে একা।

এখন বাড়িতে উর্মি নিশ্চয় বেয়াড়া টিভি-টাতে শব্দ আর ছবির ভেতর মিটমাট করাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কী ম্যাগাজিন

পড়ানো যায় দুই ভাইকে। পুরনো প্রবাসী কি ওদের ভালো লাগবে? বিভূতিভূষণের অপরাজিত। ওয়ার অ্যাণ্ড পিসের বঙ্গানুবাদ? শ্রীকান্ত? কত বই আছে। সত্যজিতের আরো বারো? কিন্তু যেটাই দিই—যদি মনে ভাবে—লোকটা মাস্টারি করতে এসেছে। সেও এক মস্ত বিপদ।

মোহিত ভেবে দেখল, তার নিজের ছেলেরা এখন যে যার চাকরিতে গিয়ে লোকের সঙ্গে মিশছে। খাচ্ছে। ঘুরছে। যাকে বলে ম্যান অব দ্য ওয়ার্লড হয়ে উঠছে। তাদের আর সন্ধেবেলা পড়তে বসতে বসার দিন কবেই চলে গেছে।

তার নিজের আর ছেলেও নেই হাতের সামনে।

আজ যেভাবে লেবু পয়জেনাস সাপটাকে কাবু করছিল—তাতে বোঝাই যায় লেবুর ভেতরের মেটিরিয়াল ভালো। আলুকে কেউ বলে নি—একা-একা কদিন ধরে অপরাজিত পড়ে ছাখে। যদি পড়ত।

এখন তার চোখের সামনে পাড়ারই এক গৃহস্থ সামনের বৈঠকখানায় বেশি পাওয়ারের আলো জ্বেলে দুই বন্ধু নিয়ে নীরবে ব্রিজ খেলছেন। পাড়ারই একমেব মিষ্টির দোকানে কাঠের বারকোশে ছানা ডলাই হচ্ছে।

আর চার-পাঁচ ঘণ্টার ভেতর সব বাড়ির আলো নিভে যাবে। লোকে মনোযোগ দিয়ে ঘুমোবে। তখন হুলো বেড়াল, ঝিলের মাছ, রাস্তার কুকুর আর পোস্টের আলো শুধু জেগে থাকবে। সারা দিন খেটে যে যার মেধা গালিয়ে নিজের নিজের চাওয়া জিনিস যতটা পেয়েছে জমিয়েছে—কেউ হয়ত কিছুই পায় নি—তারপর বেঁচে থাকার অভ্যেসে ক্লান্ত শরীরটাকে দানাপানি দিয়ে ঘুম পাড়াবে। নয়ত কাল ভোর থেকেই যে আবার সেই ঘাম ঝরানো। অপঘাতে চলে যেতে না হলে—কিংবা আত্মঘাতী না হলে তো এই চাকা থেকে এখুনি বেরনো যাবে না। মৃত্যু বড় নিশ্চিত। যতক্ষণ না আসে—বড়ই অনিশ্চিত। একবার এসে পড়লে সে আর আগন্তুক থাকে না।

রাত নিশুতি হলে সবাই ভরপেটে অঘোরে ঘুমোবে বলে এখন

থেকেই দেশসুদ্ধ গেরস্থ বাড়িতে নিশ্চয় ডিমের ডালনা চাপানো চলছে চুলোয়। এই অভ্যেসের জীবনে মোহিত আর দম ফেলতে পারে না। সে সারাটা পাড়ায় এই বেঁচে থাকার সাতপুরনো তোড়জোড়ে একটা পচা—চোরা গন্ধ পেতে লাগল নাকে।

এই এক্ষুণি সে দুজন তরতাজা নতুন মানুষের সঙ্গে ক্লাবের মাঠ ভেঙে এসেছে। লেবু আর আলুর নিশ্বাসের ভাপ এই বাতাসেই ছড়ানো। তবু যে কেন বয়স বেড়ে যাওয়া মানুষজনের ক্ষয়, মন খারাপ করা আলোর খামতি তাকে ছেয়ে ফেলে। তা বুঝতে পারে না মোহিত।

তবে কি ইলেকট্রিক ফ্যান থেকে প্রেসার কুকার—সবকিছুর চমকদার কিন্তু ফাঁপা বিজ্ঞাপন লিখে লিখে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি—যেখান থেকে এই চাকরি জীবনটার দিকে ফিরে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায়—সব নিষ্ফলা। সারা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে আছে খাওয়া আইসক্রিমের কাগজের কাপ। একদম মাকাল।

এই যে মোহিতবাবু! আপনি দেখছি এখানে—

রাস্তাতেই তাকে ঘিরে একটা জটলা তৈরি হয়ে গেল। এদের কাউকেই মোহিত বিশেষ চেনে না।

আপনার কুকুর বেঁধে রাখেন না কেন?

কী হয়েছে?

ঝিলে বাসন মাজতে নেমেছিল আমাদের ঝি—

তারই বয়সী লোকটা। খালি গা—বুক অব্দি লুঙি কষে বাঁধা।

বলুন—

আপনার মোটা কুকুরটা গিয়ে তাকে এমন ভয়ই দেখিয়েছে—বেচারা জলে পড়ে গেছে। সেই সঙ্গে একটা বড় বাটি পড়ে গিয়ে তলিয়ে গেছে। আর কি পাওয়া যাবে?

ভিড়ের ভেতর একজন বলল, বেঁধে রাখুন কুকুর।

একে ওকে ঘেউঘেউ করে তেড়ে যায়। কানাইয়ের বোনের শাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে কামড়ে। আরেকটু হলে গায়েই দাঁত বসিয়ে দিত।

বাঁধলে কুকুর আরও ফেরোসাস হয়ে যায়—

তাই বলে ছাড়া অবস্থায় আমাদের কামড়ে বেড়াবে!

ভয় পেয়ে দৌড়ালেই ওরা আরও কামড়ায়।

কুকুরের জন্যে তাহলে চাকর রাখুন। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—ঘুরবে—পাহারা দেবে—

আমরা তো দুটি প্রাণী। এ বাজারে কজন লোক রাখব বলুন?

সে জানি না। নিজের কুকুর সামলান। আপনি পুষবেন কুকুর! আর কামড় খাব আমরা?

মোহিত রাগে রাগে বাড়ি ফিরে এল। বারান্দায় উঠতে উঠতেই চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় গেলি? রবি—

খুশিতে লেজ পাকাতে পাকাতে রবি এসে হাজির। হিমি কিন্তু এল না। সে খাটের নিচে লম্বা হয়ে শুয়ে গলাটা মেঝেতে পেতে দিয়ে তাকিয়ে থাকল।

মোহিত রবির কান টেনে এক চড় কষাল। কতবার বলেছি বাইরে বেরিয়ে বীরত্ব ফলাবি না—

ছুট্টে রবি বারান্দায় গিয়ে বসল। হিমির যেন জানা ছিল—এমনই হবে! সে পাশ ফিরে শুল।

বাড়িটা নিঃঝুম হয়ে এল। এ তো মহা জ্বালা! মানুষের জীবন এমন হয় নাকি? আগে তো জানতাম না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যে যার জায়গায় চলে যায়। তারপর ঝুপ করে সব বাড়ি এমন শান্ত হয়ে যায়?

ও ঊর্মি! ঊর্মি—

কী বলছ? আমি এখন উঠতে পারব না। যাও তো কুমুদ—এক গ্লাস জল দিয়ে এস দাদাবাবুকে—

না। আমার জল লাগবে না।

ভালোই তো। একা একা বসে অফিসের কাজ কর। এখন তো বাড়ি নির্জন—

পাশের ঘর থেকে উর্মি যেন একাই·চাপান—একাই উতোর দিয়ে যাচ্ছিল

মোহিতের উর্মিকে ডেকে বলার ইচ্ছে ছিল—এ কী হল উর্মি ? এভাবে জীবন কাটাব কী করে ? বাড়িতে ছেলেদের কোনো গোলমাল নেই। কোনো টেনশন নেই। অখণ্ড অবসর। তুমি পাশের ঘরে পাউডার মেখে চুল বেঁধে টিভি দেখে যাচ্ছ। আমি তো চিরকাল গোলমালের ভেতরেই ফেমাস সব স্লোগান লিখেছি।

কিন্তু কিছুই বলা হল না মোহিতের। সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটের সাদা দেওয়ালে কতকগুলো মশা। দুর্গা মৌলিক ভাড়া দেবার আগে ভালোভাবে হোয়াইট ওয়াস করিয়েছেন সারা বাড়ি।

পাশের ঘর থেকে উর্মি চেঁচিয়ে বলল, ছেলেরা তো আরও চার পাঁচ বছর কাছে থাকতে পারত। সুমিতের রিসার্চের ইচ্ছে ছিল। তা না—অ্যাপলিকেশন কর। ইন্টারভিউ দাও। সাত তাড়াতাড়ি চাকরি নেওয়ালে কেন ওদের ?

মোহিত কোনো কথা বলল না। গত সাতাশ বছর ধরে যা করে আসছে—তাই করবে বলে টেবিলে ফাইল খুলে বসল। নতুন টুথ পেস্টের বিজ্ঞাপন।

পাতা জুড়ে হলুদ কালো ডোরাকাটা এক বাঘের ছবি। হাঁ করে দাঁত বের করে হাই তুলছে। সামনের দুই থাবার সামনে সুন্দর একটা টুথ ব্রাশ আড়াআড়ি শোওয়ানো।

পাশের ঘরে উর্মিকে কুমুদ বলল, বিধবা হয়ে এ-বাড়ি এসেছি সতের বছর বয়সে। বড় খোকাকে হাতে ধরে স্কুলে পৌঁছে দিতাম। বিল্ববাবু—এখন যিনি মেজোবাবু তার কঁ্যাথা পাল্টেছি। গিন্নি তো বাবুর সঙ্গে মোটরে বেড়িয়ে বেড়াত। বেড়িয়ে ফিরে বাবু নতুন নতুন রান্না তারিফ দিয়ে খেতেন। আর আমিও রান্না করেছি কোমর বেঁধে।

উর্মি বোধহয় শুনছে না। টিভি-র দিকে তাকিয়ে। কুমুদ আটা মাখতে মাখতে আপন মনে বকে যাচ্ছে।

মোহিত টুথ ব্রাশের নিচে লিখল —

বন্যেরা বনে সুন্দর

দাঁত যত্নে

রয়াল বেঙ্গল টুথপেস্ট

তিনটে তিনরকম সাইজের লাইন।

এরপর সে ছবিখানার চারদিক দিয়ে কালো লাইন টানল. বাঘের ছবি আরও খুলে গেল। যেন কাগজের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে বাঘটা—টুথব্রাশ মাড়িয়ে—দাঁত বের করে হাই তুলতে তুলতে—হলুদে কালোয় ঢেউ তুলে—এত জ্যান্ত। ছবির নিচে এইমাত্র লেখা লাইন তিনটের হরফের সাইজ, মাত্রা, রং-এর কথা এমনভাবেই লিখে দিল মোহিত যাতে কিনা জ্যান্ত বাঘটার পায়ের নিচে কথাগুলো মুছে না গিয়ে বরং জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে।

মনে মনে ভিস্যুয়ালাইজ করতেই মোহিতের মাথার ভেতর হরফ-গুলো জেগে উঠল। বাঘের থাবার নিচেই কচি কলাপাতা রঙের ডাঁটিতে সাদা ব্রাশ বসানো দাঁত মাজার। তার নিচেই কালো হরফে তিনটে লাইন।

মাথা তুলে এক অদৃশ্য আয়নায় তাকাল মোহিত। এই আয়নায় সে কাঁচুমাচু হয়ে তাকায়। তারপর খুব চাপা গলায় শুধু নিজেকে শুনিয়ে বলল, গত সাতাশ বছর ধরে এই হল গিয়ে আমার কবিতা।

॥ ৫ ॥

এ পাড়ায় এখন অনেকগুলো নতুন খবর আছে। ঝিলের জলে বর্ষা পড়তেই কয়েক মাস আগে ছাড়া মাছগুলো খানিক ডাগর হয়ে ঝাঁক বেঁধে বিলি কাটছে কদিন। দুটি ধোবিখানার লোকজন দুদিন হল ভাটি দিতে মাঠে চলে গেছে। মিষ্টির দোকানের কারিগররা গরমে উধাও। অনেক বাড়ির বউয়েরা দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত। এরকম তিনজন বউ, বিভিন্ন বাড়ির ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে উদাসভাবে আড়-

মোড়া ভাঙছিল বিকেলের মুখে। এদের একজনও তো ভাবতে পারে—আহারে! যৌবন কখন চলে গেছে—টেরই পাই নি। ঘুমের ভেতর…

দুর্গা মৌলিক পঞ্চাশ বছর আগে এপাড়ায় যখন বউ হয়ে আসেন—তখন বাড়ি ছিল কুল্যে তিনটি। একটি তার স্বামীর—একতলা। বাকি দুখানা দূরে দূরে। মাঝখানে শুধু মাঠ। তাতে গরু চরে। আর বাড়ির পেছনটায় ঝিল। জামরুল বাগান। ক্লাবের মাঠ। ডুমুর গাছ—কদম গাছ।

এখন বিকেলের দিকে সেই পাড়ায় পায়চারি করছিলেন দুর্গা। গাদাগুচ্ছের বাড়ি। নানা রকমের ভাড়াটে। সাইকেল রিক্শা। লাইটপোস্ট। ড্রেন। তার চেয়ে বয়সে বড় মাত্র দুজন মহিলা এখন পাড়ায়। তারা বেশি নড়াচড়া করে না। দুর্গাই গিয়ে গিয়ে খোঁজ নেন তাদের।

ষোলোর দু-নম্বর বাড়িটার গায়ের গলির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল দুর্গা। যা শুনেছি তাহলে সত্যি? এভাবে দাঁড়িয়ে তো আর থাকা যায় না। লোকে কী বলবে?

দুর্গা মৌলিক উল্টোদিকের বাড়ির কাজের লোককে ধমকে উঠলেন, এই তুই রোজ রাতে অত গান জুড়িস কেন রে? আমরা ঘুমোতে পারি না তোর গানের চোটে—

নাঃ! মাইজি হামি তো গাই না। দেশসে হামার ভাই আসেছিল—

তোর ভাইকে গান গাইতে বারণ করবি। এটা ভদ্রলোকের পাড়া—বলতে বলতে দুর্গারানী মৌলিক দেখলেন—প্রফুল্লর বড় ছেলেটা ষোলোর দু-নম্বর বাড়িটার উঠোনের ভেতর ফুচকাওয়ালাকে ডেকে নিয়ে গেছে। আর সেই মেয়েটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফুচকা খেয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে দুর্গা মৌলিকের মুখ বেঁকে উঠল। ও কী? দিন-রাত যাত্রা থেটার সিনেমা করে বেড়ানো—আর ফুরসুৎ পেতেই ছেলেটাকে বখানো। প্রফুল্ল করে কী? পুটুই বা করে কী?

কঙ্কাবতী বলল, যাও তো লেবু—দোরটা বন্ধ করে দিয়ে এসো—

লেবু হাতের শালপাতা ফেলে দিয়ে ফুচকাওয়ালার পয়সা মেটাল। তারপর লোকটাকে দোর অব্দি এগিয়ে দিয়ে কপাট আটকে ভালো করে ছিটকিনি তুলে দিল।

পুরনো দিনের বাড়ি। উঠোন—চাতাল—যাকে বলে দালান—সবই আছে। তবে কঙ্কাবতী ভাড়া নেওয়ায়—সিনেমা আর্টিস্ট বলে বড় আগাম পেয়ে বাড়িওয়ালা ভাড়া দেবার আগে সারা বাড়ির খোলনলচে পালটে দিয়েছিল।

তবু উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ রয়ে গেছে আগেকার। এখন বর্ষা যাচ্ছে বলে গাছতলায় খানিক জায়গায় শ্যাওলা পড়েছে। নয়তো এই সন্ধের ঝোঁকে ম্যাক্সিপরা, খোলা চুলে কঙ্কাবতীর বিনা মেক-আপের চোখের সামনে—জিনসের বাইরে ফেটে বেরানো লেবু মুখ তুলে তাকাতেই আর্ট ফিল্মের কোনো শট বলে ভুল হলে অন্যায় হত না।

বাইশ তেইশ বছরের লেবু। রংচটা জিন্‌স। ছাই ছাই ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে। কলার বোন দু খানার জোড় থেকে ঠেলে ওঠা গলার ওপর মুখ, চোখ, চশমা—কালো চুলের ঢালে ঢাকা মাথাটা—কিছু বলতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া কাঁপা ঠোঁট নিয়ে দাঁড়ানো লেবু দত্ত সত্যিই এখন কোনো আর্টফিল্মের অল্পবয়সী—চড়া বা কড়া হিরো। কোথায় লাগে নাসিরুদ্দিন।

অবশ্য ভাড়াটে বাড়ির এই উঠোনটা কোনো স্টুডিওর ফ্লোর নয়। নেহাতই গেরস্থ বাঙালি পাড়া। এখানে ক্লাব আছে, গুজব—আছে সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি—আছে গুল, কয়লা, কাঠের দোকান—মাসকাবারি মুদিখানাও।

লেবু ডান পা এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াল। কোলাপুরির বাইরে পায়ের বেয়াড়া বুড়ো আঙুল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই যেন—যা ইচ্ছে তাই করব—তোর কী রে? মাথা তুলে লেবু বলল, তেঁতুল জল খেলে অতটা—শেষে দেখবে শো-এর সময় গলা বসে গেছে।

যাকে বলে উঁচু দালান—সেখান থেকে পায়ের চটি ফটফট করে ঘরে যেতে যেতে কঙ্কাবতী বলল, আমায় নিয়ে ভাবতে হবে না তোমায়। ঘরে এস।

ঘরে ঢুকে লেবু দেখল, কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে কঙ্কাবতী বোতাম টিপে ক্যাসেট রিপ্লে করাচ্ছে। নতুন নাটকের ডায়ালগ এভাবে শুনে শুনে মুখস্থ করে কঙ্কাবতী। দূরে বেতের মোড়ায় বসে দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে চোখ পড়ল লেবুর। নানান সিনেমার স্টিল। দীপঙ্করের সঙ্গে কঙ্কাবতী। সৌমিত্রর অপোজিটে। সত্যজিতের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে কঙ্কাবতী।

ওটা কী পুরস্কার ছিল গো?

ক্যাসেট থামিয়ে মাথা তুলল কঙ্কাবতী। তারপর ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, ওটা? একদম ভুলে গেছি!

ছবিগুলো মুছে রাখ না কেন?

কী হবে! পাবলিক আমায় ভুলেই যেত। ভাগিস যাত্রার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—প্রতিভাময়ী চিত্রাভিনেত্রী—আপনাদের কঙ্কাবতী!

তা তুমি যদি ডিরেক্টর-প্রডিউসরদের সঙ্গে কড়া ব্যবহার কর তো চান্স পাবে কোত্থেকে? চান্স না পেলে পাবলিকের বয়েই গেছে মনে রাখতে!

চান্স পেতে গিয়ে যা যা করতে হয় তাই করব?

মোড়া থেকে ছিটকে লেবু কার্পেটে এসে পড়ল। ডান হাত দিয়ে কঙ্কাবতীর মুখ চেপে ধরল, না কঙ্কা। না—

লেবুর হাত সরিয়ে দিল কঙ্কা। আরেকটু হলেই ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমার হাঁটুর নিচে পড়ে ভাঙত। অত উত্তেজনা ভাল নয় লেবু। আমি কি আর সত্যিই ও পথে গেছি!—বলতে বলতে কঙ্কাবতী দু-হাতে লেবুর মুখখানা কোনো পদ্মের মত মেলে ধরল, তোমার এখন নতুন বয়েস লেবু। আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়াচ্ছো কেন?

বয়েস বয়েস করবে না তো বলছি।

আমার প্রথম ছবি কবে রিলিজ হয়েছে জান?

একশ বছর আগে! একথাই তো বলতে চাইছ কঙ্কা—

না। অনেকদিন আগে। আমি তখন রয়েড স্ট্রীটে থাকতাম। তুমি বোধ হয় তখনো স্কুলে ভর্তি হও নি।

এখন যদি তুমি খুব কম বয়সে ছবি কর তো আমি কী করতে পারি।

প্রথম ছবি—বেশ কম বয়সেই করেছিলাম। শুটিং করেছি আর বাড়ি ফিরে পড়তে হয়েছে। তখন সামনে ছিল এম এ পরীক্ষা।

সময়মত পাস করলে আমিও এবারে এম এস সি দিতাম।

পাস কর না কেন লেবু?

পড়তে ভাল লাগে না আমার। তুমি দেখছি আমার বাবার মতো গার্জেনি করছ! নাও ক্যাসেট রাখ। আমি এবার মাইকেল জ্যাকসন চাপাচ্ছি। ওঠ। নাচবে আমার সঙ্গে—দি লেডি ইন মাই লাইফ।

ও বাব্বা! সারা রাত যাত্রা করে এসে আমি এখন নাচতে পারব না।

রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে দু-হাতে টেনে কঙ্কাবতীকে দাঁড় করিয়ে দিল লেবু।

তোমার হাতে তো খুব জোর—

কথা বলো না কঙ্কা। আমার হাত ধর। নাউ শেক। শেক প্রপারলি। এই তো লক্ষ্মীটি—

ভালই লাগছিল কঙ্কাবতীর। রাতে শো থাকলে সে কখনো ভারি কিছু খায় না। কাল ছিল ফুলেশ্বরে কল শো। ফিরেছে শেষরাতে। বেলায় উঠে খানিকটা ফ্রুটজুস খেয়েছে। আজ ফ্রিহ্যাণ্ড করা হয় নি। যোগের ক্লাসে যাওয়া হয় নি দিন সাতেক। এই বেশ। দি লেডি ইন মাই লাইফ! ওয়ারড্রোবের আয়নায় লেবুর পাতের মত তরতাজা শরীরটা তাকে প্রায় ঠেকে শেক্ করে চলেছে। সে নিজেও বেশ স্লিম। আয়নায় তো তাই দেখাচ্ছে।

রেকর্ড ঘুরোতেই কার্পেটে ধপ করে বসে পড়ল কঙ্কাবতী। আর পারছি নে—

কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতেই লেবু বলল, এই তোমার ফিট বডি!

বসে বসে লেবুর দুলুনি দেখতে দেখতে কঙ্কাবতী বলল, এখন তুমি অনেক কিছু পারবে লেবু।

নাচা থামিয়ে লেবু ঝুঁকে পড়ে আবার কঙ্কাবতীর মুখ ডান হাতের আঙুলে চাপা দিল। আবার সেই বুড়ো বুড়ো কথা? বলেছি না— আমার সামনে ওসব কথা একদম চলবে না।

আমি যে দুবার বিয়ে হওয়া মেয়েমানুষ!

রামায়ণ মহাভারতে এমন বিয়ে আকছার আছে কঙ্কা।

আমার ছেলে স্কুলে পড়ছে—

আমিও একথাটা পাড়ব পাড়ব ভাবছিলাম। সন্তুকে হস্টেল থেকে নিয়ে এসো। ছ-বছরের ছেলে মাকে মিস করছে ভীষণ—

তুমি বলছ?

হুঁ।

এই পরিবেশে? আমি মাসের ভেতর অর্ধেক দিন বাড়ি থাকি না রাতে। কল শো-তে বেরিয়ে যাই—

পরিবেশ নয় কঙ্কা। আমার জন্যে তুমি ওকে হস্টেলে পাচার করেছ!

কী জন্যে?

আমার জন্যে। আজকাল আমিও অনেক কিছু বুঝি কঙ্কা। ও থাকলে পাছে আমি আনইজি ফিল করি—তাই—

মাথা আপনা আপনি নিচু হয়ে এল কঙ্কাবতীর। বাংলা ছায়াছবির স্ট্রাগলিং হিরোইন। ওয়ান ওয়াল থিয়েটারের একচেটিয়া নায়িকা। যাত্রার প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। তুমি অনেক কিছু বোঝ আজকাল—

আমিও আজকাল আমার বুদ্ধিতে অবাক হয়ে যাই কঙ্কা। তুমি

হেসো না। এই দুবছরে তোমার সঙ্গে মিশে মিশে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।—যা কিনা আগে কোনোদিন বুঝতে পারি নি। মাথায় আসেই নি তখন।—বলতে বলতে লেবু দত্ত তার নিজের মাথাটা কঙ্কাবতীর কোলে ঠেসান দিয়ে কার্পেটে পা লম্বা করে দিল।

তোমার পা দুটো খুব বড় লেবু।

মা বলছিল···আমি আরও ছ-সাত বছর লম্বা হব।

ছেলেরা তো প্রায় তিরিশ অব্দি বাড়ে! তখন তোমার পাশে আমায় খুব বেঁটে লাগবে।

তুমি তো বেঁটে নও। যাগ্‌ গিয়ে···একটা চিঠি লিখে রাখবে। আমি গিয়ে হস্টেল থেকে সন্তুকে নিয়ে আসব। সামনের শনিবার তো তোমার ছবি টিভিতে···

সাত পুরনো ছবি!

খুব সুন্দর দেখিয়েছে তোমায় ছবিটায়। আমি স্কুলে থাকতে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে দেখেছিলাম। সন্তুকে নিয়ে আসি। সামনের শনিবার তিনজনে বসে একসঙ্গে ছবিটা দেখব। কোনো কল শো নেবে না সেদিন। চিংড়ি মাছ দিয়ে···ক্যাপসিকাম দিয়ে ম্যাগি বানাবে। চিলি সস্‌ আছে তো?

আছে বোধ হয়।

বড় বড় দু-ঘরের ফ্ল্যাট। সেই সঙ্গে ঢাকা বারান্দা।

যাকে বলা যায় দালান। উঠোন। পেয়ারা গাছ। দুটো বাথ। মোটা আগাম দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল কঙ্কাবতী। ঠিকে লোক এক বেলায় সব কাজ করে দিয়ে চলে যায়। কোনো কোনো দিন খাবার জল ফুরিয়ে গেলে কঙ্কাবতী ফ্রিজের দরজা খুলে বরফগুলো নামিয়ে কুঁজোয় ভরে দেয়। গলে গেলে খাবার জল। তবে ঠাণ্ডা খুব। সে কোনোদিন এ পাড়ায় পায়ে হেঁটে বেরোয় নি কোথাও। শোয়ের জন্যে গাড়ি এলে দরজা খুলে টুক করে ভেতরে গিয়ে বসে। ফেরার সময়েও তাই। গাড়ি থেকে নেমে টুক করে ভেতরে চলে আসে।

গ্যাস, চুলো—দুইই রেখেছে সে। তবে ব্যবহার হয় বড় কম। বাইরে থেকে রান্না খাবার দিয়ে যায় একটা হোটেল। নয়তো ফেরার পথে রান্না খাবার কিনে ফেরে।

ঘরে এখন কোনো কথা নেই। ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের বাইরে চাপা আলো। কঙ্কাবতী দেখল, লেবুর মাথা ঘন চুলে ঠাসা। সেখানে বিলি কাটতে কাটতে কঙ্কাবতী বলল, এ পাড়ায় নতুন এসে সন্তুর জ্বর বেড়ে যাওয়ায় পাগলের মতো তোমাদের বাড়ি ছুটে গিয়েছিলাম ভাগ্যিস—

আর এক ঘণ্টা দেরি করলে বাঁচাতে পারতে না সন্তুকে।

তখন তোমার বাবা অনেক করেছিলেন। তুমিও রাতের পর রাত জেগেছিলে—

ও কিছু নয়—

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। লেবু একসময় জানতে চাইল, সিংহ মশায়ের ছবি কী হল ?

চুক্তি সই করালেন নিজেই। আবার নিজেই জানালেন—তোমায় নিয়ে করতে পারছি না।

কেন ?

কোনো কারণ দেখায় নি।

তুমি জানতে চাও নি কঙ্কা ?

নাঃ! জেনে কী হবে ? আমায় বাদ দিয়েছেন।

তুমি কোর্টে যাও।

লাভ! মামলায় জিতে জোর করে ওঁর ছবিতে ঢুকে কি কোনো কাজ হবে ?

অনেকক্ষণ পরে লেবু বলল, তাও তো ঠিক। লোকগুলো কী বলতো কঙ্কা—

ওঁকে চটিয়ে তো ছবির বাজারে থাকা যাবে না। যাক গিয়ে ওসব কথা। আমি যে আবার নাচ শিখছি জানো ?

খুব জানি। রোববার সকালে যখন শেখো—আমার ঘর থেকে তোমার ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়—

তাই বুঝি! তুমি কান পেতে থাকো নাকি?

তা থাকি কঙ্কা। তোমার ওই নাচের মাস্টারমশাইকে আমার একদম ভালো লাগে না।

ভীষণ ভালো লোক। আগাগোড়া প্রফেশনাল।

হলেই ভালো। তোমার ঘুঙুর থামলেই আমার কান লম্বা হয়ে ওঠে।

শেষে না লম্বকর্ণ হয়ে পড়ো তুমি! আমি বলি কি—সেই সময়টা পরীক্ষার পড়ায় মন দিলে পারো।

কোনো জবাব দিল না লেবু। তার মুখে একসঙ্গে অনেক কথা এসে যাচ্ছিল। প্রায়ই কোনো কথাই আর বলা হয় না। সে বলতে পারে না। এতদিন ধরে ডায়ালগ বলে বলে কঙ্কা তাকে সব কথাই বলে দেয়। কিছুই যেন কোনো সময় বলার বাকি থাকে না ওর।

দিতে তো চাই। মন লাগে না কঙ্কা।

তাহলে এক কাজ কর। কাল দুপুরে বেরিয়ে একটার ভেতর ব্যাম্বু ভিলায় গিয়ে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে দেখা করতে পারবে?

কী বলব গিয়ে?

কিছুই বলতে হবে না। আমার রিটার্নটা জমা দিয়ে একটা রসিদ নিতে হবে শুধু।

খুব পারব। সব গুছিয়ে দিও কাল দুপুরে—। এমনিতেই মোহিতবাবুর অফিসে একটা শর্ট ফিল্ম দেখার নেমন্তন্ন রয়েছে—সেখানেও যাব একবার।

কী ফিল্ম?

অ্যাড্ ফিল্ম। মানে নতুন একটা নারকেল তেলে—

জানি। ওসব ছবি দেখে সময় নষ্ট করা কেন লেবু? এই মোহিতবাবুরা কিন্তু খুব টিকটিকি হয়। বিজ্ঞাপনের লোককে বিশ্বাস নেই—

কী বলছো কস্কা? ভালো লোক। ওঁর স্ত্রী আমাকে—আলুকে ডেকে সেদিন পায়েস খাওয়ালেন। ওদের ছেলেরা তো যে যার চাকরির জায়গায়—

ভালো। ভালো হলেই ভালো।

॥ ৬ ॥

এই তো দাদাবাবু আছেন—; বলতে বলতে মোহিতের টেবিলের কাছে উঠে এল কুমুদ। এই রঘুবাবু তিন চারদিন ঘোরাফেরা করছেন—আপনার সঙ্গে কথা বলবেন বলে—

মোহিত চমকে তাকাল। কিসের কথা?

সে রঘুবাবুই বলবেন'খন।

রঘুবাবু নামে লোকটি মোহিতের সামনে খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসল। পায়ে বুট। লুঙ্গি—গায়ে ফতুয়া।

কী ব্যাপার বলুন তো?

বিশেষ কিছু না। আমি হলাম গিয়ে রঘুপতি ঘোষ—

বেশ তো—

কুমুদের কাছে শুনলাম—আপনি রোগা হবার কী সব নিয়ম জানেন—

কুমুদ বলেছে?—বলে থামল মোহিত। কুমুদ বিশেষ রকমের ব্যাপিকা। খাওয়া-দাওয়ায় মোহিত আজ কয়েক বছর সাবধান। যা খেলে মোটা হবার কথা—সেসব জিনিস সে অনেকদিন বাদ দিয়েছে।

যদি আমায় একটু দেখিয়ে দেন। আগে আমি ফিট ছিলাম।

এমন হলেন কী করে?

এ পাড়ায় সবাই আমায় চেনে। আমার হাতের তৈরি নকুলদানা এদিককার সবাই খেয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে নকুলদানা ফিরি করে ব্যবসার পত্তন করি। যাদের দেখেছি—বউ হয়ে এল—তারা

এখন শাশুড়ি—নয়তো দিদিমা। ব্যবসা বাড়ল। দুখানা দোকান করলাম। এই বাজারেই। একখানা হোটেল। অন্যখানা মিষ্টির। তেলেভাজাও আছে। এখন ছেলেরা বসে। আমি সারাদিন রেডিওর গান শুনি। বসে আর শুয়ে থাকি। এক সময় তো চব্বিশঘণ্টায় পঁচিশ ঘণ্টাই খাটতাম। এখন একদম বসে গেছি। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। অথচ ওজন কমাতে পারছি না।

খাওয়া কমান।

অনেক কমিয়েছি। খুব খিদে পায়। যা খাই সব হজম। এ কী জ্বালা বলুন তো!

পরিশ্রম করুন। দশ মাইল হাঁটুন।

ডাক্তার বারণ করেছে। তাহলে যে খিদে আরও বেড়ে যাবে। তখন এত কম খেয়ে রাস্তার ভেতর পড়ে যেতে পারি। কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি নে—

বড় আশা করে এসেছে লোকটা। মোহিত লোকটার মুখ ভালো করে দেখল। ভারি চোখ। বিষাদে ভোগে। বড় মাথা। একটানা হাড়ভাঙা খাটুনির পর নিশ্চিত আরামের প্রলেপ পড়েছে। গম্ভীর গলায় মোহিত বলল, আমি একটু ভেবে দেখি। আপনি বরং কাল আসুন। তখন সব বলে দেব।

একটু দেখবেন আমার কেসটা। আজ সাত বছর রোগা হবার নানান্ কসরত করে আসছি। এক ছটাকও ওজন কমে নি।

বিশেষজ্ঞর মতোই চুপ করে তাকিয়ে থাকল মোহিত। লোকটি চলে যাচ্ছে। হাড়ভাঙা খাটুনির সঙ্গে ছিল টেনশন। সেসব কিছুই না থাকায় লোকটা এখন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। হয়তো স্ট্রোকে সাবাড় হয়ে যাবে। তার আগেই ওর ওজন কমানো দরকার। এরই নাম প্রাচুর্যের ধোলাই!

বর্ষা চলে যাবার আগের থমথমে আকাশ। খানিক পরেই ঝোড়ো বাতাস দিতে পারে। সকালবেলাতেই কাজ নিয়ে বসতে হল তাকে। একটু অন্য রকমের কাজ। এতকাল সে সফট্ ড্রিংক থেকে নতুন

টয়লেট সোপ নাড়াচাড়া করে এসেছে। এবার তাকে বিখ্যাত লেখক যোগনাথ দত্তগুপ্তর ঢাউস অমনিবাস মার্কেটিং করতে হবে। অফিস থেকে তাকে বলা হয়েছে—এ স্নো পাউডার নয়। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ নিয়ে একজন লেখককে তুলে ধরা। সাহিত্যের পাঠকরা এখানে খদ্দের। তারা কিছুটা আত্মম্ভরী হবেনই। রুচি নিয়ে এদের একটা গর্ব থাকবেই। সেখানে ঘা দিতে পারলেই কেল্লা ফতে! মানে সেই দুর্বল জায়গাটায় কিছুটা সুড়সুড়ি দেওয়া চাই। কপি লাউড হলে একদম চলবে না কিন্তু।

আগে বিবিধভারতীর পনের সেকেণ্ডের জিনসটা লিখে ফেলল মোহিত।

স্নো পাউডার মাখলে মুখ সুন্দর হয়
ভালো বই পড়লে
মুখশ্রী আরও সুন্দর হয়
পড়ুন ও পড়ান
যোগনাথ অমনিবাস।
আগাগোড়া অফসেটে ছাপা
হাজার পাতার বই। মাত্র কুড়ি টাকা

হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটায় চোখ রেখে সবটা মনে মনে থেমে থেমে পড়ে নিল মোহিত। ঠিক বারো সেকেণ্ড। এর সঙ্গে বাজনা থাকবে। গলা হওয়া চাই গম্ভীর—কিন্তু কিছুতেই যেন মনে না হয়--কেউ উপদেশ দিচ্ছে।

একটু আসবেন মোহিতবাবু?

জানালা দিয়ে তাকাল মোহিত। সকালবেলার কড়া রোদে পাড়ারই চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে। ওদের দেখে রবি আর হিমি খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল।

ওদের সামলান আগে—

না। কিছু করবে না। আপনাদের চেনে—

চেনে তো বুঝলাম। আপনাকে এ কুকুর সাবধানে রাখতে হবে

মোহিতবাবু। সব সময় লোম উড়ছে। কাল তো আমার নাতনীর দুধের বাটিতে একদলা লোম।

ওদেরই গায়ের লোম বুঝলেন কী করে?

বাঃ! চুনে-হলুদ রঙের মতো বড় বড় লোম এ আর কাদের গায়ের হবে বলুন। গেরস্থ পাড়ায় অমন কুকুর রাখা চলে না বুঝলেন। কুকুর পুষবেন তো বাংলো বাড়ি নিয়ে থাকুন। এখানে গায়ে গায়ে সব বাড়ি—

অঃ।

আরেকজন বলল, ঠিক চোখটা বুজে এসেছে—আর অমনি আপনার রবি সারা পাড়া কাঁপিয়ে ঘেউঘেউ করে উঠল। ঘুমোতে অব্দি দেবে না। এবার ও দুটো কোথাও দিয়ে আসুন।

মোহিত চুপ করে চলে যাওয়া ভিড়টার দিকে তাকিয়ে থাকল।

এতদিনের পোষা কুকুর কোথায় দিয়ে আসব? ওরাই বা যেতে রাজি হবে কেন? যত্ত সব! সকালটাই ভেস্তে দিয়ে গেল। একবার মনে হল—এই নিয়ে থানায় একটা ডাইরি করে রাখলে ভালো হয়। পরে যদি কোনো গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। কিছু বলা যায় না। কিন্তু ডাইরি করতে গেলে বড়বাবু যদি রবি আর হিমিকে দেখতে চান! তাহলে? ট্যাক্সি করে থানায় যেতে কি রাজি হবে ওরা? বড়বাবু হয়তো নিজেই দেখতে চাইতে পারেন—ওদের গা থেকে লোম উড়ছে কিনা।

লেবু এসেছে আপনার কাছে?

না তো।

কোথায় বেরল বুঝতে পারছি না।—বলে পুটু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়েই থাকল মোহিত। একটা রাস্তার গায়ে আরেকটা রাস্তা যাকে বলে ট্যানজেণ্ট হয়ে চলে গেছে। সে জায়-গাটায় এখন একেবারে বাহারি দেবদারু হয়ে পুটু দাঁড়িয়ে। অল্প বয়সে মা হয়েছিল। এখন একদম ঝাড়া হাত-পা ঝা-আর কি উর্মি।

কিছু বলবেন ?—বলে হাসল পুটু।

সামান্য চমকে উঠে মোহিত বলল, দেখুন তো রবি আর হিমিকে নিয়ে কত নালিশ শুনব!

কেন? কী হল?

ওদের লোম উড়ছে নাকি সারা পাড়ায়—

কুকুর যখন, উড়বেই তো। বড় ভালো কুকুর আপনার—। বলতে বলতে খানিক এগিয়ে এল পুটু। কাল আমাদের বাড়ি হিমি এসে টিভি দেখছিল মন দিয়ে।

অনেকদিন পরে মোহিতের খুব ভালো লাগতে লাগল সকাল-বেলাটা। একটা লোক এসেছিল রোগা হতে। তারপর এল পাড়ার কজন বাসিন্দা। লোম ওড়া নিয়ে নালিশ জানাতে। আর এখন পুটু।

আপনি টিভিতে অ্যাড্ ফিল্ম করলে পারেন।

আমি? ওমা! আমায় কে নেবে?

নিত। সময় মতো আমার সঙ্গে দেখা হলেই আমি ইন্ট্রোডিউস করতাম আপনাকে।

লেবু বলছিল—আপনি ওদের অ্যাড্ ফিল্ম দেখিয়েছেন—

ও কিছু না। চার পাঁচ মিনিটের সব ছবি। —বলতে বলতে মোহিতের মুখে একদম অন্য কথা এসে গেল। লেবুর কিন্তু আরও অন্য রকম হওয়ার কথা। ও তো আরও ভালোভাবে পড়তে পারে—মানে, ওর আরও অনেক দূর যাওয়ার কথা, কিন্তু—

ঠিকই বলেছেন। আপনি একটু বলে দেখুন না।

কথাও শেষ হল—আর অমনি পুটু দত্ত যেমন বেরিয়ে এসেছিল—তেমনি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়তে এগিয়ে চলল।

মোহিতের কিছু অবাক লাগল। সে মাত্র কিছুদিন এখানে এসেছে। সে বললে তবে লেবু পড়বে? আশ্চর্য!

নিজের বোধহয় খুব গা-পড়া হয়ে আলু আর লেবুর জন্যে ভাবা-ভাবি হয়ে যাচ্ছে। ওরা তার কেউ নয়। কিন্তু এটাও ঠিক—কোনো

আনকোরা নতুন মানুষ পেলে তার মনে হয় কিছুটা র-মেটিরিয়াল পেলাম। এবার তাদের ছেনে ঘেটে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে ভাঙ-চুর, খোদাই করে আস্ত, পুরো মানুষ বানিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এই ভয়েই কি তার নিজের ছেলেরা তাকে এড়াতে কলকাতার বাইরে চাকরি নিয়ে দূরে সরে পড়েছে? তার হাতের বাইরে থাকবে বলে!

এটা মোহিতের একটা রোগ। সে জানে। কোনোদিন সে একটা সনেটের মতো সনেট লিখতে পারে নি। কবিতায় সে সবার চেয়ে ভিন্ন হয়ে উঠতে চেয়েছিল। সেইজন্যে তার কবিতা হয় নি। কেউ কেউ কবি হয়। সবাই কবি হয় না। সে হয় নি।

এই হতে না পারার যন্ত্রণায় সে এত বছর ধরে অফিসের পরেও বাড়িতে কাজ নিয়ে এসেছে। না এনেও উপায় ছিল না। সুমিত অমিত পিঠোপিঠি। ওদের পড়াশুনোই চলেছে ঝাড়া বারো-চৌদ্দ বছর। প্রাইভেট কোচিং থেকে ওদের জলখাবার সবই এসেছে—টায়ার থেকে ন্যাপকিন—সবকিছুই কপি লিখে আর্ট ওয়ার্কের সঙ্গে জুৎসই কপি বসিয়ে একসঙ্গে ভিস্যুয়ালাইজ করে। জনমানসে কতটা ছাপ পড়বে তাই ভেবে ভেবে। এইভাবেই তার দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে। এরকমই মনে পড়ে, মোহিতের সময় সময়। তার ভেতর লেবুর মতো একজন টাটকা আনকোরা মানুষ--যাকে বলে র-মেটি-রিয়াল ক্বচিৎ কখনো আসে। এমন আসাটাই মোহিতকে টালমাটাল করে দেয়। তার কবিতা করে তোলার এই নেশা একজন মানুষ পেয়ে তখন আরো প্রবল হয়ে ওঠে।

আগে তো কেউই জানত না একদিন পৃথিবীর এ জায়গাটা কলকাতা হয়ে যাবে। তার এক পাশে থাকবে সাহেবদের খেলা-ধুলোর ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠ। তাতে মোটাপাটি'র কোটি কোটি ঘাস। মাঝে মাঝে মো করা চোখ জুড়ানো ঘাসের চৌকো।

বর্ষা চলে গেলেও মাঠের নালা জলে টইটম্বুর। এই সময়টায় মাঠে লোকজন থাকে না। না থাকে সাহেব-সুবো, না থাকে দেওয়ালের ওপাশ থেকে আসা গরিবগুর্বোর ভিড়।

চড়া রোদে ঘাসের গা দিয়ে আগুন ছুটছিল। জলে ডোবা হোগলা জঙ্গল থেকে বুড়ো সড়াৎ করে ডাঙায় এসে পড়ল।

ভারি শরীর। কয়েক জায়গায় ঘাস থেঁতলে মাটি বেরিয়ে পড়ল। ভালো করে দেখলে ঘাসের সাদা শেকড়ও দেখা যেত। গায়ের বড় বড় আঁশে বুনো গন্ধ ছড়িয়ে বুড়ো ক্লাব মাঠের গাবতলায় উঠে এসে হাঁপাতে লাগল। কই এলে?

দাঁড়াও। কতকাল বেরোই না বলতো—বলতে বলতে নালা থেকে বুড়িও উঠে এল গাবতলায়।

ভারি মাথাটা পাপড়ির কায়দায় তুলে ধরে বুড়ো বলল, তা বটে। সেই যে কার্তিক মজুমদার মার্ডার করে রাত বিরোতে আমাদের নালায় লাশ ফেলা ধরল—তারপর আর আমরা জোড়ে বেরোই না অনেকদিন। দ্যাখো দ্যাখো—

বুড়ি ফণা তুলল। ওমা! তাইতো! দেওয়াল ঘেঁষে কত ঘরবাড়ি হয়ে গেছে।

চিন্তার কথা। মানুষ অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। আগে কত ফাঁকা ছিল এসব দিক—

বুড়োর একথায় গ্যাদোরে গোদোরে পাশ ফিরে বুড়ি গোখরোটা ফণা নামিয়ে মাটিতে গলা পেতে বলল, আমার মাথাটা বাপু বিষে টন টন করছে। এই গাব গাছটার গায়ে ঢেলে দিই—

বলেই হিসহিসিয়ে পরেপ্পর তিন ঠোক্কর আসবে—

গাবগুড়িতে। উঃ। শান্তি! কি বলছিলে?

বুড়ো বলল, গাবতলায় কোনো গরুবাছুর এসে মুখ দিলে নির্ঘাত ঢলে পড়বে—

যা বলছিলে বল না কেন!

বুড়ো বলল, মানুষজন বেড়ে যাচ্ছে চারদিকে। কী নির্জন ছিল আগে এসব জায়গা। আমাদের বিপদ কিন্তু ঘনিয়ে আসবে দিনে দিনে—

কার্তিক মজুমদার যে জোয়ান জোয়ান ছেলেগুলোকে মেরে ফেলে

দিয়ে যাচ্ছিল এখানে—তার চেয়ে তো ভালো। পুলিশ এসে একদিন কার্তিক মজুমদারকে না মারলে আজও নালায় লাশ ভাসত।

চরাচর জুড়ে আলো বাতাসের ভেতর মানুষজন ঘরবাড়ি ডুবে থাকে। শোক আহ্লাদে মাখামাখি হয়ে। বুড়ি গোখরোটা ক্লাবমাঠের গাবতলায় নিজের ফণা তুলে উল্টো বাতাসের স্বাদ পায় শরীরে। আঃ! জুড়িয়ে গেলাম—

বুড়োটা অনেকদিন পরে ফাঁকায় বেরিয়ে নিজের শরীরটা জুৎ করে নিতে লাগল। যতটা পারে ফণা তুলে ঠেলে উঠল। আর ধপাস করে ঘাসের ওপর পড়ে পড়ে সর্বাঙ্গ ঝাঁকা দিতে লাগল। মানুষগুলোর জন্যে তোমার এত মায়া মমতা কেন? পেলে তো ওরাই আগে সাবাড় করবে তোমায়!

তা হোক। জীবগুলোর ডান-বাঁ জ্ঞান আছে।

আমি পেলেই কিন্তু ছোবলাব। বলতে বলতে বুড়ো গোখরোটা গাবতলার শেকড় বাকড়ের ভেতর একটা পুরনো—শুকনো গর্তে আস্তে আস্তে ঢুকে যেতে লাগল।

এদানি বুড়ি চোখে কম দেখে। গত অমাবস্যায় খোলস ছেড়ে আসার সময় একটা নোনাগাছের জোড়ডালে আটকে গিয়েছিল আর কি। কোথায় যে কত চোরা ফাঁদ। এ কী? কোথায় গেলে?

বুড়ি তার হাল্কা মাথা এদিক ওদিক করেও বুড়োর কোনো হদিস পেল না। সে এখন কম দেখলেও—শব্দ শুনে জিনিসপত্তরের আন্দাজ পায়।

কে যেন ধপাস ধপাস করে হেঁটে আসছে। নিশ্চয় মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি গাবতলার শেকড়বাকড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

অনেকদিন আগে ক্লাবের এক সাহেব স্কটল্যাণ্ড থেকে বিচি এনে চারা করে তবে এই গাছগুলো বসায়। লোকে বলে বিলিতি গাবতলা।

একটা লোক বুট পায়ে এদিকেই জোরে জোরে হেঁটে আসছে। সাহেব লোক নয়। পরনে লুঙ্গি গায়ে ফতুয়া। বেশ মোটাসোটা।

এ সময় কেউ হাঁটতে বেরোয়। বুড়ি আরও বেশি করে শেকড়-বাকড়ে মিশে গেল। সে যেন এই গাবজঙ্গলেরই আরেকটা শেকড়। মোটা। ভারি লম্বা। কালো মিশমিশে।

রঘুপতি ঘোষ তখন সারাটা ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, হে ভগবান! আমি কি কোনেদিন আর রোগা হতে পারব না?

ঝিলের ওপার দিয়ে সূর্য উঠে প্রফুল্ল দত্তর জানালায় আলো তাক্ করে এই মাত্র ভেসে উঠেছে। কাটা দরজার ওপাশ দিয়ে ঊর্মি অনেকদিন পরে গুনগুন করে গাইছিল। মোহিত মুখ ধুয়ে এসে এক ঢোঁকে ঠাণ্ডা চা গিলে নিয়ে দেখল—চায়ের কাছে সবচেয়ে যা বড় পাওনা—সেই মধুর কষ কষ ভাবটা সে মুখের ভেতর টের পাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মোহিত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের টেবিলে বসে গেল। পায়ের নিচে রবির গায়ের ভেলভেট টের পেতে পেতে মোহিত মুখোপাধ্যায় ডটপেনে ঘসঘস করে লিখল

এই আসাটুকুই সত্য
আগের যাওয়া
পরের যাওয়া
সবটাই তুই রত্তি
এই আসাটুকুই সত্যি

লিখে জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখল—প্রফুল্ল দত্ত তার বাড়ির জানালায় বড় মতো কী একখানা কাগজ ঝুঁকে পড়েছে। দত্ত কুলোদ্ভব প্রফুল্ল! কার আবার বংশলতিকা নিয়ে পড়লেন ভাই!!

ভোরের এই আলো---প্রফুল্ল দত্তদের ভাড়াবাড়ির কার্নিশ ঘেঁষে হিমে ভেজা রোদ—ঝিল জুড়ে ক্লাবমাঠের ওদিককার কলোান এলাকার গেরস্থ বাড়িগুলোর পাতিহাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক—একদা কবি মোহিতের মনটা ভরভরাট করে দিল। সে নিজের পদ্যর দিকে তাকিয়ে বুঝল চিন্তা ভাবনার ডগাগুলো দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। রিফ্লেক্স আগের মতো আর কাজ করে না। সে ডটপেন দিয়ে আগাগোড়া

কেটে দিল। তারপর উর্মির রাখা পায়েসের বাটি দুটো-হাতে নিয়ে পায়ে স্যাণ্ডেল গলাল।

রীতিমত সুশ্রী, সুঠাম, সুপুরুষ মানুষ যদি একটানা উদ্বেগের চাপের ভেতর থাকে—মনে যদি হজমের অনিয়ম কাজ করে—তাহলে যে-ধরনের বিষাদ-মাখানো, রূপবান—ধ্রুপদী রাজাগজামার্কা চেহারা হয়—প্রফুল্ল দত্তকে দেখতে ঠিক তাই। টিকালো নাক, টানা টানা চোখ, কোঁকড়া চুল—সেই সঙ্গে পাকা জুলপি, লালচে পোড়া গায়ের রং—মাথায় চুল কমে এসেছে—দু-হাতে ফুলে ওঠা দাগড়া দাগড়া শিরা—হাসলে এক একসময় মোহিতের তো প্রফুল্লকে ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিশিয়ান লাগে—আবার একদিন আবিষ্কারকও মনে হয়েছিল প্রফুল্লকে তার—বিশেষ করে প্রফুল্ল দত্ত যখন মনের আনন্দে হেসে ফেলে—কিছু একটা পেয়ে গিয়ে—কিংবা পাবে বলে।

সদ্য ঘুমভাঙা চোখে বিশাল একখানা কাগজ জানালার কাছাকাছি পেতে প্রফুল্ল দত্ত চশমাসুদ্ধ চোখজোড়া আঁকিবুকির ওপর নামিয়ে আনল। কাগজের গায়ে ছাপা সব লাইন দিয়ে নদী, রাস্তা, রেললাইন বোঝানো হয়েছে। টুপি টুপি জায়গাগুলো পাহাড়। কাগজের ডানদিকের কোণে লেখা—জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।

কলকাতার পুরনো ভাড়ার বাড়ি। মাঝখানের বড় ঘরটা ঘিরে তিনদিকে তিন-ফালি ঘর। রাস্তার দিকে ঢাকা বারান্দা। বড় ঘরে বসেই পুটু পেছন দিককার উঠোন, রান্নাঘর, কলতলা, পেয়ারা গাছ দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে দেখতেই বলল, এ পাড়ায় কোনো আমবাগান নেই—?

ম্যাপ থেকে চোখ না তুলেই প্রফুল্ল দত্ত বলল, শহরে আবার আমবাগান থাকে নাকি!

এটা আবার শহর নাকি!

ম্যাপ থেকে চোখ না তুলেই প্রফুল্ল দত্ত বলল, ঠিকই বলেছো।

মাছ চাষের ঝিল! মোষ চরানোর মাঠ !! খুন করে ফেলে দেওয়ার নালা !!!—সবই আছে এখানে—

দাঁড়াও দাঁড়াও বলে পটু প্রায় কোনো হাঁটুভাঙা মূর্তি হয়ে খানিক উঠে পড়ল, কার্তিক মজুমদারের আমবাগান ছিল—

হ্যাঁ! সেখানে এখন তোমায় নিয়ে যাই আর কি? লোকটা সত্তর বাহাত্তরে কেন যে খুনে হয়ে উঠল। কেনই বা পুলিশ তাকে সাবাড় করে দিল। তার বাগানে বোধ হয় পাখিও ঢোকে না এখন।

দাঁড়াও

পুটুর একথায় ম্যাপ থেকে চোখ তুলল প্রফুল্ল দত্ত। কী ব্যাপার?

লোকটা তো শখের কলমের আমবাগান করেছিল?

শুনি তো তাই।

আচ্ছা সে বাগানে নিশ্চয় একটা বটগাছও থাকবে?

বটের কলম কেউ বসায়—সেকথা তো কোনোদিন শুনি নি। যত্ত সব! দিলে তো আমার শিবালিক রেঞ্জ হারিয়ে—

রাখো তোমার পাহাড় পর্বত?

আরে! ওই রেঞ্জেই আমার বাবার সেঝঠাকুর্দা নাইন্টিন টুয়ে লোটা কম্বল নিয়ে সাধু হয়ে চলে যান বাবার ডাইরি তো তাই বলছে।

মুণ্ডু বলছে! নিজের ছেলে যে গোল্লায় যাচ্ছে—সেদিকে খেয়াল আছে?

আমি তো কোনো রেসপনসিবিলিটি শার্ক করি নি পুটু। কয়েক কোটি টাকা দামের ক্লাব মাঠটা আমাদের পৈতৃক হক্কের সম্পত্তি। সেটা উদ্ধার হোক তুমি চাও না? কর্তারা যাঁরা লিজ দিয়েছিলেন নাইনটি নাইন ইয়ার্সের—তার মেয়াদ কবে ফুরিয়েছে। এখন বিশাল দত্ত পরিবারের ওয়ারিশানদের খাড়া করে দাবি করা শুধু। নয়তো ক্লাব তো এখন ফোকোটের মালিক!

সম্পত্তি ঢুকেছে তোমার মাথায়। আর কোনোদিকে নজর নেই তোমার!

কে বলেছে? তুমি—তোমার দুই ছেলে—তাদের জন্যে বাড়ি তো করে রেখে যাচ্ছি। আলু কোথায়?

মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে গেছে। আজ দরজা বসবে সামনের ঘরে—

লেবু?

জানি না।

ভেতর ঘর থেকে লেবু দত্ত চেঁচিয়ে বলল, আমি একটা ক্যাপসি-কাম নিচ্ছি মা।

পুটু দত্ত কাঁপা গলায় বলল, ওই ফিরেছে তাহলে। বাবা হয়ে তুমি ওকে কিছু বলবে না? একা একা ডিম আর ক্যাপসিকাম মিশিয়ে গ্যাসে ম্যাগি বানিয়ে খায়। এসব নিশ্চয় সেই রাক্ষুসির শেখানো।

শুধু শুধু অন্য একজন মহিলাকে দোষ দিচ্ছো কেন পুটু? তোমার ছেলে এখন অ্যাডাল্ট্।

অ্যাডাল্টের নিকুচি করেছে। লেবুর এখনো তেইশ পুরো হয় নি। তোমার বড় ছেলে। আমি এখন কী করি? মাথার চুল ছিঁড়ব? না, বিষ খাব?

কিছুই করবে না। লেবু এখন বড় হয়েছে তাকে তার পথ বেছে নিতে দাও।

নিজের ছেলের সঙ্গে বিলিতি কায়দা করবে না বলে দিলাম। তুমি ওকে আটকাও।—আর কিছু বলতে পারল না পুটু। সে ডুকরে কেঁদে উঠেই চুপ করে গেল।

প্রফুল্ল দত্ত কোনো অদৃশ্য আয়নায় তাকিয়ে নিজে নিজেই হাসল। তারপর খোলা ম্যাপখানা গুটিয়ে নিয়ে বলল, এত বড় একটা পৈতৃক প্রপার্টি উদ্ধারে নেমেছি। একেবারে একা। কেউ পাশে নেই আমার। নিজের অফিসের পি এফ-এর টাকা তুলে তুলে সাতাশি জন ওয়ারিশান এখন অব্দি খুঁজে বের করেছি।

তাই বলে তোমার প্রথম সন্তান ভেসে যাবে? তুমি তাকাবে

না? প্রপার্টি করছো তবে কার জন্যে? লেবুও তো তোমার একজন ওয়ারিশান?

থতমত খেয়ে পুটুর মুখে তাকিয়ে পড়ল প্রফুল্ল। সকালবেলার বড় ঘরের লাল মেঝে তাদের মাঝখানে পড়ে আছে। প্রফুল্ল দত্ত বলল, নিশ্চয়। লেবুও একদিন অত বড় প্রপার্টির একজন ওয়ারিশান হবে—যখন তুমি আর আমি থাকব না।

পরের কথা পরে। এখন যে ছেলেটা ভেসে যায়। সারাক্ষণ কঙ্কাবতীর ঘরে গিয়ে বসে থাকে। পড়ে না। বল পেটাত আগে কত—এখন কোনো খেলাধুলোয় যায় না। কঙ্কার কল শো পড়লে গাড়ি ডেকে এনে কাছে পিঠেও থাকে সঙ্গে সঙ্গে। তুমি বাবা হয়ে কিছু বলবে না? আমি যে পাড়ায় টিকতে পারছি নে—

কেন? কেন?

ঢি ঢি পড়ে গেছে। অবিশ্যি আমার সামনে কেউ কিছু বলছে না। ওরা দুজনে নাকি রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসে আছে—

ঠিকই আছে। লেবু তো একুশ পেরিয়েছে প্রায় বছর দুই। আইনে তো আটকাচ্ছে না।

বাঃ। কঙ্কার বয়সের খেয়াল আছে তোমার? কিছু না হোক সাঁইত্রিশ এখন ওর। ছেলে সন্তুই তো আট নয় হবে।

তাতে কী! একদম তৈরি নাতি পেয়ে যাচ্ছো! কী বলো?

ক্লাব মাঠের কাগজপত্তর ঘেঁটে ঘেঁটে তুমি পাগল হয়ে গ্যাছো। নয়তো বাপ হয়ে—

চুপ করো। আমি তোমার ছেলের পা ধরে বলি নি?—ওসব ছাড়ো বাবা—পড়াশুনো করো। আর যদি বিয়েই করো—তবে নিজেকে চালাবার সঙ্গতি করে নিয়ে বিয়ে করবে—নয়তো পথে ভাসবে বাবা!

সঙ্গতি তো মেয়েটাই। মাস গেলে টি ভি, সিনেমা, যাত্রা থিয়েটার, থেকে না হোক আট দশ হাজার কামায়। তোমার ছেলেটি হচ্ছে—

সেই যে মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে! এখন বাবু ঠিক করেছে—দর্জি হবে—

কী? কী বললে?

ফ্যাশন ডিজাইনার হবে।

তাই বল। ভালোই তো। কঙ্কা যদিও ওকে একজন সাহেব দর্জি করে তুলতে পারে তো—কে? আরে! আসুন আসুন।

মোহিত পায়েসের বাটি দুটো এগিয়ে দিল পুটুর দিকে—ওদের জন্যে পাঠিয়ে দিল উর্মি।

॥ ৭ ॥

ভোরবেলায় এখন হিম পড়ার শুরু। শেষরাতের অন্ধকার মুছে যখন এ তল্লাট আলোয় ফুটে ওঠে—ক্লাব মাঠ—পুলিশ লাইন—গেরস্থপাড়া হাসতে হাসতে জেগে ওঠে—মোহিতের মনটা আনন্দে ভরে যায়। যাক বাবা—অন্ধকার তো গেল।

পাড়ার সম্পন্ন স্যাকরা, কৃতি প্রাইভেট টিউটর, সিদ্ধ মকরধ্বজের কারবারি—আরও আরও অনেকে হাওয়াই চপ্পল পায়ে লুঙ্গি পরে বেরিয়ে পড়ে। মুখে ফেনা মাখানো টুথব্রাশ—হাতে চেনবাঁধা কুকুর। বেশির ভাগই গৃহপালিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিশি। তেজিয়া তেজি অঙ্গভঙ্গি।

ভালো ঘুম, নিশ্চিন্ত আয়, পেট খোলসা করা এই সব মানুষ মন দিয়ে রাস্তার গায়ে ঘাসের ওপর কুকুরের পেট খোলসা করায়—তার-পর হকার এলেই তারা কাগজের জন্যে ছুটে যায়।

রবি আর হিমি ঝিলপাড় ধরে জলের কিনারায় গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এল। মোহিত ওদের নিয়ে পাড়ারই আর পাঁচজন গেরস্থ হতে গেল।

সে পাতলা লুঙ্গি পরেছে। পায়ে হাওয়াই। মুখে সফেন টুথব্রাশ। তবে রবি আর হিমিকে আর চেন দিয়ে বাঁধা লাগে না। তারা কথা

শোনে। চেনে বাঁধা থাকলে—মোহিতের আশঙ্কা—রবি আর হিমি এমন হ্যাঁচকা টানই দিতে পারে– যাতে কি না হড়কে গিয়ে তার লুঙ্গি খুলে পড়তে পারে। আসলে গায়ের জোরে ওরা প্রায় একজোড়া বাছুর।

পাড়ারই একজন পাকা—বনেদি বাসিন্দার কায়দায় তার ঠোঁট দিয়ে টুথপেস্টের ফেনা গড়াতে লাগল। হাওয়াই চটি পায়ে সে ফটফট করে রবি আর হিমির পেছন পেছন টিউবয়েল অব্দি ছুটে গেল। পরনে ঝ্যালঝেলে লুঙ্গি। গায়ে ছোট হাত কাটা শার্ট। পাড়ার মোড়ে ভোরের পয়লা হকার ভেসে উঠল তার সাইকেলে। রাস্তার এখানে ওখানে চেনে বাঁধা কুকুর নিয়ে সব গেরস্থ। কয়েক বাড়ির সামনে কাজের লোক মোটর গাড়ি ধুচ্ছে।

মোহিত এই পাড়ারই একজন হবার জন্যে যেই না রবি আর হিমিকে নিয়ে রাস্তায় বেরল—অমনি দিশি কুকুরগুলো জোট বেঁধে রবি আর হিমিকে ঘিরে ফেলল। প্রবল ঘেউঘেউ। তার ভেতর নিজের জাতের গাম্ভীর্য বজায় রেখে কায়দায় রবি তেড়ে গেল। পেছনে পেছনে হিমিও। সে এক প্রবল ঘেউঘেউ।

শুধু হাতে সামাল দিতে গিয়ে মোহিতের মুখ দিয়ে টুথব্রাশ খসে পড়ল। জামায়-টুথপেস্টের ফোঁটা। লুঙ্গি আলগা। তার ভেতরেই রবি এক বনেদি গেহস্থকে ভয় দেখাবার জন্য ক্যাঁক করে কামড়াবার ভান করল। ভদ্রলোক হাতে ছড়ি দিয়ে রবিকে এক ঘা বসাতে যাওয়ায় এই কাণ্ড!

সেই গেরস্থ সঙ্গে আর চার গেরস্থ জুড়ে প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আভি এ কুকুর তাড়াতে হবে। মানুষ কামড়াবার ট্রায়াল দিচ্ছেন নাকি?

সকালবেলা এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। মোহিত মিউমিউ করে বলল, ও তো কামড়ায় নি। আপনি শুধু শুধু মারতে গেলেন কেন?

শুধু শুধু? এই দেখুন লুঙ্গি ছিঁড়ে দিয়েছে—

মোহিত বলল, মেরেছেন বলেই তো—

দূর মশাই—বলে এমন করেই তাকাল পাড়ার স্যাকরা ভদ্রলোক—যাতে পুরো ভোরবেলটাই মোহিতের মনের ভেতর একদম মরে গেল। অথচ ভোরবেলাই এতক্ষণ ঝলমল করছিল। সে রবি আর হিমিকে দাবড়ে নিয়ে বাড়ি ঢুকে এল। ঢুকতে ঢুকতেই ডাকল, ও উর্মি—উর্মি—

কোনো কথা না বলে উর্মি চা ছাঁকছিল। সেই ফাঁকে সে রবি আর হিমিকে দুখানা বিস্কুট এগিয়ে দিল।

ওদের লাফিয়ে খেতে দেখে মোহিত জ্বলে গেল। আমি একাই সব ঝক্কি-পোহাব?

উর্মি কোনো জবাব দিল না।

এই তো একটু আগে সারা পাড়ার ভদ্দরলোকরা মারমুখো হয়ে—

সেকথায় একদম না গিয়ে উর্মি শান্ত চোখে তাকাল। তোমার টুথব্রাশ কোথায়। যাও মুখ ধুয়ে এসো। এ বয়সে খোকাপনা মানায় না তোমায়—

সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম।

আমি কিছু শুনব না। যাও মুখ ধুয়ে এসো।

আমি মুখ ধোব না।

বেশ। পেস্ট মুখে দিয়ে চা খাও। আমার কী!

এ সংসারে কিছুতেই তোমার কিছু নয়। সকালবেলা ওদের নিয়ে একটু হেঁটে এলে পারো। তোমারও তো হাঁটা দরকার। না হাঁটলে রবি হিমিরও শরীর খারাপ হবে—

চা এগিয়ে দিয়ে মোহিতের চোখে তাকিয়ে উর্মি বলল, আমার বয়স আন্দাজে ঠিক আছি। তুমি বরং তোমার কুকুরদের নিয়ে ক্লাবমাঠে দৌড়োদৌড়ি কর। তাহলে যদি তোমার কমে—

রবি হিমি তোমার নয়।

না। আগেরবার কুকুর মারা যাবার পর ওসব উৎপাত ফের ঘরে আনতে বারণ করেছিলাম কি না?

কুকুর কুকুর করছো কেন?

কী বলব ?

ওদের তো নাম আছে। তোমার ছেলেরা ভালোবাসে বলেই না ওদের আনা উর্মি—

এখন ছেলেরা বড় হয়েছে। বিয়ে করবে কদিন বাদে। এখন আবার ওসব আনা কেন ?

আমার আনা রবি হিমি, তোমার নয় ?

না।

এ সংসার তোমার নয় ?

না।

তার মানে ?

খুব সহজ মানে। একসময় তোমার ছেলেদের পেটে ধরেছি। তারা বড় হয়ে গেছে। চাকরিতে বসেছে। এখন আমি ঝাড়া হাত-পা একজন আলাদা মানুষ। এখন আর আমি কোনো দায়বন্ধনে যাব না।

মোহিত দেখল সকালবেলাতেই তার মনের ভেতরটা ফাঁকা হল ঘর হয়ে যাচ্ছে। যেখানে শুধু আগন্তুকরা আসে। কেউ কারও না। এই বিষম পৃথিবীটা এখন মাঝে মাঝে তার মনের ভেতর উঁকি দেয়। জন্মে—বড় হয়ে—বিয়ে করে—বাবা হয়ে—বুড়ো হওয়ার দিকে সে এখন রওনা দিয়েছে। ঠিক এই সময়টায় সে টের পাচ্ছে—এই যে এতদিন ধরে উর্মির সঙ্গে থাকা—ওকে দুই ছেলের মা বানানো—সবই কেমন আলগা। যেমন কি না— তার এখন ঘোর সন্দেহ—এই এতদিনকার থাকাথাকি ভেতরে-ভেতরে অনেকদিন ধরেই ফাঁপা-ফাঁকা হতে শুরু করে দিয়েছিল—শুধু সে-ই টের পায় নি।

নয়তো এমন করে বলতে পারে উর্মি ?

এসব বুঝতে পেরে রাগ হচ্ছে না—দুঃখ হচ্ছে না—আনন্দও হচ্ছে না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ভেতরটা। অথচ বাড়িভাড়া, বাজার, ধোপা সামলাতে গিয়ে—ছেলেদের পড়াশুনো-টিফিনের খরচা যোগাতে গিয়ে অফিসের পরেও কাজ এনে বাড়িতে বসে টায়ারের

জুৎসই ক্যাপশন লিখে সে কবিতার ব্যাপারটাই আরও—আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

এই দু বাটি পায়েস ও বাড়িতে একবার দিয়ে আসবে—

লেবু আর আলুর এখন উঠতি বয়স। ওরা কেন পায়েস ভালোবাসবে ?

দিয়েই এসো না। কাল সন্ধেবেলা একটু ভালো গোবিন্দভোগ এনে বানালাম।

কাল বানিয়েছো ? বাসি জিনিস পাঠাবে ?

বাসি ওরা ভালোবাসে দিয়ে আসবে ?

যাচ্ছি। বলে মোহিত পেস্টঘষা মুখ ধুতে গেল। ঢেকে রাখা চা নিশ্চয় এতক্ষণে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। তার আর ইচ্ছে হল না—উর্মিকে বলবে—আরেক কাপ চা করবে ?

॥ ৮ ॥

এতকাল মোহিত অফিসে বড় বড় অ্যাকাউন্ট হ্যাণ্ডেল করে এসেছে। যেমন নারকেল তেলের বাজারে লিডার হল গিয়ে শান্তি কোকোনাট। শুধু ইস্টার্ন ইণ্ডিয়াতেই মানুষ বছরে দুশো কোটি টাকার শান্তি কোকোনাট অয়েল মাথায় মাখে। শান্তি ছাড়াও তিনটে বড় বড় গুঁড়ো মশলার অ্যাকাউন্ট আজ দশ বছরের ওপর মোহিত দেখে আসছে। ছোট থেকে এদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গী মোহিত। স্লোগান, ক্যাপশন, আর্টওয়ার্ক, মিডিয়া স্পেশ এমনকি অ্যাড ফিল্ম—সবই এতদিন মোহিতের হাত দিয়ে হয়ে এসেছে।

ইদানীং সে অফিসে গিয়ে লক্ষ্য করছে—নামী দামি অ্যাকাউন্ট সবই তার হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার বদলে খুদে খুদে সব গেঞ্জি আণ্ডারঅয়ারের অ্যাকাউন্ট তার টেবিলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

ময়দানের উল্টোদিকে আটতলায় তার বসার ঘর। নাইনথ

ফ্লোরের সবটা নিয়েই এই অল ইণ্ডিয়া বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের একজিকিউটিভদের বসবার জায়গা। পাশের ঘরেই বসে কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেণ্ট দীনু সরকার। তার সঙ্গে পঁচিশ বছরের ওপর চাকরি করে আসছে মোহিত। সুইং ডোর ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে দীনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারত—এভাবে আমায় অপমান করার মানে? আমি এখনো তো কাজটা জানি। এখনো আমি প্রোডাক্ট মার্কেটিঙের মিরাকেল্ ঘটিয়ে দিতে পারি—যেমন দিতাম—আজ থেকে দশ বছর আগে।

সেসব কিছুই না করে মোহিত মুখোপাধ্যায় প্রায় নব্বই ফুট উঁচু থেকে দেখল—এ বছরের মতো বর্ষা আর ময়দানে আসবে না। যাবার আগে সারা ময়দানের ঘাসের ডগা টেনে লম্বা করে রেখে গেছে। নেশায় পাওয়া ঘেসুড়েরা হুমড়ি খেয়ে ঘাস কেটে চলেছে। তাদের সঙ্গে বস্তাগুলোর পেট ফুলে উঠল একে একে। এখান থেকে সব দেখতে পায় মোহিত।

সেই মোহিতই বাড়ি ফিরে দেখল, তার জানলার সামনে ঝিলের কিনারায় দাঁড়ানো ডুমুর গাছটার সব ডুমুর পেকে হলুদ। তাতে উচ্ছল—ভয়ঙ্কর খুশি কয়েকটা পাখি।

ভেসে উঠলেই গেঁথে ফেলবে বলে ··কোচ হাতে কয়েকজন ধ্যানী মাছমারা···পরনে লেংটি ··সারা গা ভিজে।···ঝিলের গা ধরে এরাও নেশায় পাওয়া মানুষের মতো হাঁটা চলা করছে।

ঊর্মি চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে নিজের কাপে মুখ দিল। কোনো কথা বলল না। ট্রাম রাস্তা থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে পৃথিবী এখানে এত শান্ত, স্থির···পাখিদের সুবিধের জন্যে এখানে গাছে ডুমুর পেকে থাকে···ঝিল থেকে চান সেরে এক পাল মোষ ক্লাব মাঠে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়ে ফিরছে···শীতের আগাম হিম বাতাসের ডগায়।

মোহিত বুঝল, তার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। থাকলে সে অস্থির হয়ে উঠত।

সে আরও বুঝল, তার আর চাওয়ার কিছু নেই। সব বোধ হয় চাওয়া হয়ে গেছে। নইলে নিশ্চয় সে টাকার জন্যে ভাবত। খাবারের কথা তার মনে উসখুস করত। জামা কাপড়ের ভাবনা মাথায় আসত। উর্মিকে তার এখনও রীতিমত সুন্দরী লাগে। আর কোনো মেয়েকে দেখে সে বহুকাল কোনোরকম উতলা হয় নি। মরতে হবে জেনেও তার কোনো ভয় আসে না। অনেক দিন এখানে থেকে যাওয়ার কোনো প্রবল বাসনাও তাকে টানে না।

একবার শীতে অনেকদিন আগে ঝুমকায় বেড়াতে গিয়ে যে-বাড়িতে উঠেছিল···তাদের ঘরের র‍্যাক থেকে একখানা ইংরাজি উপন্যাস নামিয়ে পড়েছিল। সামনে পেছনে অনেকগুলো পাতা মিসিং। বইটার নাম ডেথ অব ডিজায়ার।

মাঝখান থেকে পড়েছিল মোহিত। একটা লোকের জীবনে অল্প বয়সেই অনেক কিছু আপনাআপনি হেঁটে তার কাছে চলে আসে। তারপর একদিন সে দেখল··তার স্বাস্থ্য আছে, শরীর আছে, জোর আছে···কিন্তু কোনো ইচ্ছে নেই। বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। মরে যাওয়াও ইচ্ছে নেই। অথচ সে একজন মানুষ। পাথর নয়। হাত পা আছে। সে চলে ফিরে বেড়াতে পারে। উঃ! সে যে কী যন্ত্রণার। চোখ খুলে থাকা যায় না। আবার চোখ বুজেও থাকা যায় না। এর চেয়ে কোনো পার্টির ক্যাডার কিংবা হোলটাইমার হয়ে যাওয়া কত নিশ্চিতের। হতে পারলে···সামনে একটা আদর্শ থাকে—থাকে একটা টার্গেট। বলা যায়—যুগ যুগ জিয়ো। অমুকের অমুক—আমার অমুক—বলতে তখন একটুও আটকায় না। তখন একটা গরু দেড় মন দুধ দিলে কত আনন্দ হয়। একদম যেন কুয়াশার ভেতর কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া খুঁজে পাওয়ার আনন্দ।

আরেকটু লিকার আছে। দেব?

না।

ঠিক তো? বলে লিকারটুকু নিজের কাপে ঢেলে নিল উর্মি।

তুমি এবার থেকে যেসব ফিল্মশোয়ে যাবে—এমনকী মিস ক্যালকাটা কনটেস্টেও যদি যাও তো লেবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কেন? বিউটি শোয়ে গিয়ে অতটুকু ছেলে কী করবে?

ওর বয়সী ছোট ছোট সুন্দরী মেয়ে দেখলে ছেলেটা নিজের ভুল বুঝতে পারবে। এমনভাবেই বেঁধেছে ছেলেটাকে—সব সময়েই দেখি ওখানে পড়ে থাকে!

আমিও তো প্রায় তিরিশ বছর তোমার কাছে বাঁধা পড়ে আছি।

যাও না যেখানে ইচ্ছে! কে পড়ে থাকতে বলেছে?

সারাটা জীবন কারও না কারও বেগার খাটছি ঊর্মি। নিজের কোনো ইচ্ছে নেই। কখনো নিয়মের চাকর। কখনো ফ্যামিলির। রেলের কামরায় বসে লাইনের গায়ে যেসব অচেনা রাস্তা দেখি—কবে যে তার একটা ধরে যেদিকে ইচ্ছে চলে যেতে পারব।

ভাবের কথা রাখো। অমন সুন্দর ছেলেটি—ওর মোহভঙ্গ হওয়া দরকার।

প্রফুল্লবাবু সেদিন কী বলছিলেন জানো?

কী?

লেবু থেকে সাবধানে থাকবেন। একজন পাকা অভিনেতা আমার ছেলেটি। এমন করে আপনাকে কবজা করবে—দেখবেন—কখন আপনিই ওর ইচ্ছে মতো চলছেন!

ভীষণ মায়াবি মুখখানা লেবুর।

কিছু না বলে মোহিত ঊর্মির মুখে তাকিয়ে থাকল। ঊর্মি চায়ের বাসন তুলতে তুলতে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ওমা! এ যে দেখাছ নন্দা। একা একা আসতে পারলি?

দামী মিডিপরা নন্দা এক লাফে বারান্দায় উঠে এল, এইটে পড়ি। এখনো একা বেরতে পারব না!

নিজের ভাগনির দিকে তাকিয়ে মোহিত বলল, ডায়েটিং করছিস নিশ্চয়। দারুণ স্লিম হয়ে গেছিস তো।

মোহিতের পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসল নন্দা। এই বয়সের

অ্যাভারেজ মেয়ের চেয়ে অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা। পাশেও ছিল সেই পরিমাণে মোটা। মোহিতের বোনের একটিই মেয়ে। আর কোনো বাচ্চা নেই। ছোটবেলা থেকে খাওয়া-দাওয়া—আদরে বেঢপ বেড়ে উঠছিল।

বসেই নন্দা বলল, উনিশ পাউণ্ড স্ল্যাশ করে দিলাম।

ওমা! কত কথা শিখেছিস তুই। কত বয়স হল?

গেস্।

নন্দার একথায় অবাক হয়ে তার মুখে তাকাল মোহিত। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে নন্দাকে। তোর আর কত! এই দশ বারো।

উঁহু। আমি আর সেই ছোটটি নেই বাবা। রানিং ফোর্টিন।

একদম শকুন্তলার বয়স।

বাঃ! তোমার নতুন বাড়ির সামনে তো ফুল ফোটে বেশ। বলতে বলতে নন্দা উঠে গিয়ে ডুমুর গাছের গায়ে অযত্নে গজিয়ে ওঠা নাম-না-জানা-গাছ থেকে তিন চারটে হলদে ফুল পাড়ল। পাড়তে পাড়তে বিকেলবেলার ঝিলের জলে নিজের ছায়া দেখতে পেয়ে হাততালি দিয়ে উঠল, কী সুইট মামা! ছাখো ছাখো···জলে আমারই ছায়া···

বেশি ঝুঁকে পোড়ো না। পা শ্লিপ করে জলে পড়বে। চলে এস···

তখনই এল না নন্দা। বারান্দায় উঠে আসবে বলে একটু পরেই নন্দা ঝিলের পাড়ে সবুজ ছোট্ট মাঠটায় ঘুরে দাঁড়াল। আর অমনি মোহিতের চোখে সারা তল্লাট···ঝিলের তিরতির করা জল · ক্লাব-বাড়ির চিমনি, টালির কটেজ ধাঁচের ছাদ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। এরই নাম তাহলে সুন্দর? একেই বলে বসন্ত? কোথায় গেল তার মনের ভেতরকার ফাঁকা ফাঁকা ভাব!

বর্ষায় যেভাবে সাদা ফুল হেসে ওঠে···ঠিক তেমনি বিকেলের আলোয় চান করে ওঠা ওই ঝিলেরই কোনো পরী যেন নন্দা। হাতে এখন তার কয়েকগুছি হলুদ ফুল। কথা বলতে বলতেই ওপরে উঠে আসছিল নন্দা।

জানো মামা···আমি এখন ওয়াশের কাজ শিখেছি।

ছবি আঁকা ছাড়িস নি তাহলে···ভালো।

অনেক পাহাড় আঁকছি এখন।

পাহাড় দেখলি কোথায়?

কোথাও না। ঘুমোলেই স্বপ্নের ভেতর পাহাড় আসে আমার···

নন্দার কথা তখনো শেষ হয় নি। লোহার গেট শব্দ করে খুলল লেবু। আমায় ডেকেছিলে? মা বলেছিল···

কে? লেবু। এসো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার ভাগ্নির। দারুণ নাচে—

ছিঃ! মামা—নিজেদের প্রশংসা করতে নেই।

লেবু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তাই বুঝি! তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি নাচো— নইলে এমন ফিগার হয় না।

নন্দা মাথা নিচু করে বলল, থ্যাংক ইউ। এই নিন—

নন্দার হাত থেকে ফুলটা নিয়ে লেবুও বলল, থ্যাংক ইউ।

ঊর্মি ওদের দুজনকেই দেখছিল। জিনসের পায়া দুটো গোটানো। ওপরে একটা সাদা গেঞ্জি। চোখে চশমা। একমাথা কালো চুল। লেবুটা যদি সময়মতো ঠিক ঠিক পড়াশুনো করত—তাহলে কথাটা পাড়া যেত ঠাকুর জামাইয়ের কাছে। যা রাশভারি লোক। বেশ মানাত দুজনকে।

তখন মোহিত বলল, তোমার জন্যে মার্কিন মুলুকের সাহেব দর্জিদের ঠিকানাপত্তর এনেছি। ওদেশে ফ্যাশন ডিজাইনে তিন বছরের ডিপ্লোমা আছে···

তাই বুঝি? তোমার কাছে সব রাখো। আমি অন্য সময় এসে নিয়ে যাব। আসি ··

মোহিত কিছু বলার আগেই লেবু যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে ছিল নন্দা। লোহার গেট বন্ধ হওয়ার শব্দে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোদ্দ বছরের পুরনো চোখ কেঁপে উঠল।

তা দেখে মোহিত উর্মির মুখে তাকিয়ে হাসল। উর্মি কিছু না বলে দুহাতে নন্দাকে তুলে এনে বেতের চেয়ারটায় বসাল। বল এবার—কী খাবি? কী তোর পছন্দ?

কিচ্ছু না। আমি এখন কিছু খাই না।

কখন খাবি?

সেই রাতে। দুখানা রুটি—আর একটু স্যুপ।

এই করলে তোর শরীর থাকবে?

নন্দা একেবারে অন্য জায়গা থেকে কথা বলল, ভদ্রলোক কোথায় থাকেন?

মোহিত হেসে ফেলল। ভদ্রলোক নয়—যুবক। নাম লেবু। পড়াশুনায় অষ্টরম্ভা। গুণে নুন দেবার জায়গা নেই। স্বয়ং বৃহস্পতি বলতে পারিস।

উর্মি বাধা দিয়ে উঠল, ও কীরকম কথা? রীতিমতো ভালো ছেলে—

তার মানে মামী—আস্ত একটি মাকাল ফল!

নন্দার একথা আরও খারাপ লাগল উর্মির। একসময় খুব ভালো ফুটবল খেলত নাকি। চোখের পাওয়ার বেড়ে যাওয়ায় খেলা ছেড়ে দিয়েছে—

তোমাদের রবি আর হিমিকে তো দেখছি না মামা—

উর্মি চুপ করে থাকল। চুপ করে থাকল মোহিতও।

কী ব্যাপার? ওরা কোথায়? বেড়াতে গেছে?

হ্যাঁ। বলেই চুপ করে গেল মোহিত।

কখন ফিরবে?

ফিরবে না। ওদের বিদায় দিয়েছি।

ক্যানো? কী করেছে ওরা? অ্যাতো সুইট—

কমপ্লেনের ওপর কমপ্লেন। একে কামড়ায়—ওকে দাবড়ায়। শেষে রবিকে বিদায় করেছি কাঠের মিস্ত্রির কাছে—কাঁকুড়গাছিতে—

যেতে রাজী হল?

যায় কী! রিক্‌শা করে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে।

কেমন আছে?

ভালোই নিশ্চয়। মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল, হোল ফ্যামিলির সঙ্গে সকালে রবি মুড়ি খায় পেঁয়াজ দিয়ে—

তা হয় নাকি মামা? মাংস খেয়ে বড় হয়েছে। হিমি কোথায়?

নালিশের পর নালিশ কাঁহাতক শোনা যায় বল? লোম ওড়ে! কামড়ায়! তেড়ে যায়। দিয়েছি ওকে সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটির হেডজমাদারকে। কাছেই থাকে। রাতে এক একদিন হিমির গলার গম্ভীর আওয়াজ পাই। বাজারের মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের কম্পাউণ্ডেই থাকে।

ঠিক করো নি মামা—

আচ্ছা—তুই এই বাংলা শিখলি কোথায়?

কোনটা।

এই যে—মাকাল—

ওঃ! তোমার বোনের মুখে।

ঝিলপাড়ের জানলায় সন্ধ্যা নেমে এল, শীতের এখনও দেরি আছে। তবু দিন ছোট হয়ে এসেছে অনেক। আবার অফিস ফেরত সেই কাঁচা বিকেলের শূন্যটা বিরাট হয়ে মোহিতের সারাটা মন জুড়ে বসল। সামনে যে সে আনন্দের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আর।

ঠিক এই সময়টায় দোতলায় দুর্গা মৌলিকের ঘুম ভাঙে। দুপুরের খাবারদাবার মিটিয়ে একখানা বই হাতে শুতে শুতে বিবিধভারতীর যাত্রার হইহল্লা শেষ হয়ে আসে রোজ।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দুগ্‌গা মৌলিক বলল, ও মোহিত! আজ অনেকদিন পরে তোমার মেসোমশাই যদুবাজারে নিয়ে গিয়েছিল।

সবার সঙ্গে মোহিতও জানে দুগ্‌গা মৌলিক আজ কয়েক বছর হল বিধবা হয়েছেন। তবু উৎসাহ ভরা গলায় মোহিতকে বলতে হল—তাহলে তো অনেক টাকার বাজার করলেন দুজনে—

তা করেছি। আমায় গাড়িতে বসিয়ে রেখে ব্যাগ হাতে সেই যে মাছের বাজারে ঢুকল।

দুর্গা মৌলিকের স্বর্গত স্বামীর দুখানা গাড়ি ছিল। এখন একখানাও নেই। ভাঙা গ্যারাজটাই পড়ে আছে শুধু। সেখানে আপনি গজানো পেল্লাই এক কদম গাছ ছায়া দেয়। শুঁয়োপোকা ছড়ায়।

তাহলে অনেক মাছ কেনা হল বলুন।

কোথায় আর। গাড়ির ভেতরে বসে বসে গরমে সেদ্ধ হচ্ছিলাম। চার কেজি বেনারসি ল্যাংড়া রেখেছি মাথার পেছনে। তা পর্যন্ত গরমে ভেপে গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

কে জি কত করে পড়ল।

দশ টাকার এক পয়সা কম দিল না। গরমে দরজা যেই খুলেছি--অমনি ঘুম ভেঙে গেল। এরপর কথা চালানো যায় না। মোহিত জানে—এখন দুগ্‌গা মৌলিকের মুখে মেঘলা ছায়া।

॥ ৯ ॥

ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের মতো কালার ছবিতে এখন আর এত হেভি মেকআপ লাগে না। আলতো মেকআপ ধুয়ে আয়নায় তাকাল কঙ্কাবতী। টেকনিশিয়ানের হাফ দোতলার এই মেকআপ রুমে কত নামী হিরোইন একসময় মেকআপ নিয়েছে। কঙ্কাবতী বছর পনের আগে একবার ডবল শিফ্‌টে কাজ করার সময় একই দিনে দু-দুবার এই ঘরে মেকআপ নিয়েছিল। সে দিন আর নেই। স্টুডিওর সে অবস্থাও আর নেই।

মাথা আঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দেখল, দু-নম্বর ফ্লোরের সামনে জটলা। তাহলে অম্বরকুমারের শুটিং বোধ হয় প্যাক আপ হল।

যেমন কথা তেমন কাজ। স্কোরিংরুমের সামনে যেখানটায়

কামিনী ফুলের ঝাড়—চাপা গন্ধ, অন্ধকার—ছায়া—সেখানটায় অম্বর-কুমারের গাড়ি দাঁড় করানো। কন্টিনিউইটি রাখার থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সোমেন এসে বলে গেছে—গাড়ি এক করা থাকবে না—আপনি দোর খুলে পেছনে গিয়ে বসে থাকবেন। ড্রাইভার কাছেই থাকবে। আপনি বসলেই চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে—

কঙ্কাবতীর শুটিং ছিল এক নম্বর ফ্লোরে। বাজে ছবি। দিন পাঁচেকের কাজ। দেবে-দিচ্ছি বলে সব পয়সাও দেবে না। লাঞ্চের পর সোমেন এসে অম্বরকুমারের মনের ইচ্ছেটা বলে গেছে তাকে এক ফাঁকে।

এখন টালিগঞ্জে অম্বরকুমারের মনের ইচ্ছেটাই সবচেয়ে বড় জিনিস। নতুন হিরো। কিন্তু পর পর তিনখানা ছবি একদম জ্যাকপট লেগে যাওয়ায় মতি শীল স্ট্রীটের ডিস্ট্রিবিউটররা থলে-ভর্তি টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ফি হপ্তায় অন্তত একখানা করে নতুন ছবির মহরৎ যাচ্ছে অম্বরকুমারের। শুধু সাইড, মানিতেই নতুন ফ্ল্যাট, নতুন গাড়ি, উর্দিপরা ড্রাইভার।

তার মতো ঘষা কপালের গ্যারাজ করা ধাড়ি হিরোইনের ওপর অম্বরকুমারের হঠাৎ কি করে ইন্টারেস্ট হল, তা ভেবেই পাচ্ছিল না কঙ্কাবতী। কাঁপা কাঁপা বুকে সে কোনোরকমে শুটিং শেষ করেছে। শেষের শটটায় মোট তিনটে এন জি গেল।

সাদা ভেলভেট তোয়ালে ঢাকা সিটি থেকে দামি ডেওডেরান্টের চাপা গন্ধ। খুশিতে মনটা ভরে গেল কঙ্কাবতীর। সাউণ্ডলেশ গাড়ি এখন লেকের পাশ দিয়ে ছুটছে। সিটে মাথাটা হেলিয়ে দিল কঙ্কাবতী। এই সেদিন এল লাইনে—এরই ভেতর কী সুন্দর গাড়ি অম্বরকুমারের। হাত দুখানা কী চওড়া। পুরুষের হাতে, গায়ে অমন লোম থাকা কঙ্কাবতীর খুবই পছন্দের! হাসলে ভীষণ ম্যানলি লাগে অম্বরকে। ক্লোজ আপে।

সে জানে না গাড়ি কোথায় যাচ্ছে। তবে নিজের মনটা সে স্থির করে ফেলেছে। অল্প বয়সের ভুলটা আর সে করবে না। অম্বরের

ইচ্ছেই এখন বাংলা সিনেমা। সে ইচ্ছায় সে আজ কিছুতেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অল্প বয়স। সাকসেস মানেই সোনালি। কিছু আবোলতাবোল গোলমালও করতে পারে অম্বর। সেটাই স্বাভাবিক। সেই অস্বাভাবিকের সঙ্গে সে-ও আজ সন্ধ্যায় স্বাভাবিক হয়ে মিশে যেতে চায়।

গাড়ি এসে থামল ক্যামাক স্ট্রীটে। হাই রাইজ বাড়ির লিফ্‌ট অব্দি এগিয়ে দিল ড্রাইভার। নাইনথ্‌ ফ্লোর। তিন নম্বর ফ্ল্যাট—

লিফ্‌টের ভেতর উঠে কঙ্কাবতী জানতে চাইল, কখন আসবেন?

এখুনি এসে যাবেন। দোসানি সাহেবের গাড়িতে আসবেন—

উপর উঠে বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। কাজের লোক মাথা নিচু করে হাসল। বোঝাই যায়—আগে থেকে সব বলা আছে। বিরাট লিভিং স্পেশ। তার মাঝখানে সিলিং থেকে ঝোলানো তিনজনের বসবার মত দোলনা। দোলনার উল্টোদিকে টিভি। টিভি-র পেছনে অন্ধকার শূন্য। সেখানে কলকাতার আকাশ। আবছা আলোর ভেতর ধুলো ভর্তি দলা দলা কুয়াশা।

এমন সুন্দর ফ্ল্যাট—এটাও কি অম্বরকুমার কিনেছে?

ভাবতে ভাবতে দোলনায় বসে পড়ল কঙ্কাবতী। আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগে সে তার পয়লা ছবিতে নামে। ভালো ব্রেকই পেয়েছিল কঙ্কাবতী। কিন্তু তারপর থেকে তার ভাগ্যটা যেন ঘষা কাঁচ। একটুর জন্যে ক্লিক করে না। ছবি করতে আসার এত বছর পরেও আজ সন্ধ্যায় সে একজন ক্যাণ্ডিডেট মাত্র। সাকসেসের রং যে কেন সোনালি আজও তা বুঝে উঠতে পারে নি কঙ্কাবতী।

উর্দি পরা কাজের লোক লম্বা গ্লাসে খাঁটি আপেলের রস দিয়ে সেই যে উধাও হয়েছে আর দেখাই নেই।

দেওয়াল ঘড়িতে যেই নটা বাজল—কঙ্কাবতী উঠে দাঁড়াল। আর বসে থাকা খারাপ দেখায়। সিলিং থেকে ঝোলানো মনোহারি দোলনাটা একা একা দুলছে। কঙ্কাবতী কাউকে না পেয়ে দরজার দিকে এগোল। কিছু না বলেই সে চলে যাবে।

ঠিক এমন সময় বাইরে কলিং বেলে চাপ পড়তেই ঘরের ভেতর পাখির কলধ্বনি। দোর খুলে দিতেই দমকা বাতাস হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল অম্বরকুমার।

নিজেকে যতটা সুন্দর করে তোলা যায়—সেইভাবে দোলনার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে ঢলচোখে তাকাল কঙ্কাবতী। মুখে হাসি।

এ কী? আপনি?

কঙ্কাবতীর কাঁধের হাড়ের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস চলে গেল। অম্বরকুমার রীতিমত অবাক চোখে তাকিয়ে। কঙ্কাবতীর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। সোমেনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন—

ছিঃ! ছিঃ! আপনাকে খবর দিয়ে এনে বসিয়ে রেখেছে? কিছু দিয়েছে? খেয়েছেন কিছু?

হুঁ। অ্যাপেল জুস।—বলতে বলতে কঙ্কাবতী খোলা দরজা দিয়ে একছুটে দাঁড় করানো লিফ্‌টে ঢুকেই দোর টেনে দিল। বোতাম টিপল। সে পরিষ্কার বুঝল, পাতালে নেমে যাচ্ছে। নামতে নামতেই বুঝল, আজকের শুটিংয়ের ছবির নেকু নেকু হিরোইনটিই অম্বরকুমারের নজরে পড়েছে। থার্ড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সোমেনের ভুলেই তার এখানে এসে পড়া। এরপর সে স্টুডিও পাড়ায় কী করে অম্বরকুমারকে মুখ দেখাবে? ভাগ্যি ভালো—এখন তার আর হিরোইন হবার ডাক পড়ে না।

ট্যাক্সিতে উঠে প্রথম যে শব্দটা স্পষ্ট উচ্চারণ করে নিজেকে দু-দুবার শোনাল কঙ্কাবতী—তা হল—লেবু—লেবু—

এই পৃথিবীতে নদী চলে নিজের খাতে। ঘড়ির দোকানের ঘড়িগুলো যে যার পাওয়া দম মাফিক চলতে থাকে। মানুষও তাই। ট্রামবাসও তাই। আমরা আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি মতো ওদের চলাচলের কার্যকারণ সাজাই মাত্র। খুব মধু নাকি এক রকমের তেতো। আবার খুব তেতো এক জায়গায় পৌঁছে মধু হতে থাকে। মোহিতের ইদানীং মনে হয়—সারা পৃথিবীর তেতো মার্কা সব দুঃখ আর মধু মার্কা সুখ রাত হয়ে গেলে অতিকায় কোনো কলে মেড়ে এই

পৃথিবারই বাতাস বানানো হয়। একবার তা বাতাস হয়ে গেলে সব সুখ দুঃখ মুছে শুধু মর্মর বলে একটা জিনিস পড়ে থাকে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরছিল মোহিত। নতুন শীত পড়ছে তাই শার্টের ওপর নীল জিনসের ওয়েস্ট কোট চড়িয়ে কিছুটা আরাম লাগছিল তার। ট্রাম লাইন থেকে পাড়ায় ফিরতে এই রাস্তাটা যেন কোনো স্মৃতিপথ। দু ধারে গাছ। নতুন, হাফ পুরনো, পুরনো পুরনো সব বাড়ি। ঝুলবারান্দা। তাতে মোড়া পেতে বসা অতি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধা। বাড়ির সামনে এসে তিন রাস্তায় ত্র্যহস্পর্শে আজ কোনো দেবদারুর মতো পুটু বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

অফিস ফেরত এই রাস্তাটা হেঁটে আসতে ভালো লাগে মোহিতের। বিকেল যায় নি। লেটার বক্সের ভেতর থেকে একখানা ইনল্যাণ্ড লেটার উঁকি দিচ্ছে। কার চিঠি?

খুলে পড়তে গিয়ে অবাক হল মোহিত। এ হাতের লেখা তো সে চেনে না। চিঠির শুরু, ঠিকানা—সবই ভুলভাল বানানে—

মাননিয় বাবু,

অত্র পত্রে আপনাকে একটি দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হইতেছি। রাব আর নাই।

চোখ তুলে তাকাল মোহিত। সারা পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে এখনো আলো জ্বলে ওঠে নি। রবি মানে হিমির জুড়ি—সেই রবি আর নেই। এ তাহলে কাঠের মিস্ত্রির চিঠি।

রবির হার্ট অ্যাটক হইয়াছিল। আচমকা স্ট্রোকে তাহার পক্ষঘাত হয়। ইদানীং ভীষণ মোটা হইয়া পড়িয়াছিল। হাঁটা চলা কমিয়া আসিয়াছিল।

মনে মনে গালাগালি দিয়ে উঠল মোহিত। গুচ্ছের মুড়ি খাওয়াও। আরেকটু ভাত খাওয়াও।

সারারাত এক জায়গায় বসিয়া জাগিয়া থাকিয়া পাহারা দিত। গলার স্বর ভীষণ গম্ভীর হইয়া যায়। একদিন বিকট ডাকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে থাকে। সে কাঁপুনি আর থামে না। ডাক্তার

ডাকিয়া আনিলে তিনি দেখিয়া বলিলেন—স্ট্রোক। প্যারালিসিস হইয়াছে। ঘাড়ের কাছে রক্ত দলা পাকাইয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পরে ভ্যান রিক্সায় করিয়া পশু হাসপাতালে লইয়া যাই। উহারা অপারেশন করিলেন। কিন্তু রবির আর জ্ঞান ফিরে নাই। দু-দিন হইল খালপাড়ে তার দাহ সম্পন্ন করিয়াছি। অল্পদিনে সে আমাদের মায়ায় জড়াইয়া দিয়া গেল। ইতি—

আপনাদের কাঠের মিস্ত্রি
নিত্যানন্দ সূত্রধর

চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখল মোহিত। তার আর বাড়ি ঢোকা হল না। ঝিলের গা ধরে ক্লাব মাঠের দেওয়াল ঘেঁষে নির্জন রাস্তাটায় গিয়ে পড়ল মোহিত। রবি যখন কয়েকদিন শিশু—তখন বড় মগ্ন চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাত সে। পশুজন্ম যে কত কষ্টের তা সে জানত না। তখন হিমির সঙ্গে ওকেও উর্মি গ্ল্যাকসো খাওয়াত। উর্মিই ওদের মা তখন। কোল ছাড়িয়ে আনা বাচ্চাদের না দেখে ওদের আসল মা নাকি রাগে একটা কার্পেটের পুরো কাগজ চিবিয়ে ফর্দাফাই করে দেয়।

এ রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে দূরের প্রান্ত দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে মোহিতের বড় আশা হল—এখন যদি রবি তাগড়া শরীরে ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসে তো তাকে কোলে করে বাড়ি নিয়ে যাবে।

দেওয়ালের ভেতর দিককার গা ঘেঁষে সাহেবরা ক্লাব মাঠে ছায়াছড়ানো সব গাছ বসিয়েছিল কবে। তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। পনের ষোলতলা সাত আটটা সদ্য তৈরি খালি বাড়ি আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে। রাস্তার উল্টোদিকে ফাঁকা ফাঁকা বসতি। মুদিখানা। ছাদে পোলট্রি।

এক জায়গায় এসে একটা ভাঙা গেট পড়ল। মস্ত উঠোনে নানান গাছ। ফাঁকা বাড়ি। জানলা দরজা নেই। বাড়িটার গায়ে সাদা পাথরে লেখা 'কার্তিক ভবন'।

এই তাহলে খুনে কার্তিক মজুমদারের বাড়ি! উঠোনটা ঝুপসি জঙ্গলে ভর্তি। ঘাসে পা ডুবে যাবে। গরুরাও বোধ হয় ঢোকে না। গেটের একটা পাল্লা নেই।

কার্তিক মজুমদারের উঠোন বা লনে বটের বাঁধানো চাতালের ফাটলে বুড়ি তখন বুড়োকে বলল, জায়গা পাল্টালে ভালো! একটু জল নেই এখানে। শান বাঁধানো চাতাল তো সারাদিন রোদ খেয়ে আগুন। কোথায় একটু গা রাখি বল তো?

চুপ বুড়ি। আবার মানুষ—ওই দ্যাখো—

আমি ভালো দেখি নে চোখে। তুমি দেখে বল।

এই ভর বিকেলে মানুষের বাড়ির বউ যেন এখানে? গলায় দড়ি দিতে আসে নি তো। তাহলে তো মস্ত হ্যাঙ্গামা হুজ্জোত চলবে সারা তল্লাট জুড়ে।

ওগো। বিষে আমার মাথা টনটন করছে। দিই ছুবলে—বিষও নেমে যাবে'খন।

না না। ওসব কেলেঙ্কারিতে যেও নি। সে বয়স আর আমাদের নেই। ওঝা ডেকে ধরপাকড় জুড়ে দিতে পারে শেষে।

না গো! ছোবলাব আর পিছলে যাব। চাতালের এমন ফাটলে ঢুকব—কেউ বের করতে পারবে না।

শেষে যদি গরম জল গড়িয়ে দেয়। মনে আছে—ক্লাব মাঠে এক মেমকে ছুবলে কী বিপত্তি ডেকে এনেছিলে—

তা আর মনে নেই! খুব বাঁচা বেঁচে যাই সেবারে। কিন্তু মেয়েটা তো গলায় দড়ি দেবেই। অনেকক্ষণ ছটফটাবে। তার চেয়ে অল্পে নিকেশ করে দিই না।

না গো না। আমাদের কী দরকার। আমরা এসেছি বাসা বদল করে। বেশি নাড়াচাড়া করলে বটগাছের কোটর থেকে গুচ্ছের কাক বেরিয়ে এসে কা কা জুড়ে দেবে। ওদের কিন্তু কেউ থামাতে পারবে না। সেটা মনে রেখো। চাই কি ঠোকরাতে নেমে আসতে পারে।

পায়ের স্যাণ্ডেল চওড়া পাতির ঘন ঘাসে পিছলে যাচ্ছিল পুটুর। চোর কাঁটায় সায়ার লেস জটাঘটি পাকিয়ে একশেষ। তবু সে মরিয়া হয়ে ভাঙা চাতালটায় ঠেলে উঠল। আকাশের প্রথম জ্যোৎস্না এসে অন্ধকার সামান্য ফিকে করতে পারল।

আর অমনি মোহিত দেখতে পেয়ে ঘাস, অন্ধকার সব মাড়িয়ে ছুটে এল। এ কী? এখানে?—বলেই সে চাতালে উঠে এল।

পুটু বটগাছের ঝুরি ধরে টাল রেখে গাছটার দিকে এগোচ্ছিল। এমন ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় ফাঁকা বাগানে আরেকজন মানুষ এগিয়ে আসতেই পুটু দাঁড়িয়ে গেল। কে?

আমি মোহিত। আপনি এই ভূতের বাগানে কী করছেন? জঙ্গলের ভেতর? চলুন—নামুন বলছি—চাদ্দিকে সাপখোপ—আসুন বলছি।

কেমন একটা সন্দেহ পাকিয়ে উঠল মোহিতের মনে। এ কি ভূতে পাওয়া গলা পুটুর। কিছু ভর করে নি তো প্রফুল্ল দত্তর বউয়ের ঘাড়ে? নইলে এই ভরসন্ধ্যেবেলা খুনে বাড়ির বাগানে কেউ ঢোকে? তাও একদম ফাটাচটা বট-চাতালে? কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কেন এখানে?

গোঁজ হয়ে দাঁড়ানো পুটু বলল, আপনি যান। আমার একটা কাজ আছে এখানে।

পুটুর কাঁধ থেকে র‍্যাপার খসে পড়ে গেল। সেটা তুলে দিল মোহিত। চলুন। কাজ থাকলে দিনের বেলা আসবেন। লেবু আলুকে সঙ্গে নিয়ে—

কেন আপনি বাধা দিচ্ছেন? আমি কি পাগল হয়ে যাব—বলতে বলতে পুটুর গলা বুজে এল।

বোধহয় পড়ে যেতে পারে ভেবেই মোহিত দু হাতে শক্ত করে ধরল। চলুন বলছি। আমি কোনো কথা শুনব না তোমার—

আঃ। ছাড়ুন।

না।—বলেই প্রায় হিড়হিড় করে পুটুকে টেনে রাস্তায় এনে

তুলল মোহিত। তুমি পাগল হয়ে গ্যাছো পুটু। এই অলুক্ষুণে বাড়ির অন্ধকার বাগানে তোমার কোনো কাজ থাকতে পারে না।

কথা বলছিল মোহিত—আর হাঁপাচ্ছিল। পুটুর র‍্যাপার আবার খসে পড়ে যেতে তুলে দিল কাঁধে। রাস্তায় কোনো লোক নেই। ক্লাবের মাঠের অল্প উঁচু আকাশে গোল হলুদ চাঁদ। পুটুর বড় বড় নিশ্বাসে তার গা দিয়ে বেরনো হালকা স্নোর গন্ধ গাছপালার কটু গন্ধে মিশে হারিয়ে যাচ্ছিল।

পুটু এবারে প্রায় ডুকরে উঠল। কেন আমায় নিয়ে এলেন? কেন বাধা দিলেন?

মানে?

আমি কি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারব না?

কী হয়েছে পুটু?

মোহিতের এই শান্ত গলায় কাজ হল। ক্লাব মাঠের ভেতর থেকে বর্ষার জল নিকাশের জন্যে রাস্তার তলা দিয়ে বড় নালা। তার ওপর ঢালাই স্ল্যাব। স্ল্যাবের দু ধারে চওড়া করে ইটের গাঁথুনি—যাতে কিনা রিক্‌শা, সাইকেল, মানুষ অন্ধকারে না নালায় পড়ে যায়। তারই একটায় বসল পুটু।

আপনি জানেন না? লেবু সারাদিন কঙ্কাবতীর বাড়ি পড়ে থাকে—

শুনেছি।

আমি মা হয়ে আর কত দেখব?

মোহিতের খেয়াল নেই। সে তুমি তুমি করেই বলতে থাকল। তোমরা কীরকম বাবা মা? সাবধান হও নি কেন?

কত সাবধান হব বলতে পারেন? লেবুর যে কী মোহ—

প্রফুল্লবাবু কিছু বলেন না?

বিরক্ত হয়ে বলা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি মা হয়ে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি নে—

তাই বলে ভরসন্ধেবেলা কার্তিক ভবনের পড়ো বটতলায়?

জ্যোৎস্না এসে রাস্তায় পড়েছে। আশপাশের বাড়ির কলাবাগানেও জ্যোৎস্না। পুটু চোখ নামিয়ে নিল। কাজটা কঠিন। কিন্তু আমাকে করতেই হবে।

কী সে কাজ?

কী? বলে মুখ তুলল পুটু। এ রাস্তা নির্জন—তবে কাছেপিঠেই মানুষজনের বাড়ি। গাঢ় চোখ। টেনে বাঁধা চুল। মাথায় শাড়ির আঁচল। বাতাসে শীত। পুটুর চোখ যেন জ্বলে উঠল একবার। লেবুর মোহ আমি ভাঙবই।

বেশ তো। তাই বলে সন্ধেরাতে পোড়োবাড়ির বাগানে! সাপেও তো কামড়াতে পারত তোমায়—

তাই ভালো ছিল।

না। ভালো ছিল না পুটু। আজ হোক কাল হোক লেবুর মোহ ভাঙবেই। তাই পৃথিবীর ধর্ম। কঙ্কাবতী তো অনেক বড় লেবুর চেয়ে—

অনেক। আর কত দেরি বলুন তো লেবুর মোহ ভাঙতে? আমি তো আর পারছি নে—

বেশ। তবে কথা দিচ্ছি। লেবু যাতে কাটিয়ে ওঠে তার চেষ্টা করব পুটু।

দেখুন যদি পারেন—

লেবুকে তার বয়সের স্বাভাবিক রাস্তাতেই ফিরিয়ে আনা দরকার।

আমিও তো সেজন্যে আমবাগানের ভেতর বটগাছে—

আমবাগান তো দেখছি নষ্ট হয়ে গেছে কার্তিক মজুমদারের। পোড়ো হয়ে আছে জায়গাটা কতদিন। কিন্তু বটগাছটারই যেন পসার—চাদ্দিকে কত ঝুরি! তুমি ঝুরি ধরে উঠেছিলে কেন পুটু?

পুটু ক্যালভার্ট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মোহিতের মুখে সোজাসুজি তাকাল। তারপর একটু এগিয়ে এসে বলল, কেন?

মোহিত চমকে উঠল। পুটুর আবার সেই ভর হওয়া গলা। চোখে কোনো পলক পড়ছে না। দূরে লাইটপোস্টে আলো জ্বলে

উঠেছে। রাস্তার বাঁকে গাছপালার ভেতর বেঁটে মতো মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা। ষোল সতের তলা খালি বাড়িগুলোর মাথা এখন চাঁদের আলোয় একদম ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। যেন আর বড় কোনো কার্তিক মজুমদারের বাড়ি ওগুলো।

পুটু বলল, আজ মঙ্গলবার—পূর্ণিমা—

তা হবে। তাই এত জ্যোৎস্না।—বলেও পুটুর মুখে তাকাতে পারল না মোহিত।

কোনো আমবাগানের ভেতর যদি কোনো বটগাছের সন্ধান পান—ঐ বটগাছে যদি কোনো কাকের বাসা থাকে—তবে মঙ্গলবার পূর্ণিমার রাতে কাকের বাসা থেকে একটি কাক ধরে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিচে নেমে আসুন। ঘরে ফেরা অব্দি কাকটাকে বুকেই লাগিয়ে রাখবেন—

তাহলে ঝুরি ধরে বটগাছে উঠে কাক ধরতে যাচ্ছিলে—

হুঁ। দিনের বেলা এসে কাকের বাসা দেখে গেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যতটা দেখা যায়।

এসব তুমি কী বলছ পুটু ?

ঠিকই বলছি—বলে বুকের ভেতর থেকে কী একটা বের করে সটান মোহিতের মুখের সামনে মেলে ধরল পুটু।

চমকে উঠল মোহিত। পুটুর কাঁধ থেকে র‍্যাপার আবার ঝুলে পড়েছে। মাথায় আঁচল নেই। চোখ জোড়া একসঙ্গে জ্বলে উঠল। পড়ে দেখুন—

॥ ১০ ॥

দুর্গা মৌলিকের সঙ্গে সারাটা সকাল জুড়ে দর কষল লোকটা। দুর্গার এক কথা—শেকড় ওপড়ানো চলবে না।

না। ওপড়াব না। একদম মাটি সই সই করাত চালাব। তবে ওটা দুশো করুন মা। তিনখানা লোক—একখানা করাত ভাড়া—

বুঝে দেখুন—আসলে করাত ধরে চার চারটে লোকের মজুরি—

যাঃ! দিলাম ছেড়ে। দুশোই দাও। তবে এখুনি দিতে হবে।

লোকটি টাকা গুণে দিতে দুর্গা মৌলিক জানতে চাইল, এতবড় গাছটা দিয়ে কী করবে?

ঘর বাঁধব মা। ডালপালা ছেঁটে দিয়ে গাছের ধড়টা ঝিলের জলে ভাসিয়ে ওপারে নিয়ে তুলব। তারপর চেরাই আছে– শুকোনো আছে—

সে তো অনেক জায়গা লাগবে।

ওই ঝিলপাড়েই সব করব। রোদ খাওয়াব। রং খাওয়াব। তারপর লরিতে তুলে গড়ে নে যাব। সেখানেই জায়গা বন্দোবস্ত। একটা কথা বলি মা।

বল।

মাটি সই সই কাটতে বললেন কেন বুঝিছি।

তা বুঝবে না কেন? ঝিলপাড়ে বাড়ি। কদম গাছটার শেকড় মাটি কামড়ে চাদ্দিক বেঁধে রেখেছে। ওখানে ঝিলপাড় আর ধসবে না বর্ষায়।

সারাদিন করাত চলল। বিকেল পেরিয়ে গাছটা দেহ রাখল। অনেকদিনের পুরনো কদম গাছ। ঝিলে নেমে লোকগুলো ভাসন্ত গাছটাকে টানতে টানতে যেই বড় জলে পড়ল—অমনি চারজনে মিলে চিৎ। সাঁতার জুড়ে দিল। ওরাও এগোয়—গাছও এগোয়। তার মানে কোমরের দড়িতে গাছটাকে বেঁধেছে।

দুর্গা মৌলিকের কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাছটা ছিল। এখন সেখানে কিছু নেই। মৃগাঙ্ক মৌলিকের ফাঁকা গ্যারেজ আরও শূন্য দেখাচ্ছে। আকাশে কোনো চাঁদ নেই। ক্লাব বাড়ির চিমনিতে ধোঁয়া।

সারা পাড়া দিয়ে এবার ডিমের ডালনার গন্ধ উঠবে। গেরস্থরা টিভি-র সামনে বসে এখন সপরিবারে দাঁতের মাজন, কাপড় কাচা

সাবান, গায়ে মাখার ক্রিমের ছবি দেখবে। কোনো কোনো বাড়ির দরজায় ফুচকাওয়ালা এসে আলু, ছোলা, ফুচকা জল শালপাতায় ভাগে ভাগে চুড়োন এগিয়ে দেবে।

ও কী উর্মি? তুমি কাঁদছো?

বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে তিন ধাপের সিঁড়ি। তার মাঝের ধাপে চুপচাপ বসে উর্মি। ঘরের আলোয় মুখখানা একটু দেখা যায়। সেখানে চোখের নিচে জল।

আঁচলে চোখ মুছে উর্মি নিজেকেই বলল, এ পাড়ায় না এলে রবি আরও কিছুদিন বাঁচত। গ্ল্যাকসো একটা টিন ফুরিয়ে দিত পাঁচ দিনে। হজমও করতে পারত।

মন খারাপ করে কী হবে। চল ঘুরে আসি কারও বাড়ি—

মোহিতের একথায় উর্মি উঠে দাঁড়াল। ছাখো—এ পাড়ায় কোনো আনন্দ নেই যেন। কেউ কারও সঙ্গে মেশে না।

সবাই কেয়ারফুল খুব। মিশলে—মাখামাখি হলে যদি ঝগড়া হয়!

তাই? ঝগড়ার ভয়ে মিশবে না? থাকে কী করে এখানে মানুষ?

চল বেনুর বাড়ি ঘুরে আসি।

বেনু ঠাকুরঝিকে এখন বাড়ি পাবে?

নিশ্চয় বাড়ি আছে। ওর যা পড়ানোর বাই! নিশ্চয় নন্দাকে নিয়ে পড়াতে বসিয়েছে দেখব গিয়ে।

পড়াতে নয়—নন্দাকে বেনু বৈঠকখানায় বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই মোহিত বুঝল, আবহাওয়া খারাপ।

তুমি সারা ড্রইং খাতা জুড়ে ডাইরি লিখেছো। পাহাড়ের ভেতর ও কার নাম লিখে রেখেছো নন্দা?

তুই যা। চা কর তো মন দিয়ে। আমি দেখছি।

বেনুর ওঠার ইচ্ছে ছিল না। তবু উঠল। যাবার সময় বলল, ছোড়দা—আজকাল মেয়েগুলো স্কুলে গিয়ে একদম পড়ে না। কার না কার নাম লিখে রেখেছে সারা খাতা জুড়ে—

কারও নাম নয় মা।

তুই যা না বেনু। কেন মেয়েটাকে কাঁদাচ্ছিস। আমি দেখছি।

ড্রইং খাতা খুলে নানা রঙের পাহাড়ের দেখা পেল মোহিত। এগুলো তোমার আঁকা?

হ্যাঁ ছোট মামা।

পাহাড়ে এই যে লিখেছো—আই লাভ য়ু।

চোখ ছলছল করে উঠল নন্দার।

কার নাম লিখে যেন ভালো করে কেটে দিয়েছো?

কারও নাম নয় ছোটমামা। এমনি।

তাহলে কেটেছো কেন ভালো করে?

এমনি—বলেও নন্দার চোখ ছলছল করে উঠল।

মোহিত আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল। লেবু তোমার কথা বলছিল সেদিন—

সত্যি!

হ্যাঁ। তিন সত্যি। তোমার ফিগারের প্রশংসা করছিল। বলল, নন্দার কী সুন্দর হাইট—

হাউ সুইট! বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নন্দা।

লেবুর নাম লিখেছিলে?

হুঁ। মাকে বোলো না।

না। বলব না। তোমাদের কি ফোনে কথা হয়েছে?

কী করে হবে? আমি তো ফোন নম্বর জানি না ছোটমামা।

চোখে জল আসছে কেন? চোখ মুছে ফেল।

চোখ মুছে নন্দা তাকাল। সব সময় ওর কথা মনে হয়। কেবলই ওর কথা। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। মুখখানা কী সুইট—তাই না ছোটমামা?

এমন অনেক সুইট মুখের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। এ একটা সময় তোমার। এই নিয়ে নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। পারলে

আমাদের বাড়ি এসে লেবুর সঙ্গে গল্প কর। নাচো। বেড়াও। দেখবে সব কেটে যাবে—

আমি যে কাটাতে চাই না ছোটমামা—বলতে বলতে চোখ ভরে এল নন্দার। মনে মনে হেসে ফেলল মোহিত। এ যে চোদ্দ বছরেই নায়িকা।

তুমি এবার বসে-আঁকো কম্পিটিশনে যাও নি?

ওসব এখন আর ভালো লাগে না আমার। খুব সিলি লাগে ছোটমামা।

লেবু কী কী ভালোবাসে তা তুমি কি জানো?

না তো। কী ভালোবাসে ছোটমামা?

গোলে খেলতে—

ফাইন! নিশ্চয় ক্যাপটেনসি করে—ইউরোপে গোলিরা তো তাই করে।

তা জানি না। তবে নীহার গুপ্তর ডিটেকটিভ বই পড়তে ভালোবাসে—

এ মা! তাই নাকি?

আর পড়ে রিডার্স ডাইজেস্ট।

যাঃ! রিডার্স ডাইজেস্ট তো অসুখ করলে বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়। নয়তো ট্রেনে যাবার সময়—জানলায় বসে—

জোকস্ ভালোবাসে।

যাঃ।

হ্যাঁ। জোকস্ লিখে পাঠায় কাগজে ছাপার জন্যে।

সিলি! আর বোলো না ছোটমামা। কেন? ওদের বাবা মা কিছু না হোক কথাসরিৎ সাগর তো পড়তে দিতে পারেন। তাহলে একটা টেস্ট তৈরি হয়। হলে আরও ভালো বই পড়তে ইচ্ছে হবে। কথাসরিৎ সাগরের মতো জমাট গল্প কোথায় পাবে?

সে জানি না। এত তাড়াতাড়ি কনক্লুশন করা ঠিক হবে না নন্দা। রকস্—জ্যাজ খুব ভালোবাসে লেবু।

আমিও বাসি। কিন্তু ছোটমামা—বাবা আজকাল সেতারের রেকর্ড চাপালে চুপ করে শুনতে আমারও ভালো লাগে।

লেবুর ইচ্ছে—ও ফ্যাশান ডিজাইনার হবে।

কেন? আর কিছু পেল না?

ভালো আঁকতে পারে ও নন্দা—

সেই আঁকা কেউ কি ফ্যাশানের ডিজাইনে ওয়েস্ট করে ছোটমামা? আমি তো স্বপ্নের পাহাড়গুলো জেগে উঠে আঁকি। স্বপ্নের রংগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করি। আঁকা জিনিসটা ছোটমামা—আমার তো মনে হয়—মনের গভীরে যাওয়ার সিঁড়ি। তাই না? সে জিনিস ও-কাজে কেউ ব্যবহার করে! সেজন্যে তো অন্য ধরনের গোলা লোক রয়েছে আরও। লেবু কেন? হোয়াই লেবু?

মোহিত চুপ করে নন্দার মুখে তাকিয়ে থাকল। এখন চোদ্দ প্লাস। আর পাঁচ বছর পরে ও যাকে বলে একজন সুন্দরী সুরসিকা—পরিণত যুবতী হবে। বেনুর ভাগ্যটা ভালো। মুখে বলল, তাহলেই বোঝো—লেবুকে দেখে তোমার মনে যা হয়েছে আসলে তা কিছুই নয়। এক রকমের কুয়াশা।

দিলে তো সব সুইট ড্রিমস্ ভেঙে। মা বলেছিল—তুমি নাকি একসময় কবিতা লিখতে। বিশ্বাস হয় না। কাউকে দেখে মাঝে মাঝে আমার এমন হয়। কী করি বলতো ছোটমামা?

কিছুই করার নেই। অনেক কিছু গড়ে উঠবে এখন। এখন অনেক কিছুই ভেঙে যাবে আবার। এসবের এই তো বয়স। এই তো সময়। ভাঙবে—গড়বে। ঠিক কবিতারই মতো।—আর যা বলা হল না মোহিতের—তা হল—জীবনটা বড় সুন্দর। তাই না নন্দা। বললেও বুঝত না মেয়েটা।

কিংবা এত সেনসিটিভ—সবটাই বুঝত।

তোমার কথা শুনে এখন আমার এত ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে কী যেন আর নেই ছোটমামা। আমি ভীষণ হাল্কা হয়ে গেছি।

ঠিক এই সময় দাঁতে দাঁত ঘষে বেনু ঘরে ঢুকল। কী পাকা পাকা কথা বলছিস ছোড়দাকে ?

নিজের বোনের এই অস্থির দাঁত ঘষা দেখে মোহিতের মনে হল—কোনো দাঁতাল প্রাণী রাগে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দাঁত ঘষছে।

তুই বড্ড চটে গেছিস বেনু। যা। ভেতরে যা। কিছু হয় নি। তোর মেয়েটা ভীষণ ভালো।

বেনু চলে যেতেই নন্দা আবার হেসে উঠল। তুমি বড় সুন্দর করে বলতে পার ছোটমামা। মায়ের যে কী হয়েছে ইদানীং। সব সময় দাঁত কিড়িমিড়ি করে আছে যেন।

তোকে একটা বই পড়ে শোনাই। ছোট্ট বই। আমার পকেটেই আছে। বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঁজ করা চটি বইখানা বের করে মোহিত পড়তে শুরু করে দিল।

কী বই ?

শোন আগে—

কোনো আমবাগানের মধ্যে যদি কোনো বটগাছের সন্ধান পান—ঐ বটগাছে যদি কোনো কাকের বাসা থাকে—তবে মঙ্গলবার পূর্ণিমার রাতে কাকের বাসা থেকে একটি কাক ধরে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিচে নেমে আসুন।

কী ব্যাপার ছোটমামা ?

শোন আগে—

ঘরে আসা পর্যন্ত কাকটিকে বুকেই লাগিয়ে রাখবেন।

হঠাৎ বটগাছে কাক ধরতে যাব কেন ?

যাবি। যাবি একদিন। কাউকে যদি বশ করার ইচ্ছে হয় তোর—ধর যদি কাউকে একদম কব্জায় আনতে চাস কখনো—তখন—

ওঃ! তুমি ওয়াণ্ডারফুল ছোটমামা—এ তো দেখছি গুপ্তবিদ্যা—ম্যাজিক !

শোন আগে—

ঘরে এসে একটি কালো রঙের থলিতে কাকটিকে ভরে দিন।

থলির মুখটা বন্ধ করে একরাত্রি রাখবার পর পরদিন সকালে ওকে একটি লোহার খাঁচায় ভরে দিন। এর পর একটি পাথরের বাটিতে দই সন্দেশ একত্রে মিলিয়ে নিন। সন্ধ্যাকালে ঐ দ্রব্যগুলো খাওয়া হয়ে গেলে—কালো রঙের ঐ থলিতে কাকটিকে ভরে মাথার কাছে ঝুলিয়ে রাখুন।

মিরাকেল ছোটমামা। এই বই কোথায় পেলে? দেখি বইটা---

দাঁড়া দেখাচ্ছি—

পরদিন সকালে বের করুন ও ঐ খাদ্য সাত দিন খেতে দিন। পুরো সাতদিন এই কাজ করবার পর অষ্টম দিনে যেখান থেকে কাকটিকে ধরেছিলেন---সেই বাগানে গিয়ে কাকটিকে হত্যা করে কলজেটা বের করে নিন। কাকটিকে মাটিতে পুঁতে দিন।

হরিবল্! থামো ছোটমামা। মন্ত্রমুগ্ধ করতে---

একটা করে খুন বা হত্যার প্রেসক্রিপশন এ বইয়ের পাতায় পাতায়। তারপর শোন---

কাকটিকে পুঁতবার সময় গোলাপ ফুল ছিটিয়ে দেবেন। তিনটি গোলাপফুল দিতে হবে। পরে আবার পূর্ণিমার দিন এক রতি কস্তুরী, এক রতি কেশর, এক রতি অম্বর ও তিনটি গোলাপের পাপড়ি একত্রে মিলিয়ে তার মধ্যে কলজেটা, রাখুন।

এসব তো চিনিও না। আর কোথায় বা পাব?

ফ্যানটাসি হিসেবে শুনে যা। তারপর—শুকিয়ে গেলে কলজেটা রক্তচন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এক সপ্তাহ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঐ কলজেটাকে ধূপ দীপ দেখাতে থাকুন। এরপর গোলাপজল আর সিঁদুর মিশিয়ে একটি কৌটোতে কলজেটা বন্ধ করে রাখুন।

আপনার যাকে বশ করার ইচ্ছে—সে যে রাস্তা দিয়ে রোজ চলাফেরা করে সেই রাস্তার মাঝখানে ছয় ইঞ্চি মাটির নিচে ঐ কৌটো পুঁতে দিন। এর কয়েকদিন পরে সে নিজে থেকে এসে আপনার সঙ্গে ভাব জমাবে।

ভীষণ জটিল রাস্তা ছোটমামা। এর চেয়ে সিধে গিয়ে আলাপ করে ওগাব জমানো অনেক সোজা। দেখি বইটা—বলেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিল নন্দা।

ওমা! কী সুন্দর মলাট। আমার তো দেখেই ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছে। মেঘের ভেতর একজোড়া কাক। কাকচরিত্র। চার কোণে চারটে কাক। তাদের পাশ দিয়ে লেখা—ইচ্ছাপূরণ, মিত্রলাভ, শুভবার্তা, শত্রুভয়, সুখ, কার্যসিদ্ধি।

মলাট ওল্টানোর আগেই মোহিত ছোঁ মেরে চটি বইখানা নিয়ে নিল।

শোনাও মামা। আমবাগানের ভেতর তুমি যে বটতলায় কাক খুনের কথা বললে—তাতেই আমার মনের ভেতর ছবি ভেসে উঠছে। পাহাড়—পাহাড়ের পায়ে জ্যোৎস্না—সেই জ্যোৎস্না গিয়ে শেষ হল একটা ঝিলের গায়ে। সেখান থেকে নির্জন রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। রাস্তার এক ধারে বিরাট মাঠের অল্প উঁচুতে আকাশে হলুদ গোল চাঁদ। রাস্তার আরেক ধারে অন্ধকার, নির্জন পোড়ো বাড়ির উঠোনে এক নষ্ট আমবাগান। বাজে পোড়া গাছ। শিলে খাওয়া আম।

নন্দা—

শোনোই না ছোটমামা। আমি যেমন দেখতে পাচ্ছি—ঠিক তেমনিই বলে যাচ্ছি—সেই আমবাগানের ভেতর একটা বটগাছ। চারদিকে ঝুরি নেমে এসেছে—হয়ত আজই রাতে এসব স্বপ্ন দেখবো।

নন্দা—তুই নিশ্চয় সেখানে গেছিস—

বিশ্বাস কর ছোটমামা। আমি কোথাও যাই নি সেই বটগাছটার বাঁধানো চাতাল আগাগোড়া ফেটে চৌচির। তার ফাঁক ফোকরে বিরাট বুড়ো সাপ ধীরেসুস্থে নড়ে চড়ে। মানুষের পা পড়ে না তো।

নন্দা দেখল, তার ছোটমামা চোখ গোল করে তার মুখে তাকিয়ে। তখনো সে বলে যাচ্ছে—এক মহিলা—যার কাঁধের র‍্যাপার মাথার

আঁচলের ওপর—আর পেছনে আকাশের ভেতর অনেকগুলো ফাঁকা হাইরাইজ বাড়ির অন্ধকার মুণ্ডু গেঁথে আছে—

আর কিছু বলতে পারল না মোহিত। সে বেতের আরাম চেয়ার থেকে দলা পাকিয়ে কার্পেটে গড়িয়ে পড়ল। মুখে ফেনা—থুথুর গ্যাজলা ঠোঁটে।

॥ ১১ ॥

ভোররাতের দিকে ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতেই মোহিতের পৃথিবী টলে গেল। কতদিন সে শোবার খাটে শুয়ে আছে তা জানে না। ওরে বাপ্‌স্! ও ঊর্মি? আমি যে ডুবে যাচ্ছি—ভূমিকম্প হচেছ!?

ঊর্মি ছুটে এসে ডান কাঁধটা ধরল মোহিতের। তখনি মোহিত চেঁচিয়ে উঠল, এ যে দেওয়াল ভেঙে পড়ছে ঊর্মি। বাঁচাও। বাঁচাও। বাবাগো—

মোহিত পরিষ্কার বুঝলো তার খাটের একদিককার পায়া দুমড়ে কাৎ হয়ে গেল। আর সেদিককার দেওয়াল ভেঙে বালি সিমেন্ট খসে পড়ছে। ঊর্মি? আমি কি কোনো নদীতে শুয়ে আছি। ওরে বাবা? আবার—আবার! ও বিল্ব! বিল্ববাবু গো—

মোহিতের আর কিছু মনে নেই। চোখ বুজে আসার আগে সে ঊর্মির চোখে জল দেখতে পেয়েছে।

দুর্গা মৌলিকের মেজো ছেলে বিল্ব দৌড়ে নেমে এল দোতলা থেকে। ডাক্তার ডাকি?

ঊর্মি চোখ মুছে বলল, আমি তো বুঝে উঠতে পারছি নে। ছেলেরাও কেউ নেই এখানে—

আপনি ভাববেন না কিছু বৌদি। দেখুন তো গায়ে চাদর আছে তো? না থাকলে দিয়ে দিন।

ডাক্তার এল। প্রেসার মাপল। ঊর্মি বলল, অনেকদিন শুয়ে আছেন তো। মাস দুই আগে বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মাথা

ঘুরে পড়ে যান। তারপর থেকেই প্রায় শুয়ে থাকেন। ক-দিন হল এক কাতে শুয়ে সিপাহী বিদ্রোহের কি একটা বই পড়ছেন।

এই নেওয়ারের খাটে আর শুতে দেবেন না। মাঝখানটা ডেবে যায় তো। শরীরের সব রক্ত নাভিতে গিয়ে সেটেল করে। স্টেমিটিন বড়ি আধখানা করে দেবেন—দিনে তিনবার—

মোহিতকে ধরাধরি করে কেঠো খাটে শোয়ানো হল। শোয়ানোর পরেই আবার আচমকা সেই ভয়ের ঢেউ।

ঊর্মি। ঊর্মি—বাঁচাও। খাট ভেঙে যাচ্ছে।—বলতে বলতে মোহিত উল্টোদিকের মশারির দড়ি আঁকড়ে ধরল।

এবার এলেন আরেক ডাক্তার। সব দেখে শুনে বললেন, লেবরেন্থিসিস হয়েছে।—শেষে বুঝিয়ে বললেন, কানের ভেতরকার বলবিয়ারিং সরে গেলে এমন হয়। পৃথিবীর সঙ্গে স্পেসিফিক গ্রাভিটির টানটোন ওই বল বেয়ারিংগুলোই ঠিক রাখে কিনা। গোলমাল হলেই পৃথিবী উঁচু নিচু লাগবে—। ফুল রেস্ট দরকার।

মোহিত কিছু শুনতে পায়। কিছু পায় না। মাথার ভেতর দিয়ে সব সময় মেঘ ভেসে চলেছে।

ঊর্মি একসময় জানতে চাইল, রোগটা আসলে কি ডাক্তারবাবু?

এক কথায় বলতে পারেন—গোলক ধাঁধামি। আর তা যদি না হয়ে থাকে তো অ্যাকিউট স্পনডুলাইটিস। এক্সরে করলে বোঝা যাবে। অনেকসময় হাড়ের গ্রোথ হয়। সেইসব গ্রোথ এরিয়ায় রক্ত চলাচল বাধা পেলে মাথায় শর্ট সার্কিট হবেই। তখনই মনে হবে—খাট বেঁকে যাচ্ছে। দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। এক্সরে না করে বলতে পারছি না। ব্রেইনে রক্ত সাপ্লাই বন্ধ হলে এমন হয়।

এই শীতেও খুব ঘামছেন কিন্তু।

সামান্য পাখা চালাতে পারেন।

মোহিত কিছুই টের পাচ্ছিল না। তার চোখের সামনে তখন ফাটা চটা বট-চাতালে দুই বুড়ো সাপ—ধীরে সুস্থে তাদের ফণা যতবারই তুলতে যায়—পারে না—মুখ থুবড়ে পড়ে। এখন মোহিতের

চোখের সামনে বাতাস সাদা রঙের। বুড়োবুড়ির গায়ের রং মিশকালো। ফণা তুললে যেটুকু দেখা যায়—ভেতর ভাগ সোনালি—তাতে সাদা সাদা ফুটকি। বটপাতাগুলো সবুজ—আর গাছটার আসল গা স্টোনচিপ স্টোনচিপ। সেখান থেকে একটা কাক বেরিয়ে এসেই কা কা ডেকে চাতালের ওপর চক্কর দিতে লাগল। একটু পরে মোহিত বুঝতে পারল—আসলে ও বুড়োবুড়িকে চায়। কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারছে না। বুড়োও সরে যায়। বুড়িও সরে যায়। মোহিত হাত তুলে কাকটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল। হাতই উঠল না তার। এত ভারি। মাথার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল বয়ে যাচ্ছে।

এরকম থাকতে থাকতেই সে টের পায় ফিরে আবার একটা সকাল এল। সকালটা অনেক—অনেক পরে গাঢ় হয়ে আসে। তখন কে যেন ফট করে সুইচ টেপে। আর আলোর ফলাগুলো চোখে এসে বেঁধে।

একদিন ঘোরের ভেতর ঊর্মি চামচে করে মুখে পেঁপের তরকারি দিল। কি ভালো! কি ভালো!! একেবারে অমৃত। কুমুদ তোলা উনুনে একখানা একখানা করে রুটি সেকছে। গরম তাওয়ায় রুটিখানা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দেওয়ার আলতো শব্দটা মোহিতের মাথার চাঁদির ভেতর গিয়ে থপ করে পড়ে। খানিকক্ষণ অন্তর। যতক্ষণ অন্তর কুমুদ হাত ঘুরিয়ে রুটি ছাড়ে তাওয়ায়।

এই থপ্—থপ্ ক্রমাগত মাথায় গিয়ে জমতে থাকে। আর সেই সঙ্গে কুমুদের মাজা গলা। সে তো গর্ব করেই বলে—রাঁধুনী বল ঝি বল—চল্লিশ বছরের ওপর আমি এই শহর কলকেতায়—

আরও একটা শব্দ মোহিতের ভিজে ঘিলুতে গিয়ে পড়ছিল। তাকে ঘুমোতে দেখে ঊর্মি নিশ্চয় টিভি খুলেছে। টিভি-র বিজ্ঞাপনের জিঙ্গিল ঘিলুতে পড়ে একেবারে বিঁধে যায়।

আর কুমুদ তার বলার কথা বলে যাচ্ছে রুটি সেকতে সেকতে।

ঊর্মি টিভি খুলে তার দেখার জিনিস দেখে যাচ্ছে।

সতের বছর বয়সে তো বেধবা হলাম। ঠিক রান্নাপুজোর দিন বৌদিদি।

মোহিত শুনতে পেল, উর্মি বলছে—হু। নিশ্চয় চোখ টিভি স্ক্রীনে। সব বুঝেও কিছু করতে পারছে না মোহিত। সে বোধহয় এখন তার নিজের জীবিত মমি। সবই টের পায়। কিন্তু কী এক আশ্চর্য ঘুমের বরফের নিচে চাপা পড়ে আছে সবসময়। নিজের মাথার ভেতর দিয়ে এই সময় সাদা বয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই করার থাকে না।

মাছ ধরতে বসেছিল বৌদিদি। খালপাড়ে। সাপে কাটল। অল্প বয়সে দেশের লোকের সঙ্গে এ পাড়ায় চলে এলাম। মৃগাঙ্কবাবু কাজ দিলেন।

হু।

তারপর তো চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেল। বাবু বেঁচে থাকা অব্দি একটানা ছত্রিশ বছর এবাড়ি রান্না করেছি বৌদিদি। বাচ্চাদের কাঁথা কেচেছি। বাবু বৌদিদির সঙ্গে তীর্থে গিয়ে চটিতে রুটি করেছি ঘি মাখিয়ে। বিল্বর মা তো কোনোদিন আগুনের আঁচে যায় নি। সহ্য হত না ওনার।

তোমার ছেলের বয়স কত এখন ?

ত্রিশ বত্রিশ হবে।

বছরগুলো সব ঠিক ঠিক মনে আছে তোমার কুমুদ।

সব তো চোখের সামনে ভাসছে বৌদিদি। বাবু একতলায় গ্যারেজের পাশে ঘর করে দিলেন। সে ঘর এখন আর নেই। ভেঙে সে ইট দিয়ে আপনাদের উঠোন ঘিরে দেওয়া হল। বাবু মারা যাবার দিন তেল-কই খেতে চাইলেন। রাঁধলুম মন দিয়ে। তখন ওই ঘরে থাকি।

তোমার বয়স হয়ে গেছে কুমুদ। বছরের হিসেব-টিসেব সব গুলিয়ে ফেলেছ।

তা হবে হয়ত বৌদিদি।

উর্মি খুকখুক করে হেসে উঠল।

বরফচাপা ঘুমের ভেতরেও মোহিত টের পাচ্ছিল—উর্মির গলায় সন্দেহ আর ঠাট্টা একসঙ্গে খেলা করছে। ঘুমের বরফটা এবার আরও ভারি হয়ে উঠল। মোহিতের ভিজে ঘিলু একদম জল হয়ে যাচ্ছে। সে আর কিছুই মনে রাখতে পারল না।

দ্যাখো। চোখ চাও। কে দেখতে এসেছেন তোমায়—

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল মোহিত। হরলিক্সের স্বাদ লাগানো ষোলআনা ভরাট ঘুম চোখে মুখে আরাম দিচ্ছিল মোহিতকে।

আপনি?

আমি তো আগেও দেখে গেছি আপনাকে। তখন ভীষণ ঘুমে ডুবে থাকতেন। ডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। থাক। উঠতে চেষ্টা করবেন না।

তাহলে আপনি ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন। আমি একটু দেখি আপনাকে।

পুটু গিয়ে চেয়ারটায় বসল। শাড়ির পাড়ে পায়ের পাতা ঢেকে নিল।

তোমায় দেখলে দিন সুন্দর হয় পুটু।

পুটু কিছু বলার আগেই উর্মি ঘরে ঢুকল। হাতে ছোট গ্লাসে মুসুম্বির রস। তখনো মোহিতের ঠোঁট বিড়বিড় করে চলেছে।

॥ ১২ ॥

রঘুপতি ঘোষ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, তার সে চেহারা আর নেই। পেটের চর্বি, গালের মাংস, ঘাড়ে গর্দানে দশা—আর নেই। দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে শরীরটা ওঠানামা করাতে লাগল। মাথার কাঁচা পাকা চুল আর চোখের নিচের কাটা দাগ দিয়ে চেনা যায়—সে-ই রঘুপতি ঘোষ।

ঝকঝকে চেহারার এক মহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, নড়বেন না মিস্টার ঘোষ। ওই অবস্থায় থাকুন। আমাদের ফোটোগ্রাফার নানান অ্যাঙ্গেল থেকে আপনার ছবি নেবে। আমাদের অ্যানুয়াল ব্রোসিওরে আপনার ছবিই হবে আমাদের পাবলিসিটি মেটিরিয়াল। আপনার আগের ছবির পাশে এই ছবিগুলো আমরা ফোল্ডারে ছাপবো। মোট ষোল মাসে আপনি রিমার্কেবেলি ইমপ্রুভ করেছেন।

এখন আর আগের মত ঘুম পায় না দিদিমণি।

পাবেই না তো। মোট কুড়ি কেজি স্ল্যাম ডাউন করেছেন।

এখন আমি দৌড়ে ট্রামে উঠতে পারি।

আর কমাবেন না ওজন। আর কমলে প্রেসার ফল করতে পারে।

আমি এখন দুই দোকানেই বসছি দিদিমণি। ভাতের হোটেলে ক্যাশ শর্ট হচ্ছিল। কালপ্রিটকে ধরে ফেলেছি।

দিদিমণি নামের মহিলার বয়স বোঝা যায় না। পাতের মত পেটানো চেহারা। আবার নরমও বটে। দিব্যি কাঁচাগোল্লা। তাই তো মনে হল রঘুপতি ঘোষের। গায়ের সিল্কের শাড়ি সব সময় ভয় হবে—এই বুঝি খসে পড়ল। কিন্তু খসে না।

ইনিই রানী রায়। এই হেলথ্ ক্লিনিকের প্রিন্সিপাল। স্বামী নাকি রিটায়ার করা মিলিটারি। সব সময় দোতলায় ঘুমোয়। একতলাটা জুড়ে রানী দিদিমণির ইস্কুল। বালিগঞ্জ প্লেসে এত্ত বড় বাড়ি বোধহয় বাপের আমলের। মাঝখানটায় কাঠের পার্টিশন দিয়ে মেয়েদের দিকটা আলাদা। সেখানে নাকি শরীরের জায়গা বেছে নিয়ে বেঢপ মাংস কমাবার নানান যন্ত্র আছে। কোনোটায় চাকা লাগানো। কোনোটায় অনর্গল দোলানী দেবার বেল্ট।

সবই রঘুপতি জেনেছে—এখানকার দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করে।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে সামনে ছাঁটা ঘাসের লন। তাতে পুরনো আমলের একটা পান্থপাদপ গাছ। আজকাল এমন গাছ আর দেখা

যায় না। রঘুপতি ঘোষ তার হালকা শরীরে গুনগুন করে হালকা চালে তাল দিল—আমি যে-এ-এ তোমারি-ই অনু-উ-গ-ত-তো—

তার মনে ভাসছিল রানী দিদিমণির চেহারাটা। ওজন কমাতে পেরে সে এখন দিদিমণির জন্যে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল রাখতে পারে না। ইচ্ছে হয়—ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করে। আবার ধরল—আমি যে তোমারই অনুগত-অ-অ—

একখানা ফিয়াট গাড়ি এসে রঘুপতির একদম পায়ের কাছে ব্রেক কষল। দোর খুলে যে নামল তাকে যেন খুব চেনা লাগল রঘুপতির। কোথায় সে দেখেছে। মেয়েটি খুটখুট করে হেঁটে দিদিমণির ক্লিনিকে ঢুকে গেল।

রানী রায় রিসেপসনের কাছাকাছিই ছিলেন। হেসে এগিয়ে এলেন, এই যে কঙ্কাবতী। তোমার পুরনো ছবি দেখলাম। সেই একই রকম আছ।

না রানীদি। আমায় বোধহয় কিছুটা কমাতে হবে।

কোথায় কমাবে। ঠিক আছ। এতদিন ধরে একরকম থাকা বেশ কঠিন।

আমার কিছু স্পষ্ট রিডাকসন দরকার।

তাহলে স্পেশাল সিটিং দাও। কিন্তু কোথায় কমাবে? না কমালে চলে না?

বয়স তো হচ্ছে। থাই আগের চেয়ে ভারি লাগে। একটা ছবিতে সাইন করেছি। কনভেন্টের উঁচু ক্লাসের স্টুডেন্টের রোল। স্কুলের স্কার্ট পরে ক্যামেরার সামনে দৌড়ে দৌড়ে গাইতে হবে—

সোলো?

একদম সোলো। তবে কালার ছবি তো। পাহাড়ে গাছপালার ভেতর। মানিয়ে যাবে। কি বলেন?

হ্যাঁ। তা তুমি পারবে।

আপনি কিন্তু নিজেকে খুব ভাল রেখেছেন রানীদি। আমারই আদর করতে ইচ্ছে যায়।

কি যে বল! তোমার পেছনের দিকটা একটু বেল্টিং কর সাতদিন। থাইয়ের জন্যে এক জায়গায় বসে সাইক্লিং করতে পারো। পেট আর তোমার কমাবার দরকার নেই। তোমার পেলভিসের দাঁড় তো ভালই। কটি বাচ্চা ধরেছ কঙ্কা?

একটি। দুটি মিসক্যারেজ গেছে।

দরোয়ানদের বসবার জায়গায় প্রায় দরোয়ানের ভঙ্গিতে বসে সব শুনে যাচ্ছিল রঘুপতি ঘোষ। এবার মনে পড়েছে তার। এই মেয়েটা সিনেমা করে। পাড়ায় দু-একবার দেখেছে। মেয়েলোক কি সাঙ্ঘাতিক। কাঠের ফার্নিচারের মত ফালতু কাঠ জ্ঞানে নিজেকে সাইজ মত কেটে ছেঁটে ফেলে। এ তো প্রায় দুম্বা। যার মাংস কেটে খেলেও বেঁচে থাকে। আবার গজায়। তুলনাটা ঠিক হল না। খুব সাবধানে—যাতে রানী দিদিমণি দেখে না ফেলে—এইভাবে পা টিপে টিপে বাইরে এল রঘুপতি ঘোষ।

বাড়ি ফিরে কঙ্কাবতী দেখল—লেবু সোফায় পা তুলে দিয়ে কী একটা বই পড়ছে। আর সন্তু ঘুরে ফিরে তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। যেমন—

বাঘ কেন রক্ত খায়? দিনের বেলা বাঘ কেন ঘুমোয়? বাঘ সাঁতার শিখল কার কাছ থেকে?

লেবু শুধু হু হা করে জবাব দিয়ে চলেছে।

ঘরে ঢুকেই আজ আর শাড়ি পাল্টালো না কঙ্কাবতী। বাইরে বেরোবার পোশাকের ভেতর সদ্য স্টিম বাথ নেওয়া হালকা শরীরটা কঙ্কাবতীর চমমন করছিল। সে দেখতে চাইল—তাকে না দেখে লেবু কতক্ষণ বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। তাই যেমন ছিল তেমনভাবেই দেরাজ খুলে ব্যাগ রাখল। ফ্রিজ খুলে এক কিউব চিজ নিজে খেল—একটা সন্তুকে দিল—তারপর খানিকটা চকোলেট কটকট করে চিবোতে লাগল কঙ্কাবতী।

খুব ডিস্টার্বিং।

ঘুরে দাঁড়াল কঙ্কাবতী। কোনটা? আমি। না, বইখানা?

তুটোই।

কি বই ওটা?

মোহিতবাবু পড়তে দিলেন।

ওঃ! তোমার মোহিতবাবুর!

বইখানা তাঁর লেখা নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবর্তন। স্কুলমাস্টারদের খুব কষ্ট ছিল আগে।

কোথায় না কষ্ট লেবু? কিন্তু আমি তোমায় ডিস্টার্ব করলাম কখন?

তুমি যে আরও সুন্দর হয়েছ কঙ্কা।

তা জানি নে। তবে আজ নতুন ছবির দর্জি মাপতে গিয়ে বলেছিল—আমার কোমর নাকি আইডিয়াল!

লেবুও তাকিয়ে দেখল। বুকের ওপর ঘিয়ে রঙের সিল্ক। সরু কোমর থেকে ভরভরন্ত শরীরটা তানপুরার শেষটা হয়ে থেমে থাকা। পেট বলতে পড়ে থাকা নদীর খাত। কঙ্কা ঘুরছে ফিরছে—একদম স্প্রিং। এই চেহারায় ছবি পায় না। আশ্চর্য।

সন্তু বারান্দার দিকে ছুটে যেতেই লেবু নিজের চোখ মুখ ওই খাতে চেপে ধরল। কঙ্কাবতী সরে গেল না। বাধা দিল না। শুধু বলল, মোহিত কেন বই দেয়?

তুমি শুধু শুধু খারাপ কথা বোলো না। মানুষটি ভাল। উনি চান—আমি ভাল ভাল বই পড়ি।

সেজন্যে পৃথিবীতে তো আরও অনেক লোক আছে। বেছে বেছে তুমি কেন? আমরা কেন?—বলতে বলতে কঙ্কাবতী দুহাতে লেবুর মুখখানা তুলে ধরল—যেন শুধু নিজেরই দেখার জন্যে—তারপর বলল, আমার খুব ভয় করে লেবু। আরও তো লোক আছে এ পাড়ায়—কই তাদের তো কোনো বই পড়তে দেন নি তিনি?

তুমি শুধু শুধু সন্দেহ করছ মানুষটাকে। খুব ভাল লোক। কোনোদিন নাকি কবিতাও লিখতেন। আমায় পুরনো কবিতা পড়ে শোনালেন। এই বইখানা ওর প্রিয়। তাই আমায় পড়তে দিয়েছেন।

কতটা এগোলে ?

এগোতেই পারছি না। মাস্টারমশাইদের খুব কষ্ট কঙ্কা—আমি এরকম বই আগে পড়ি নি।

আমিও একসময় ভাল ভাল বই পড়তাম। কতদিন সেসব বই পড়ি না বলতো।

লেবু তাকিয়ে দেখল, সুন্দরী থাকার জন্যে কঙ্কার যা যা হওয়া দরকার—সবই সে হয়ে আছে। কঙ্কাবতীকে তার মাঝামাঝি জায়গায় দুহাতে জড়িয়ে ধরল লেবু। লেবুর কাছে কঙ্কা একজন স্বাধীন মেয়েলোক—যে মাস গেলে সাত আট হাজার টাকা অবলীলায় আয় করে—বাড়ি ভাড়া দেয়, পছন্দ মত মিউজিক সিসটেম কেনে—স্বাধীনভাবে তাকে ডাকে। তার কাছে কঙ্কা এক্সপিরিয়েন্সড, সাহসী—অথচ সুন্দরী, নরম—টান টান দাঁড়ানো অবস্থায় ছবি আঁকার বইয়ের ফিগারের চেয়েও নিখুঁত ফিগারের মানুষ। এই এখন তার দুহাতে জড়িয়ে ধরে লেবু টের পেল—কঙ্কার পেটের জায়গাটা এক দিস্তে সাদা কাগজের মতই ফিনফিনে কিন্তু সুগন্ধী—সেখানে একটি নাভি আছে—আর তারপরেই আরাম আর রহস্যের একসঙ্গে ভারি হয়ে নেমে যাওয়া।

কঙ্কাবতী এটা বুঝতে পারল, লেবুর গায়ে ভীষণ জোর। আর যা কিছু করে একদম জলের তোড়ে। ফুটবল পেটানো হাত পা। লম্বা লম্বা। এইসব সময় ওর নিশ্বাস ওঠে পড়ে যেন লিক হয়ে যাওয়া ব্লাডার। এত ভাল লাগে কঙ্কাবতীর। লেবুর মাথাটা তাকে বুক অব্দি খুঁড়তে থাকে। তখন ও লেবুকে ধরে রাখতে পারে না।

আজও কঙ্কাবতী পারছিল না। ভাগ্যিস সন্তু উঠোনে নেমে বেড়াল ছানার পেছন পেছন খিড়কির দোরে। সে লেবুকে বলল, তোমার মোহিতের না খুব অসুখ যাচ্ছিল।

মাথা—মুখ—দু-হাতে কঙ্কাবতীকে সবটা পাবার জন্যে লেবু তখন কোন্ ভেতরে মাটি কেটে চলেছে। কোনোক্রমে তারই ভেতরে বলল, সেরে উঠে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন। এক একদিন তো কার্তিক

মজুমদারের পোড়ো বাড়ি অব্দি চলে যান দেখি। ভোর—ভোর—।
এই কম্বা! কি হচ্ছে?

॥ ১৩ ॥

ইংরাজি বছরের শেষটায় এবার বাঘেরও কম্প দেওয়া শীত এসে হাজির কলকাতায়। বিশেষ করে যেসব পাড়ার শেষে মাঠ, ঝিল, ফাঁকা ফাঁকা ভাব সেখানে তো বিকেল পাঁচটাতেই গেরস্থরা দরজা জানলা আটকে চায়ের কাপ নিয়ে বসে যায়। পাকা গেরস্থরা গরম জল দিয়ে হাত পা ধুয়ে খাটে উঠে পুরনো তোয়ালে দিয়ে পা রগড়ায়। গলায় কম্ফাটার জড়িয়ে কেউ কেউ তেলমুড়ি নিয়েও বসে। এই সময় যাদের টিভি আছে—তারা যদি একটা সিরিয়াল পায় তো কথা নেই। সেটা বুকের কফকাশির মতই ষোল আনা শুষে নেয়।

মাঝের বড় ঘরখানা আজ কদিন হল প্রফুল্ল দত্ত দখল করেছে। সে বহু চেষ্টায় তার বাবার নিরুদ্দেশ সেঝঠাকুর্দা বলে একজন লোককে শিবালিক রেঞ্জ থেকে ধরে নিয়ে ফিরেছে। টিভি বন্ধ। ঘরের মাঝখানেই ডবল থান ইট পেতে সেঝঠাকুর্দার সাধনক্ষেত্র তৈরি। ধুনি জ্বলছে।

ভেতরবাড়িতে পুটু শ্বশুরের সেঝঠাকুর্দার জন্যে আটা মাখছিল। সে প্রফুল্লকে বার বার বলেছে—এ লোকটা তোমাদের বংশের লোকই নয়। আমি হলফ করে বলতে পারি। তোমার বাবার বুকের গঠন—নাক, চোখের দৃষ্টি আমি ভুলি কি করে? এ কিছুতেই তোমার বাবার ঠাকুর্দার সেঝো ভাই নয়।

ধুনি জ্বেলে বসা সেঝঠাকুর্দার ভাঁজ করে বসা দুই পা বেশ সাধক সাধক।

কৌপীনের বাইরে বেরোনো—অনেকখানি লম্বা, চ্যাটালো আর পুরুষ্ট। কোনো রকম বাঙালিয়ানাই নেই। মাথা ভর্তি প্রবল জটা। সেই অনুপাতে চোখ ঢাকা দাড়ি। হাতের চিমটে দিয়ে বাপের সেঝঠাকুর্দা মাঝে মাঝে প্রফুল্লকে ভয় দেখাচ্ছে।

প্রফুল্ল যত বলে, আপনিই কি অনাদি দত্ত? পিতা পরমানন্দ দত্ত?

সেঝঠাকুর্দা তত বলে, ম্যায় তো দারা—শিকোহকা গুরু: পরমানন্দ কৌন?

আরে দাঁড়ান! অনেকদিন বেঁচে আছেন তো—তাই সব গুলিয়ে ফেলছেন—। পরমানন্দ—দূর ছাই! বাংলা কি একটুও মনে নেই?—আপ কেয়া পরমানন্দকা বেটা?

হাঁ তো জরুর। হামলোগ সবকোই পরমানন্দ কা সুপুত্র! ইসি লিয়ে তো আভি তক্ সহি সালামৎ হু।

ধ্যাৎ! ভাল করে শুনুন।

সেঝঠাকুর্দা নামে লোকটি রীতিমত ভড়কে গিয়ে প্রফুল্ল দত্তর চোখে তাকাল। তারপর বলল, কহে চুকে তো ম্যায় দারা শিকোহো কা গুরু।

কি বাজে বকছেন। দারা শিকোহো কবেকার লোক জানেন? তাঁর গুরু হলে তো আপনি আপনার বাবার চেয়েও বয়সে বড় হয়ে যান!

ক্যায়সে?

ঘর ভর্তি ধোঁয়া। চোখ জ্বালা করছিল প্রফুল্ল দত্তর। অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরল প্রফুল্ল। সেঝঠাকুর্দার ওয়ারিশ ঠিক হলেই বড় উকিল কেসের ব্রিফে হাত দেবেন।

প্রফুল্ল বলল, দারা হল গিয়ে আওরঙ্গজেবের বড়দা। কবেকার লোক সে খেয়াল আছে আপনার। হোঁস মে আইয়ে—তব কহিয়ে আপকা পিতা কৌন হ্যায়?

ম্যায় পুরা হোঁসিয়ার হু। মেরা পিতাজি আকবর বাদশা কা মনসবদার থে।

লাও ঠ্যালা। ও পুটু রুটি হয়ে গেলে দিয়ে যাও। সেঝঠাকুর্দা সব আবোল তাবোল বকছে।

পুটু গ্যাসের ওভেনে ভারি রুটি ঘি মাখিয়ে সেকতে সেকতে বলল, এখন কি। আরও ভুগবে—

প্রফুল্ল শেষ চেষ্টার মত খুব শান্ত গলায় বলল, পরমানন্দ দত্ত কোন থা আপকা ?

দত্ত ? মুঘল বাদশা কা কোই মনসবদার হোগা। মেরা সাথ কোই জান পরিচিত নেহি থা।

ও পুটু। আমি ভেবেছিলাম—সেঝঠাকুর্দার বয়স একশো চল্লিশ পঞ্চাশ হবে। ইনি যা বলছেন—তাতে তো ওর বয়স তিনশো ছাড়িয়ে যায়। কাকে আনতে কাকে এনেছি ?

পুটু পাশের ঘর থেকে ফোড়ন দিল, তাহলে বোধহয় সেঝঠাকুর্দার সেঝঠাকুর্দাকে ভুল করে ধরে এনেছ ! তিনি নিশ্চয় এনারই নাতি !!

প্রফুল্ল দত্তর সব গুলিয়ে গেল। দত্তদের বিশাল বংশলতিকা এখন তার হেফাজতে। এ লোকটা তো তাহলে এই বংশলতিকার ওপারের লোক। প্রফুল্ল একশো দেড়শো বছরের ধাঁধার ভেতর এতকাল ঘোরাঘুরি করেছে। এখন যে তাকে কয়েকশো বছরের অথৈ জলে তলিয়ে যেতে হয়। সে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত অবস্থায় শিবালিক পাহাড় থেকে ধরে আনা লোকটার মুখে তাকিয়ে থাকল। এখন প্রফুল্লকে দেখলে যে কোনো লোকের মায়া হবে। অনেকদিনের না-কামানো দাড়ির দশ আনাই সাদা। চোখে লালচে টান। মুখখানায় কালি মেড়ে দেওয়া।

অফিসের ডাক্তারকে মোহিত বলল, আমার মনে হয় খুব খারাপ ধরনের স্পণ্ডুলাইটিস শুরু হচ্ছিল। একটা এক্সরে নিলাম। ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড অব্দি। পাড়ার সেই সেকেণ্ড ডক্টর বললেন, ঘাড়ের কয়েকটা ব্যায়াম দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো বাড়িতে করবেন। তাহলে আর অমন মাথা ঘুরবে না। তারপর থেকে সেই এক্সারসাইজ-গুলো করে যাচ্ছি। আর তো অমন মাথা ঘোরে নি। তবে যেখানেই শুই—কক্ষনো ডান কাতে তাকাই না।

কেন ?

যদি আচমকা আবার সেই অ্যাটাকটা হয় ! আমার কাঠ কাং

হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। দেওয়াল ভেঙে পড়ল। এখুনি আমি তলিয়ে যাব। এই ফিলিংসটা আমি ভীষণ ভয় করি।

আর কারও ওপিনিয়ন নিয়েছেন ?

পাড়ার ফার্স্ট ডক্টর তো বলেছিলেন –লেব্রেন্তোসিস্।

উঁহু। পাড়ার বাইরে সেকেণ্ড কোনো ওপিনিয়ন নিয়েছেন ?

মোহিত বলল, না, তা নেওয়া হয় নি। তবে কি ফিরে ওই অ্যাটাক হতে পারে ?

হওয়া আশ্চর্য নয়। আপনার তো কোনো ডায়াগনোসিসই হয় নি মোহিতবাবু।

কলকাতায় রাস্তায় বেরিয়েও তো ঐ অ্যাটাক হতে পারে ?

হওয়া বিচিত্র নয়।

উরে বাবা! রাস্তায় ওই অ্যাটাক হলে তো মরে যাব। মাথার ব্রেইন সেলে কিছু হয় নি তো ডাক্তারবাবু ?

আশা করি হয় নি কিছু। একজন নিউরোলজিস্টকে দেখিয়ে নিন না।

তেতলার করিডর দিয়ে নিজের কিউবিকেলে ফেরার পথে ময়দান-মুখো জানলায় দাঁড়িয়ে গেল মোহিত। শীত কলকাতায় ঢোকার আগে গোড়ায় নামে গঙ্গার বুকে। তারপর গাদা বোট, লঞ্চ, চুনের নৌকোয় আলো জ্বলে উঠলে শীত ময়দান দিয়ে গুটি গুটি কলকাতায় ঢোকে।

অফিসের ঘরে ঘরে মোহিতের পুরনো সব কলিগ। এদের সঙ্গে একসঙ্গে সে ধাপে ধাপে পুরনো হয়েছে। কার কলিগ নেই—কে একদিন অন্তর একদিন দাড়ি কামায়—সবই মুখস্থ মোহিতের।

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সন্ধের ঝোঁকে মোহিত যখন ট্রাম লাইনে এসে নামল—তখন পাড়ায় ঢোকার ফার্লং তিনেকের রাস্তাটা একদম অন্ধকার। বোধহয় আলো গেল। সে এগোবে—আর অমনি একটা রিক্শা এসে পাশে দাঁড়াল। মানে ব্রেক কষল।

এতটা হাঁটবেন কেন ? উঠে আসুন।

পুটু গোছা করে মাথার চুল বোধহয় রবার গার্ডারে বেঁধেছে। তিন ফার্লং পেরোতে তিন মিনিটও লাগার কথা নয়। পুটুই জানতে চাইল, আমার কতদূর এগোল ?

কি ব্যাপার ?

বাঃ! আপনি না লেবুকে ফিরিয়ে আনবেনই বলেছিলেন— ! কথা দিলেন—

হ্যাঁ। ওকে একখানা বই পড়তে দিয়েছি।

হুঃ! তাহলেই হয়েছে! সে বই কপাতা পড়ে আজ ক-দিন হল খাবার টেবিলে ফেলে রেখেছে। বইটা এখন পড়ছেন ওর বাবা।

তাই নাকি ? তা তোমরা বাবা মা আরেকটু নজর দেবে তো।

অত বড় ছেলেকে এখন আর কি নজর দেব বলতে পারেন ?

পুটুর ঘুরে তাকানো মুখে সতেজ, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ভঙ্গি। মোহিত তখনই নিজেকে বলল, এই মুখ দিনে একবার দেখলে সব অসুখ সেরে যায়। দিনটাই সুন্দর লাগে।

কোথায় গিয়েছিলে ?

আর বলেন কেন। বড় উকিলের বাড়ি। লেবুর বাবার হিমালয়ের ম্যাপখানা দিয়ে আসতে হল। একশো দেড়শো বছরে এক একটা ফ্যামিলি এত বেড়ে যায় না—

আসি বলে মোহিত রিক্‌শা থেকে নামল।

সেদিনই রাতে উর্মি শোবার আগে মোহিতের ঘরে উঁকি দিল। টেবিল ল্যাম্পের সামনে মোহিত ঝুঁকে পড়ে লিখছিল।

আমি শুয়ে পড়লাম কিন্তু।

এই যাচ্ছি—

কবিতা এল বুঝি অনেকদিন পরে!

হুঁ।

উর্মি গিয়ে শুয়ে পড়লে মোহিত সেই চটি বইখানা বের করল। গোড়াতেই লেখা—

কাক যদি কল-কল শব্দ করে ডাকে—তাহলে জিনিসপত্রের দাম সুলভ হয়।

কাক যদি কোঁ কোঁ শব্দে ডাকে—তাহলে দেশের কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যু।

কাক যদি ক্রোলন ক্রোলন শব্দে ডাকে—তাহলে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কাক যদি ক্রেন ক্রেন শব্দে ডাকে—তাহলে কোনো সুন্দরী নারীর সঙ্গে মিলন।

মাথা তুলে টেবিল ল্যাম্পে তাকাল মোহিত। সারা পাড়া নিঝুম হয়ে ঘুমোচ্ছে। শুধু প্রফুল্ল দত্তদের বারান্দায় একজন তেলুগু বাবা খড়ম-পায়ে পায়চারি করছে। সেও নাকি ক্লাব মাঠের একজন ওয়ারিশান। তেলুগু বাবা তেলুগু ছাড়াও ইংরাজি—সংস্কৃত—দুটো ভাষাতেই কথা বলতে পারে। মাঝে মাঝে এ-পাড়ায় বাঙালিদের দিকে তাকিয়ে তেলুগুতে বক্তৃতা দেয়।

আমার ব্রেইন সেলে কোনো জখম হয় নি তো? নয়তো অমন তলিয়ে যাওয়ার ফিলিংস এসেছিল কেন? নানা জন্মের স্মৃতি—সংস্কার জমা রাখার ঘিলুকোষগুলো যদি জখম হয়েই থাকে—তবে তো আবার সেই অ্যাটাক হবেই হবে। আজ ক্লাব মাঠের অল্প উঁচুতে কোনো চাঁদই নেই।

মাথা নিচু করতেই পুটুর সেই চটি বইখানার এক জায়গায় মোহিতের চোখ আটকে গেল।

আপনি কোনো মেয়েকে ভালবাসেন। কিন্তু কোনোমতেই তাকে কাছে পাচ্ছেন না। অথচ তাকে আপনার চাই। মেয়েটি নিজেই হয়তো আপনাকে পাত্তাও দেয় না। এই কাজ হাসিল করতে হলে, মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার পর কাকের বাসা থেকে একটি কাক ধরে এনে তাকে ছুরি দিয়ে কাটুন। কেবলমাত্র হৃদয়টা রেখে বাকি দেহটাকে এমন স্থানে পুঁতে দিন—যে স্থান দিয়ে আপনার প্রেয়সী যাতায়াত করে।

ট্রাম লাইন থেকে পাড়ায় ঢোকার দীর্ঘ অন্ধকার রাস্তাটা মোহিতের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কলজেটা এবার একটি লোহার মাদুলিতে ভরে ডান হাতে কালো সুতোয় ধারণ করুন। শনিবার রাত্রি বারোটার পর একটি নির্জন ঘরে কালো চাদর বিছিয়ে সামনে ঘিয়ের প্রদীপ ও ধূপ জ্বেলে মনে মনে ২০,০০০ বার আপনার প্রেমিকার নাম জপ করুন। এর কিছু দিনের মধ্যেই আপনার প্রেমিকা অবশ্যই আপনার বশীভূত হবে। জপের আগে এই মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করে নিন—

ওঁ হ্রীং ক্রীং কামনায় স্বাহা।

ওঁ হ্রীং হ্রীং ঘোররূপিনে স্বাহা॥

বাইরে শীত আর অন্ধকার এখন গলাগলি করে ঘিয়ের মত জমে উঠেছে। এর পরেই লেখা মামলায় জয়লাভের উপায়। আপনার নামে খুন, রাহাজানি, ডাকাইতি, বলাৎকার বা যে কোনো মামলা চলতে থাকলে—আপনি প্রতি মঙ্গলবার কাককে বিকেল ৪টা-৫টার সময় ঘি, চিনি আর আটার রুটি খাওয়াতে থাকুন। আরও অনেক কিছু লিখে তারপরই—পরীক্ষায় পাশ। প্রতিদিন কাকটিকে মধুমিশ্রিত জল খেতে দিন।···প্রতিটি পরীক্ষার জন্যই একটি করে ভিন্ন কাক চাই।···কিছু পড়াশুনা না করেই পরীক্ষায় বসতে যাবেন না।—এরপর চাকরিতে প্রোমোশন। তারপর গুপ্তধন প্রাপ্তি। এরপর—মনের কথা জানা। সাট্টায় জয়লাভ। সবার শেষে—শতবর্ষ জীবিত থাকার উপায়।

আমার ঘিলুতে কি কোনো আঘাত লাগল? আমি কোনদিকে যাব। ট্রাম লাইন থেকে বাড়ি ফেরার পথটা জায়গা মত খুঁড়ে ওই হৃদয় ওপড়ানো কাকটাকে পুঁতে দেব? না, লেবুকে মুক্ত করব আগে? কোনটা আমার কাজ।

কাকের গলায় তো কখনো ক্রেন ক্রেন আওয়াজ শুনি নি। যা শুনি তা তো স্রেফ কা কা। ঘরে একটা জানলা অল্প খুলতেই ঝিলের ওপারে ক্লাব বাড়ি। সেখানে একটা মোটে ডুমে কিছু শীতকাতুরে

আলো। তাতে ক্লাব চাতাল সবটা দেখা যায় না। সেখানেই মোটা গুঁড়ির ছায়া ছড়ানো ঝাঁকড়া দুই খিরিশ গাছ—যাদের ডালপালায় বিঘে খানেক জায়গার আকাশ দিনের বেলাতেই কোনো ফাঁক ফোকর পায় না আলো চুঁইয়ে নামিয়ে দেবার। এই দুই গাছে যত পাতা—প্রায় তত কাক সন্ধে হলে এসে জোটে। রাতটা যত ফর্সা হয়ে ওঠে ওরা ততই জাগতে থাকে। ওদের গলায় তো শুধু কা কা ডাকই শুনতে পায় মোহিত।

যদি কোনো ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে একটি চাঁপা ফুল তুলে—

ওঁ কামদেব হাওকার্য কুরু কুরু স্বাহা মন্ত্রটি সাতবার জপ করে সেই চাঁপা ফুলটি কোনো রমণীর মাথায় বা খোঁপায় গুঁজে দেয় তাহলে সেই নারী বা স্ত্রী তার একান্ত আপন হয়ে যাবে। এর গুণ বলা বাহুল্য মাত্র। তিরিশটি গোটা ছোলা, ষোলটি যব একসঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়ো করে নিয়ে সর্ষের তেল আর গরুর দাঁতে মিশিয়ে পিষে চন্দন মত করুন। এইবার এই চন্দনের তিলক কেটে যে রমণীর নিকটই যান না কেন—সে অপূর্ব সুন্দরী ও তিলোত্তমার মত রূপসী ও ষোড়শী হোক না কেন আপনার বশীভূত হবেই হবে।

বইখানা ভাঁজ করে টেবিলের দেরাজে রাখল মোহিত। তার মাথা গরম হয়ে গেছে। রাস্তার দিকের জানলা—ঝিলের দিকের জানলা—দুটোই একসঙ্গে খুলে দিল। শীত হুড় হুড় করে এসে একদম ঠাণ্ডা জলের মতই তার মাথায় আটকে যেতে লাগল। বাইরের অন্ধকারে চোখ সেট হয়ে গেলে মোহিত দেখতে পেল—পুটু একা এই নিশুতি রাতে তাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ব্রহ্মস্পর্শে দাঁড়িয়ে। রাত ফিকে হবার সামান্য আলো। তাতে বুঝল—জানলা খুলতে দেখে পুটু এদিকেই তাকিয়ে।

মোহিতের ঘরে ঘেরটোপের ভেতর টেবিল ল্যাম্প যেটুকু আলো ছড়িয়েছে তাতেই হাত তুলে মোহিত নিঃশব্দে জানতে চাইল, কি ব্যাপার? মুখে কোনো কথা বলল না।

আবছা আলোয় পুটু তার মাথাটা ১৬/২-র বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে

দিল। তারপর হাতের আঙুলে নিরুপায়ের মুদ্রা করে দেখাল।

সামান্য খুট শব্দ করে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল মোহিত। আজও পুটুর কাঁধে সেই ব্যাপার। মাথায় অবশ্য শাড়ির কোনো আঁচল নেই।

কি ব্যাপার?

এবারও একই নিরুপায়ের ভঙ্গিতে ১৬/২-র বাড়ির দিকে তাকাল পুটু।

কঙ্কাবতীর ঘরে ডিমলাইট জ্বলছে। বাইরে কাচের কপাটে তার আভা।

খানিক আগে লেবু উঠে পড়ায় আমি বেরিয়ে এসে দেখি—আর বলতে পারল না পুটু। তার গলা বুজে এসেছে। এই আবছা আলোতেও মোহিত টের গেল—পুটুর মুখ চোখ—ক্লান্ত—মলিন।

সে আস্তে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, প্রফুল্লবাবুকে ডাকি— ?

কেলেঙ্কারি হবে। নির্ঘাত বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসবে।—মোহিতের মতই চাপা গলায় পুটু জানতে চাইল, আপনি বলেছিলেন না—কিছু একটা করবেন—কি করলেন?

চেষ্টা তো করে যাচ্ছি—বলেও নিজেকে চোর চোর লাগল মোহিতের।

পুটু এগিয়ে এসে মোহিতের দুখানা হাত দুহাতে ধরল। আপনি ওকে ভালবাসেন। স্নেহ করেন। আপনিই পারবেন। দয়া করে একটা কিছু করুন। আমি যে কত রাত ঘুমোই না। চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হবার দশা।

ওর বাবাকে সব বল। উনি জানেন?

কিছু জানেন। তবে এতটা নয়। আর ওকে বলেই বা কি হবে! দেখলেন তো—আজ মাস তিনেক হিমালয়ের ম্যাপ নিয়েই কাটাল। বাড়িটার মেঝে আধখানা হয়ে বন্ধ। এক দেড়শো বছরের

আস্ত একটা ফ্যামিলির সবাইকে খুঁজে বের করা কি চাট্টিখানি কথা! আমি মা হয়ে কি করি বলুন তো—

পুটুর হাত দু-খানাই খুব গরম লাগল মোহিতের। এবার সে অন্ধকারেও পুটুর সেই দীঘল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গির তেজ টের পেল। তোমায় দেখলে আমার দিন খুব সুন্দর হয় পুটু···

মোহিতের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়াল না পুটু। অন্ধকার আর শীতের মতই গাঢ় পুটু আকুল হয়ে অন্ধকারের জিনিস হয়ে যাচ্ছিল। খুব আস্তে বলল, কিন্তু এখন যে রাত!

পুটুর গলায় ঠাট্টা? না, বিরক্তি? কোনোটাই ঠিক করতে পারল না মোহিত। সে তখন এতটুকু হয়ে গেল। পুটুর চোখ এইসময় বার বার কঙ্কাবতীর ঘরের জানলার কাচের কপাটের দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

মোহিত কিছু একটা বলতে যাবে—আর অমনি বারান্দায় প্রফুল্লদের তেলুগু পূর্বপুরুষের ঘুম ভেঙে গেল। এই তেলুগু ঠাকুর্দা বড্ড কম ঘুমোন। লোকটা উঠে খড়ম পায়ে দেবার আগেই মোহিত ঘরে ফিরে এল।

ঘরে এসে দেখল, পুটু তাদের বাড়ির খিড়কি দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। কঙ্কাবতীর জানলার কাচের কপাটে তখনো মৃদু আলোর আভা।

॥ ১৪ ॥

নেতাজি ব্যর্থ ডে, রিপাবলিক ডে, সরস্বতী পুজো আর শনি-রবিবার—সব একসঙ্গে এসে পড়ায় মাঝের একটা দিন ক্যাজুয়াল নিয়ে মোহিত এক লম্বা ছুটির শতরঞ্চি পেতে ফেলল। এক নাগরি নলেন গুড় নিয়ে এল মোহিত বাজার থেকে। উর্মি বলল, ওদের দু ভাইকে একটু খবর দিও। অনেকদিন লেবু আর আলু আসে না। আজ পায়েস করব। একটু কিসমিস আনবে কিন্তু—

বেলাবেলি পায়েস কথা হচ্ছিল—কলকাতা কতদিকে কত

বেড়েছে। আলু জানাল, বেহালার করুণাময়ী, হরিদেবপুর, নেপালগঞ্জের মোড় অব্দি রাস্তা টানা হচ্ছে—পাতাল রেল টালিগঞ্জের সঙ্গে জুড়ে দিতে।

লেবু বলল, ওদিকটা আপনি দেখেন নি। ভারি সুন্দর। ফাঁকা মাঠ। মন্দির ছোট ছোট কাঠের বাড়ি খ্রীষ্টানদের। হঠাৎ মাঠের ভেতর একটা বাজার বসেছে। লোকভর্তি একখানা বাস এসে থামল। এসব দেখলে আপনার ছবি আঁকতে ইচ্ছে করবে।

তুমি আঁকো না কেন?

আমার আর হবে না। ওদিকে যাবেন?

কি করে যাব লেবু। এখনো তো রাস্তা তৈরি হয়নি বলছ।

গভর্নমেণ্ট রাস্তা বানাচ্ছে এদিকটায়। অনেকটাই হয়ে গেছে। আমি একবার বল খেলতে গিয়ে দেখে এসেছি। তার চেয়ে কী দরকার—আমরা না হয় মহাবীরতলা দিয়ে যাব। যাবেন?

চল।

আলু বলল, আমি যেতে পারব না। আমার এক ফ্রেণ্ড আসবে।

বেশ। তুই থাক। আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি।

মোহিত বলল, শীতকাল তো। সন্ধে কিন্তু তাড়াতাড়ি নামে লেবু।

তাহলে চলুন এখুনি রওনা হয়ে যাই।

মহাবীরতলা, প্রমথ বসুর ইটখোলা, সিরিটির শ্মশান, ক্যাওড়াপুকুর পেরিয়ে করুণাময়ীর মোড়। তার হরিদেবপুর অব্দি তো লোক গিজগিজ করছে।

তারপরেই দুপাশ ফাঁকা হতে লাগল। বাসে ভিড়। সাইকেল রিক্শা না পাওয়ায় মোহিত আর লেবু একটা সবজির সাইকেল ভ্যানে চড়ে বসল।

দুধারে ধানকাটা মাঠ। খালের ওপর বাঁশের সাঁকো। গুড়ের নাগরি মাথায় একা এক ব্যাপারী। শীতের বেলার পড়ন্ত রোদে শুকনো গাছপালার গন্ধ।

নেপালগঞ্জ পৌঁছাতে প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে। বড় পাকা পেঁপে, মোটা লাল মুলো, ভরন্ত লাউ, পুরো ফুলের কপি। রাস্তার দুধারে থরে থরে সাজিয়ে বসেছে গাঁয়ের চাষীরা।

দুটো করে ডাব খেল দুজনে। দরাদরিতেও কত আনন্দ। এই সব সবজি একেবারে পৃথিবীর বুকের ভেতরটাই খুলে দেখাচ্ছে যেন।

কচি পাঁঠা কেটে ভাগা দিয়ে বসেছে একটা লোক। কিলো কলকাতার চেয়ে ছ টাকা কম। কলাপাতায় নাড়িভুঁড়ি। যত গেঁয়ো আর ঘেয়ো কুকুরের ভিড়। ওরই ভেতর একটা কিছু বড়সড় কুকুর এমন করেই তাকাল—মোহিত না ঘুরে পারল না।

ঘুরেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কে?

কুকুরটা মুখ ফিরিয়ে নিল। গায়ের লোম পড়ে এসেছে। কাঁকলাশ মেরুদণ্ড—তবু ওর চোখের ঘেন্না দেখে চিনতে কষ্ট হল না মোহিতের। হিমি—

হিমি মুখ পুরোপুরি ফিরিয়ে নিল।

কাছে গিয়ে মোহিত যতই ডাকে—হিমি হিমি—, ততই কুকুরটা মোহিতের দিক থেকে একদম উল্টোদিকে মাথা নিয়ে যায়।

লেবু বলল, ঠিক চিনেছে আপনাকে। কিন্তু আর তাকাবে না।

সত্যিই তাই। কুকুরদের জটলা থেকে উঠে গিয়ে হিমি একা একাই মাঠের ভেতর নেমে গেল। তারপর যেদিকটায় দিগন্ত—সেদিকে মুখ রেখে একা একাই দুলকি চালে চলতে লাগল।

মোহিত পরিষ্কার জানে—ওদিকে হিমির জন্যে কোনো জায়গা নেই—নেই কোনো রাস্তাও।

সে খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। টাটকা সবজির সবুজ টালে নওজওয়ান চাষী। তার পেছনে ধানকাটা মাঠ। মাঠের শেষে দিগন্ত। সেদিক থেকে বিকেলের ছায়া মেশানো পড়ন্ত রোদের ফলা।

যদিও এত দরকার নেই—তবু গোটা কয় লাউ, ফুলকপি, কুমড়ো, মুলো কিনে একটা পুরো রিকশা ভ্যানই ভাড়া করে বসল মোহিত।

লাউ কুমড়ো মাঝখানে রেখে ওরা দুজন দুধারে পা ঝুলিয়ে দিল। অন্ধকার ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি লোকালয়ে পৌঁছানো দরকার। যেভাবে গম্ভীর হলুদ চাঁদ উঁকি দিচ্ছে—তাতে মনে হয় আশপাশের গাছ-গাছালি থেকে ভুল করে পাখিও বেরিয়ে পড়তে পারে—আবার বুঝি দিন এল ভেবে।

আচ্ছা লেবু—কঙ্কাকে তুমি কতটা ভালবাসো ?

মাথার ওপরের চলন্ত মশার গোল্লা বাঁ হাতে তাড়িয়ে লেবু বলল, আমি তো ভালবাসি না। ও অ্যাকচুয়ালি আমার ওপর ডিপেণ্ড করে।

ডিপেণ্ড করে কেন ? তুমি ছাড়া ওর কি আর কেউ নেই ?

ভাইরা আছে। তবে সবাই সানি ডেজ ফ্রেণ্ডস ! বিপদে পড়লে কেউ আসে না।

তখন তুমি যাও !

একবার যেতে হয়েছিল আর কি। ওর ছেলে সন্তুর খুব জ্বর হল। আমি খুব ছুটোছুটি করেছি তখন।

সেই থেকে তোমার ওপর খুব নির্ভর করে !

তা বলতে পারেন।

কঙ্কাবতীর যা আয়—তাতে তো ও ফাইনানসিয়ালি স্বাধীন।

বিলকুল স্বাধীন। এই তো শীতকাল জুড়ে কল শো করে। তখনই ওর মেইন ইনকাম।

সিনেমায় ?

বাংলা ছবির অবস্থা তো জানেন। তারপর যেসব অ্যাডভান্সেস্ করার কথা—তাতে ও একদম রাজী নয়।

দু পাশের রাস্তা অন্ধকার হয়ে গেছে। দূরে কুঁড়েঘরে কুপির আলো। প্রশ্রয়ের ইংরিজি অ্যাডভান্স কথাটার ওজন যখন লেবু বোঝে তখন তাকে কি আর কাঁচা বলা যায়।

ও তোমার ওপর ডিপেণ্ড করে। তুমি ওর ওপর ?

ওর কাজে খানিকটা হাত লাগাতে আমার ভালই লাগে।

তোমার বাবা মা তো তোমাকে নিয়ে অনেক আশা করে থাকতে পারেন।

আমার জীবন—আমারই।

ওঃ! তাও তো বটে! তুমি আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশেছ কখনো?

সেভাবে আর মিশবার সময় হল কোথায়? কঙ্কা ইজ কোয়ায়েট ম্যাচিওর্ড।

তা তো হবেই। ছবির লাইনেই তো ষোল আঠেরো বছর হয়ে গেল ওর।

একথা কঙ্কাও বলে। কিন্তু বয়সটাই সব নয় বুঝলেন।

বয়স বুঝতে তো বয়স লাগে লেবু।

করুণাময়ীর মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। ফাঁড়ির মোড়ের কাছাকাছি এসে মোহিত বলল, এস। একটা জিনিস কিনি।

কি কিনবে জানি। ড্রিঙ্কস। আই প্রেফার হুইস্কি। সি টেকস্ শেরি।

তাই নাকি? বেশ। তাই হোক। অল্প করে খাওয়া যাবে।

লেবু বলল, ফাইন!

কেনার পর মোহিত বলল, চলত গলিটা সার্ভে করে দেখি।

চল।

গলি মানে - কিছু মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুবই সস্তার। মোহিত পঞ্চাশের ওপাশে। মোটা সোটা গোলগাল। লেবু সবে কুড়ি ছাড়িয়েছে। টান টান, পাতের মত।

সওদা শুরু হয় নি তখনো। গলির গায়ে ঘরের চৌকাঠে বসে একটি মাতাল মেয়ে এক রসিক নাপিত দিয়ে পায়ের নখ জুৎ করে কাটাচ্ছিল। সে তলচোখে মোহিতকে দেখে পাশের ঘরের মেয়েটিকে বলল, এ ভগবান দাশ কোত্থেকে এল রে!

লেবু হো হো করে হেসে উঠল। আপনাকে ভগবান দাশ বলছে।

মোহিত সব বুঝেও একটুও দমল না। ভগবান দাশ কে?

চেনেন না? আপনাদের সময়ের ফিল্মে একটা মোটা মত লোক নাচত—গাইত—কমিক রোল করত। সব ছবিতেই থাকত। আমিও দেখেছি।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটি হেসে উঠল। সেই হাসির গররায় ওরা দুজন প্রায় ভেসে উঠে দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে এসে ঢুকল।

সবজিগুলো কয়েকবাড়ি বিলির পর মোহিত নিজের ঘরে বসে লেবুকে ঢেলে দিল। আরেকটু জল দেব?

দিন। বরফ আছে?

ফ্রিজ থেকে নিয়ে এস।

লেবু উঠে যেতে মোহিত ওর গ্লাসটায় তাকাল। ফিকে হলুদ হুইস্কি। এতক্ষণ একজন আনকোরা মানুষের সঙ্গে থেকে মোহিতের নিজেরই মনে হল—সে এখন এই সান্ধ্য ডিমের ডালনার গন্ধ ওঠা সভ্যতার ভেতর আগের চেয়ে অনেক বেশি তাজা বোধ করছে। কঙ্কাবতীর তো আরও ফ্রেস লাগবে। আরও তাজা।

আজ আমি নিশ্চয় কবিতা লিখব।

ঊর্মি ভেতর থেকে এসে বলল, করছ কি? এতটুকু ছেলের সঙ্গে অত বড় বোতল নিয়ে বসেছ?

কোয়াইট ম্যাচিওরড্ লেবু।

কি বলছ? তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে ও অমন করছে। ছেড়ে দাও ছেলেটাকে।

তখনই এক বাটি বরফ নিয়ে লেবু ঘরে ঢুকল। বস্। কিছু ভাজাভুজি হলে আইডিয়াল হত। আমি আবার খালিপেটে খেতে পারি না।

ঊর্মি বলল, খাবার দরকার কি। দুপুরের পায়েস আছে। একটু দেব?

নাঃ।

মোহিত বলল, পমফ্রেট আছে না। দাও না ভেজে। আমি কিন্তু লেবু খালি পেটেই এসব খাই। তাতে বেশি ভাল লাগে।

খানিক বাদে এক থালা মাছভাজা দিয়ে সেই যে উর্মি ভেতরে গেল আর এল না। জল ফুরোতে খানিক বাদে ভেতরে গিয়ে মোহিত দেখল—উর্মি ঘুমিয়ে পড়েছে। মশারি টাঙায় নি। তখন সে ফ্যানটা লো স্পীডে চালিয়ে দিল।

আবারও জল ফুরিয়ে গেল খানিক বাদে। তখন সারা পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। করপোরেশনের আলো সব পোস্টে জ্বলে নি। কুকুরগুলো ময়রার দোকানের ছাইগাদায় এখন কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

লেবু ভাজা মাছের সঙ্গে কাঁচালঙ্কা দাঁতে কেটে নিচ্ছিল। ঘামছে।

মোহিত বলল, স্টেডি?

ও ইয়েস!

কঙ্কা তোমার ওপর ডিপেণ্ড করে। ও কি তোমায় বিয়ে করবে?

তা জানি না।

বাঃ! ওর মনই জানো না।

না। ওর মন জানি না। জানব কি করে? ও তো বলে না। আর আমিই বা তুলি কি করে কথাটা? আমি যে আজও গ্রাজুয়েট হতে পারি নি। গ্রাজুয়েটটা হলেই ফ্যাশন ডিজাইনারের ডিপ্লোমার জন্যে ওদেশে যাব। কিন্তু তার আগে পাস করা দরকার—

উঃ! বড্ড গরম লাগছে ঘরটা। জানলাটা খুলে দাও না লেবু।

আমারও গরম লাগছে। তার চেয়ে চলুন না—বাইরে ঠাণ্ডায় ঘুরে আসি।

দরকার নেই। সারা পাড়ার কুকুরগুলো ঘেউঘেউ জুড়ে দেবে।

না। জুড়বে না। আমায় ভাল করে চেনে। আমি তো রাত করে যখন তখন ফিরি। বেরোই। ওরা সব দেখে। কিন্তু চেঁচায় না। চেনে যে—

বাকিটা শেষ করে দাও আগে।

দুজনের জন্যেই ঢালল মোহিত। বড় করে। দুজনেই এক

চুমুকে শেষ করল। মোহিত বলল, বলছ যখন একটু হেঁটে আসি ঠাণ্ডায়। ভালই লাগছে। কি বল—

রাস্তায় বেরিয়ে ঠাণ্ডায় দুজনেরই ভাল লাগতে লাগল। সব বাড়িরই দরজা বন্ধ। মোহিত জানতে চাইল, বাড়ি ফের নি—কেউ খুঁজবে না?

নাঃ। এখন মা টেবিলে খাবার চাপা দিয়ে রাখে। কখনো আমার খাবার আমি বানিয়ে নিই। নুডলস্—একটা ডিম—কয়েকটা বিনস্—চিলি সস্। ব্যাস্!

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ঝিল ছাড়িয়ে গেল। সেখান থেকে হাই রাইজ বাড়িগুলোর অন্ধকার বিশাল বিশাল মুণ্ডু আরও অন্ধকার আকাশে ঠেলে উঠেছে। ওখানেই ক্লাব মাঠের গায়ের সেই রাস্তাটা কুয়াশার লম্বা ফিতে হয়ে পড়ে ছিল। রাস্তার দুধারের ঘাসজমি—গাছগাছালি, খাটাল, গেরস্থবাড়ি—সবই অন্ধকার গিলে খেয়ে বসে আছে।

মোহিত বেশি রাতের হিমেল বাতাসে হাসতে হাসতেই বলল, মনের কথা, জানা—কিংবা পরীক্ষায় পাস করা তো ইচ্ছে করলেই হয় লেবু—

কি রকম?

কাক মানুষের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। তোমার হয়ে কাকই সব করে দেবে।

আমাদের এই অর্ডিনারি কাক?

হুঁ। রাতে কাক অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখতে পায় না। এখনই ওদের খপ করে ধরে ফেলা খুব সোজা। আজ তো মঙ্গলবার?

বোধহয়। আমার তো অফিস কাছারি নেই। কি বার মনে থাকে না একদম।

আজই রাত বারোটা থেকে একটার ভেতর একটা কাক ধরতে হবে।

হাতঘড়ি দেখে লেবু বলল, টু দি ডট স-বারোটা বাজল।

তবে তো উপযুক্ত সময়। ক্লাব চাতালের খিরিশ গাছ দুটো তো কাকদের বাসাবাড়ি। কাকদের গ্র্যাণ্ডহোটেলও বলতে পার। এই ত কাক ধরার মাহেন্দ্রক্ষণ।

এই রাতে অত উঁচু গাছে কে উঠবে? পাগল হয়েছেন আপনি। আর ক্লাবের গার্ড আছে না?

এখন বেঁটে গাছ কোথায় পাই লেবু? কাকদের শান্তিনিকেতন বোর্ডিং? এখনই কাকটাকে ধরে ১২ দিন অব্দি গোলাপজলের মধু মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ১৩ দিনের রাত ১১টা নাগাদ কাকটাকে কেটে ওর কলজেটা বের করা দরকার।

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই মজে যাচ্ছিল মোহিত। তবে কি সে নিজে এসব জানে? মানে—আগেই জানত? এই কথাটা মনে ভাসতেই মোহিত তোড়ে বলতে লাগল—কলজেটাকে এবার একটা কৌটোয় বন্ধ করে রোদে শুকোতে দাও।

লেবু জানতে চাইল, সত্যিই এতে মনের কথা জানা যায়?

অব্যর্থ লেবু! অব্যর্থ!! এর জোরে পরীক্ষায় পাসও কিচ্ছু না! হ্যাঁ—তারপর ১৫ দিনের দিন অন্য একটা কৌটোয় সিঁদুর সমেত—কলজেটা রাখতে হবে। তখন চাই কিছুটা মৃগনাভি আর কস্তুরি।

আপনি তো অনেক কিছু জানেন।

শোনই না। এইভাবে এক সপ্তাহ অব্দি কৌটো না খুলে ঝাঁকাতে হবে। একবারে দুতিন মিনিট এইভাবে কৌটো ঝাঁকাবে। এরপরে যার মনের কথা জানতে চাও—শুধু তার কথাই মনে করে রাত ১২টা থেকে ১টার ভেতর কৌটোটা খোলো। এবার কলজেটা বের করে বিছানায় রেখে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকো। থাকলে তো। এবার বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়। স্বপ্নযোগে কাঙ্ক্ষিত লোকের মনের কথা জানতে পারবে।

নিশুতি রাতের হিমঠাণ্ডায় দুজনেরই নেশা ঝাঁ ঝাঁ করে চড়ে যাচ্ছিল। তোড়ে বানিয়ে বানিয়ে বলার আনন্দে মোহিত এবার

বলল, স্বপ্নে মনের কথা জানলেই ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু স্বপ্নের কথা তো মানুষ ভুলে যায়। কি করে মনে রাখবে তাহলে ?

ভড়কে যাওয়া চোখে লেবু মুখ তুলে চাইল।

মোহিত বলল, খুব সিম্পিল ! ঘুম ভাঙতেই এই মন্ত্রটা ১০৮ বার জপ করবে—

ওঁ চামুণ্ডে, কালীয়ে স্তম্ভয়, স্তম্ভয়।

স্ত্রী চ রাজ পুত্রাণী বশীভবত নিশ্চয়ঃ ॥

এমনই জোরে মোহিত দুবার নিশ্চয় বলল—যাতে হিম ঠাণ্ডা রাত খান খান করে ভেঙে গেল। কাছেরই কোনো গাছে ঘুমন্ত পাখি ডেকে উঠল।

মোহিত বলল, এ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে স্বপ্নের ভেতরকার স্বপ্নও মাথার ভেতর পাকাপাকি ছাপা হয়ে যায়।

ওসব কাপালিক মার্কা মন্ত্র আমি জপ করতে পারব না।

কেন লেবু ?

না বুঝে জপ করি—আর কঙ্কার কোনো ক্ষতি হয়ে যাক শেষে ! ওতে আমি নেই।

তুমি কঙ্কাকে খুব ভালোবাস—তা জানি। আমি জেনেশুনে তোমায় মিসলিড করব না লেবু। এটা হল গিয়ে ঘুম ভাঙার পর স্বপ্ন মনে রাখার মন্ত্র।

বলছেন ?

—এমন করেই জানতে চাইল লেবু—মোহিত না তাকিয়ে পারল না। যেন এ কথার জবাবের ওপরেই এই নিশুতি রাতটুকুর ফিউচার ঝুলে আছে। দীঘল লেবুর দীঘল ছায়া লম্বা হয়ে ঝিলের বুকে। দিশী কুকুরগুলো অব্দি অ্যাবসেণ্ট। এত নির্জন। এত ঠাণ্ডা।

হুঁ। কিন্তু কাক ?

সে চিন্তা করবেন না। কার্তিক মজুমদারের পোড়ো 'কার্তিক ভবন' থাকতে কাকের অভাব।

ঠিক বলেছ তো।

এর পর দেখা গেল—মাঝখানে তিরিশ বছরের গ্যাপ—তুই যুগের তুজন মানুষ রাতের হিম মাথায়-গায়ে শুষতে শুষতে টল টল করে সেই আবছা কুয়াশা ফিতে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। যেন পাহাড় ভাঙতে হচ্ছে।

ভাঙা গেট ঘাসবনে ঘষটে লেবু কার্তিক ভবনের উঠোনে ঢুকে পড়ল।

এদিকে সারা গায়ের সাত পুরনো আঁশে শ্যাওলা ধরেছে বুড়োর। বুড়িরও একটু যে বেরিয়ে কোনো ভাঙা ঘাটের আধলা ইটে গা ঘষটে ঝপাং করে দীঘির জলে লাফিয়ে পড়বে—তেমন নির্জন, ফাঁকা জলকর এখন আর কোথায়! তারপরে আবার শীত পড়ে গেল। তুজনের বেরনো একরকম বন্ধ।

আজই সন্ধের মুখে ফাটা বট চাতালের ফোকরে ঘুমন্ত বুড়োকে অনেক কষ্টে জাগিয়ে দিল বুড়ি। আমার তো মাথা ধরেছে। এই অসময়ে ঢালি কোথায়?

শীতে কাউকে ছুবলে আবার বদনামী করতে যেও না বউ।

কিন্তু বিষটা ঢালি কোথায়?

বিষ তো? না গায়ে গতরে—ফণায় যা চর্বি জমেছে—তার ভার?

সে তো তোমারও জমেছে। তাতে কি মাথা ধরে!

মোহিত বুঝতে পারছিল—এই নিশুতি রাতে এক একটা ঝুঁকির মত দশা—তার হাত দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে নেশার ভাল লাগার সঙ্গে হিমেল বাতাসের খাপ খেয়ে যাওয়া মাথার ভেতরের দপদপানি দিয়ে ধরতে পারছিল—আবার হারিয়েও ফেলছিল। সে একটু একটু টের পায়—পড়শীর ছেলেকে গভীর রাতে অন্ধকার-বটগাছে উঠতে হেলপ্ করা কত দিক দিয়ে বিপদের। কিছু একটা ঘটলে তো এই বলে মোহিত পার পাবে না—যে, আমি ওকে নিচু ডালের বাসা থেকে মাত্র একটি কাক পাড়তে ওপরে তুলেছিলাম! আবার এও সত্যি—একটি অজানা বটচাতালে দাঁড়িয়ে একজন ডগডগে

তাজা মানুষকে কাক পাড়তে উদ্বুদ্ধ (!) করার ভেতর কী এক মজার পাগলামো ভুস করে ভেসে ওঠে।

সাপ অতশত ভাবে না।

বুড়ি ফাটা বট চাতালের ফোকরে মাথা তুলেই দেখল, চামড়ায় মোড়া কচি গুঁড়ির কী গাছ অন্ধকার বটঝুরির ভেতর ঠেলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে—দে ঠোক্কর।

প্রথম ছোবলটা পড়ল গিয়ে মোহিতের বাঁ পায়ের পাম্পসুতে। কিন্তু পরেরটা একদম নির্ভুল হল।

পাম্পসু আর ধুতির আড়ালের বাইরে বাঁ পায়ের যতটুকু বেরিয়ে থাকলে দোবারা ছোবলানির বড় ঢলের বিষ একজন মানুষের শরীর নিতে পারে—ঠিক ততখানিই—কিংবা কিছুটা বেশি জায়গা মোহিতের বেরিয়ে ছিল।

হালকা করে বুড়ি মাথা তুলল। ধীরে সুস্থে গ্যাদোরে গোদরে শরীরটা নামিয়ে নিল ফাটা চাতলের ফোকরে।

তখন মোহিত প্রথম টের পেল—তার মাথার ঘিলুকোষে কে একটা গজাল গাদিয়ে এইমাত্র জখম করে দিল। বাবাগো!

বট গাছের ওপরে অন্ধকারের ভেতর লেবু কিসের পড়ে যাওয়ার শব্দ পেল। কিন্তু এখন পেছোনো যায় না। সে বাসার খোঁজে হাতড়াতে লাগল।

নানান জন্মের স্মৃতি—সংস্কার গচ্ছিত রাখার ঘিলুকোষের ভেতর দিয়ে এখন ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল বয়ে যাচ্ছে। মোহিত টের পেল, এবার যদি সে ডানপাশ ফেরে তাহলেই সেই খাট, তলিয়ে যাওয়া—দেওয়াল ভেঙে পড়ার ভূমিকম্পটা শুরু হয়ে যাবে।

তাই সে কিছুতে পাশ ফিরল না। শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল—একটা হাম্বার গাড়ি এসে থামল। ড্রাইভারের সিট থেকে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে এক হাট্টাকাট্টা ভদ্দরলোক বেরিয়ে এল। এসেই চেঁচাতে লাগল, ও কাত্তিক? কাত্তিক আছ নাকি?

ফটাৎ করে কার্তিক ভবনের সদর দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে হাঁক—যাই মৃগাঙ্কদা—যাচ্ছি—

নাকের জায়গাটা কেমন পিড়পিড় করে উঠছে। হাত দিয়ে মোহিত দেখল, তার নাক অনেকটা বসে গেছে। চোখ খুলে রাখা দায়। এর নাম ঘুম। জেগে থাকার চেষ্টা করতে করতে বুঝল, এই তাহলে মৃগাঙ্কমোহন মৌলিক। এতদিনে দেখতে পেল শেষে। তাহলে ইনিই মাঝে মাঝে এসে দুর্গা মৌলিককে বেড়াতে নিয়ে যান।

আমার কী আর দিন সুন্দর হবে।

———